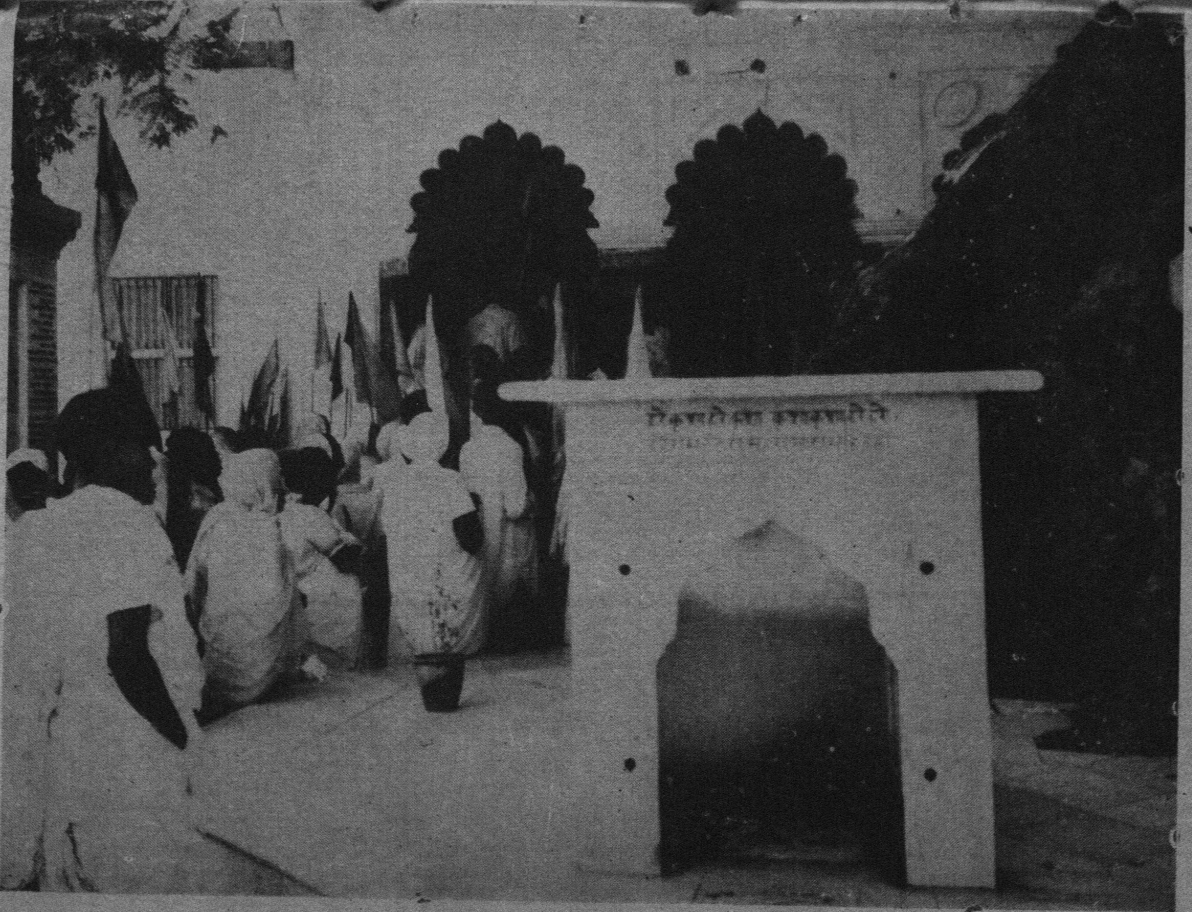
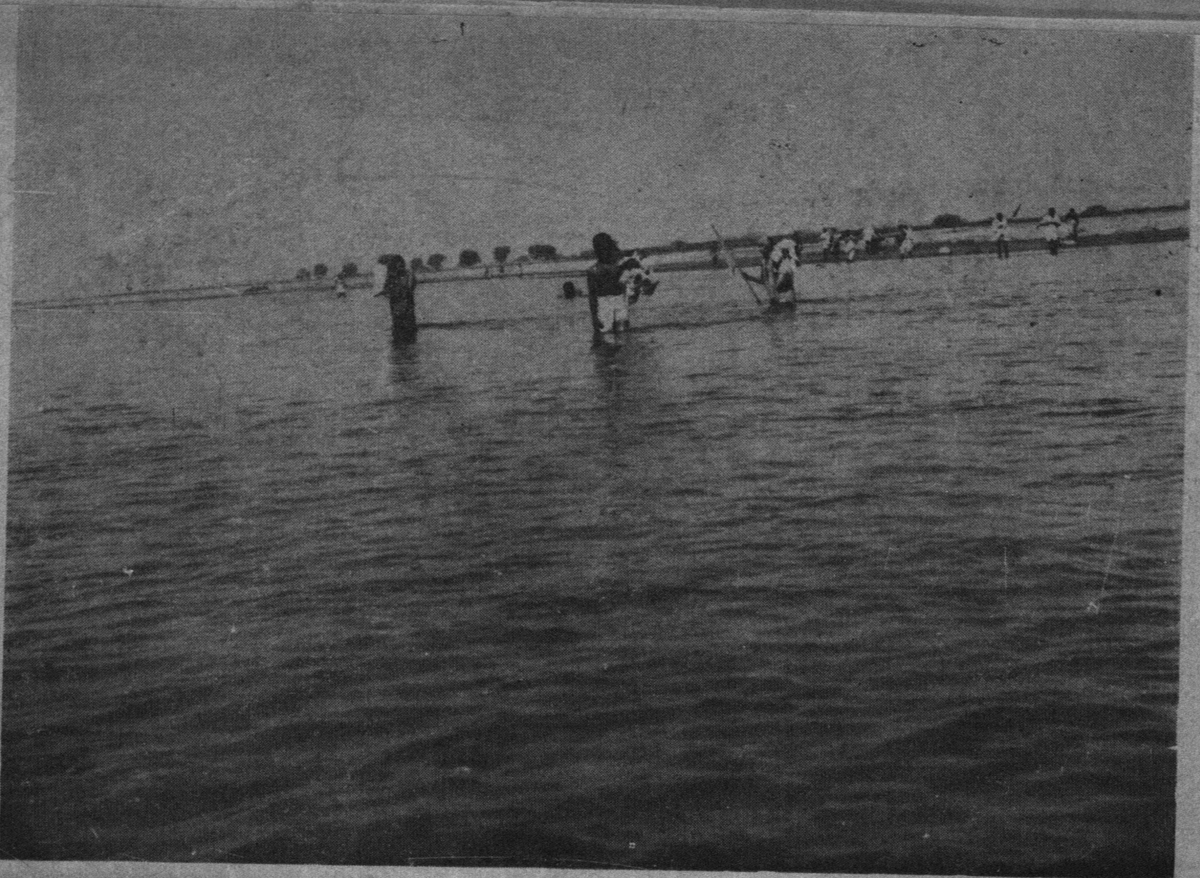




কৃষ্ণলীলার সাক্ষী বৃন্দাবনের যমুনা

প্রাচীন রাধাগোবিন্দ মন্দির

মধু-বৃন্দাবনে

(ব্রজপর্ব)

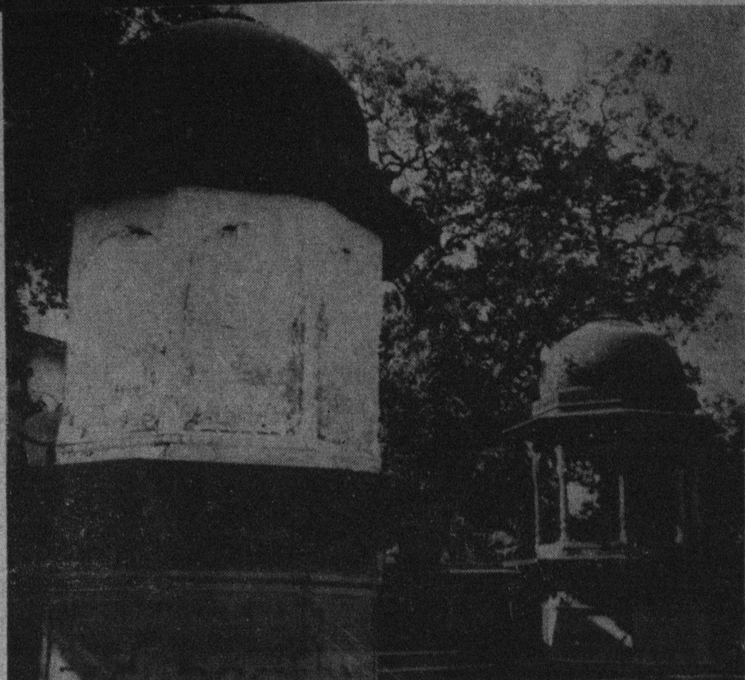
নতুন রাধাগোপীনাথ মন্দির—বৃন্দাবন

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক, ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট : চরণ-পাহাড়ীর পথে (কাম্যবন)
আলোকচিত্র : লেখক
অঙ্কন : শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস



কালীয় দমন স্থান—ডানদিকে সেই কালিকদম্ব গাছ

কালীয় দমন ঘাটে কীর্তন

রাধা-কৃষ্ণের রাসস্থলী (বংশীবটের ছায়ায়)

নিধুবন

ধ্বজস্তম্ভের (সোনার তালগাছ) সামনে (রঙ্গজীর মন্দির)

রঙ্গজীর বাগানবাড়ি—বৃন্দাবন

এই লেখকের ঃ

মধু-বৃন্দাবনে (বনপর্ব)

মধু-বৃন্দাবনে (মহাবনপর্ব)

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

নীল-দুর্গম

পঞ্চ-প্রয়াগ

চরণ-রেখা

গহন-গিরি-কন্দরে

বৈশাখী-পূর্ণিমা

গিরি-কান্তার

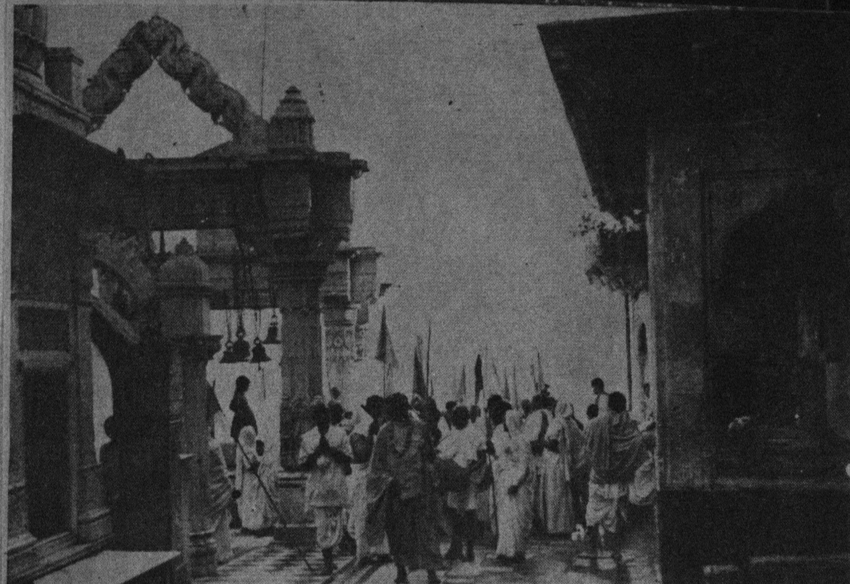
গারো পাহাড়ের পাঁচালি

উত্তরস্যাং দিশি

গঙ্গাসাগর

লীলাভূমি-লাহুল

গঙ্গা-যমুনার দেশে



বিশ্রাম ঘাটের সামনে —মথুরা

'আনন্দবৃন্দ-পরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দবৃন্দ—পরিনন্দিত-নন্দপুত্রম্
গোবিন্দ-সুন্দর-বধূ-পরিনন্দিতং তদ্
বৃন্দাবনং মধুর-মূর্ত্তমহং নমামি ॥ '

মধুময় বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনের আকাশে মধুচন্দ্র, বাতাসে মধুর ব্যজন, মাটিতে মন-মধুকর। হিরণ্যকশিপুর পুত্র মধুদৈত্যের মৃগয়াভূমি বৃন্দাবন। মধুবনবিহারী মধুসূদনের লীলাভূমি বৃন্দাবন।

সেই মধু-বৃন্দাবনে চলেছি আমরা। আমরা মানে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সেবক, শিষ্য ও অশিষ্য মিলিয়ে জন-ষাটেক যাত্রী।

চলেছি তুফান এক্স্প্রেসে। আজকাল যেখানে সতেরো ঘণ্টায় হাওড়া থেকে দিল্লী পৌঁছন যাচ্ছে, সেখানে তুফানের লাগছে ত্রিশ ঘণ্টা। কাজেই তুফান এক্স্প্রেস আর কোনমতেই এক্স্প্রেস নয়, তুফান তো নয়ই। তবু বৃন্দাবনযাত্রীদের তুফানই একমাত্র ভরসা। কারণ হাওড়া থেকে এক গাড়িতে মথুরা যেতে হলে, তুফান ছাড়া আর কোন ট্রেণ নেই। তাই তুফান, তুফান নয় জেনেও আমরা আজ সকাল ন'টার সময় হাওড়া স্টেশনের এই ন'নম্বর প্ল্যাটফর্মে সমবেত হয়েছি।

প্ল্যাটফর্মের ওপরে মালপত্রের বিরাট স্তূপ—বিছানা, বাক্স, স্যুটকেশ, কিটব্যাগ আর পৌঁটলা-পুঁটলি। সেই স্তূপের চারিপাশে জটলা। অধিকাংশই মহিলা এবং বৃদ্ধা। বয়স পঞ্চাশ থেকে আশির মধ্যে। কেবল চার-পাঁচজন যুবতী, আর তাদের মধ্যে মাত্র দুটি মেয়ে অবিবাহিতা।

মহিলাদের পরেই গেরুয়াধারীদের সংখ্যা। পাঁচজন সন্ন্যাসী, জন-দশেক ব্রহ্মচারী ও জন-সাতেক সেবক। সন্ন্যাসীদের পরনে বহির্বাস, গায়ে উত্তরীয়, হাতে দণ্ড ও পায়ে খড়ম। ব্রহ্মচারীদের পরনে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি ও পায়ে কাপড়ের জুতো। সেবকদের পোশাক ব্রহ্মচারীদের মতই। সেবকরা হচ্ছেন সন্ন্যাসাশ্রমের শেষ সারির সদস্য। তাঁরা হরিনাম নিয়ে আশ্রমিক জীবন শুরু করেন।

পরে যোগ্যতা বিচার করে গুরুমহারাজ তাঁদের দীক্ষা দিয়ে ব্রহ্মচারী পদে উন্নীত করেন। অবশেষে দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের পাঠ ও প্রচার দক্ষতা যাচাই করে তিনি তাঁদের সন্ন্যাস দান করেন। তাঁরা ত্রিদণ্ডী গোস্বামী পদে অভিষিক্ত হন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা সকলেই ত্রিদণ্ডী, অর্থাৎ 'কায়', 'মন' এবং 'বাক্'কে ভগবৎ-সেবায় 'দণ্ডিত' করেছেন। তাঁরা গোস্বামী। যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর এবং উপস্থ, অর্থাৎ কামের বেগ জয় করেছেন, তিনিই গোস্বামী তথা জগদ্‌গুরু। অতএব গোস্বামীরা হলেন বিজিতেন্দ্রিয় মহাভাগবত।

আমরা সংখ্যায় সবচেয়ে কম। সব মিলিয়ে জন পনেরো। তার মধ্যে আবার জন-দশেক আশ্রমের শিষ্য। অর্থাৎ আমাকে নিয়ে অশিষ্যদের সংখ্যা মাত্র পাঁচজন।

শিষ্য না হলে, এমনকি বৈষ্ণব না হলেও এই আশ্রমের বন-যাত্রায় অংশ নিতে বাধা নেই কোন। গুরুমহারাজের অনুমতি নিয়ে খরচ দিয়ে যে-কেউ যাত্রায় অংশ নিতে পারেন। শিষ্য বা বৈষ্ণব হবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে যাত্রাকালে বৈষ্ণব নিয়ম-কানুন ও আচার-ব্যবহার মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে এটি হচ্ছে কার্তিক মাস—দামোদর ব্রতের মাস। অতিশয় সংযমের সঙ্গে বৈষ্ণবদের এই মাসটি অতিবাহিত করতে হয়। আমার মতো অ-বৈষ্ণবের পক্ষে সে সংযম পালন করা খুবই কঠিন। কিন্তু কঠিনকে ভালোবাসব বলেই আমি এঁদের সহযাত্রী হয়েছি। কারণ—'সে কখনো করে না বঞ্চনা।'

আজ আমরা প্রায় ষাটজন চলেছি। তবে গুরুমহারাজ বলেছেন সব মিলিয়ে নাকি শতাধিক যাত্রী আমাদের এ বন-পরিক্রমায় অংশ নেবেন। অন্যান্যরা আসবেন আসাম, পাঞ্জাব, দিল্লী ও দক্ষিণ-ভারত থেকে। কয়েকজন বৃন্দাবনবাসীও যাবেন আমাদের সঙ্গে।

গাড়ি প্ল্যাটফর্মে আসছে। অতএব ভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে গাড়ির দিকে তাকাই। প্ল্যাটফর্মে সেই চির-পরিচিত দৃশ্য—হট্টগোল

ও ধাক্কাধাক্কি। দেশ স্বাধীন হয়েছে দীর্ঘকাল। রেলভাড়াও বাড়ছে প্রতি বছর। কিন্তু এই চির-পরিচিত দৃশ্যটির কিছুমাত্র পরিবর্তন হল না। তাহলে কি যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের কোন নজর নেই ?

না, কথাটা কোনমতেই সত্য নয়। বিগত বিশ বছরে তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীদের জন্য কর্তৃপক্ষ কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন এবং করছেন। যা করেছেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমরা আর একটু সৎ এবং নিয়মানুবর্তী হলে, সেই সুবিধাগুলির অধিকতর সদ্ব্যবহার করতে পারতাম—যেমন প্রত্যেকের জন্য থ্রি-টায়ার বার্থ রীজার্ভ করা আছে, অথচ আমার সহযাত্রীরা অনেকেই ধাক্কাধাক্কিতে অংশ নিয়েছেন।

অবস্থাটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হবার পরে মালপত্রসহ গাড়িতে উঠে এলাম। জনৈক ব্রহ্মচারী জায়গা দেখিয়ে দিলেন। জায়গাটি ভালই। জানলার ধারে লোয়ার বার্থ। কম্বল বিছিয়ে বসে পড়লাম। বসে বসে অন্যান্য যাত্রীদের কর্ম-ব্যস্ততা দেখতে লাগলাম। এটা দেখতে আমার চিরকালই বড় ভাল লাগে। দেখতে দেখতে এক সময় গাড়ি ছেড়ে দিল।

এই কামরায় আমাদের দলের মোট সাতজন রয়েছি। গুরু-মহারাজের তিনজন বৃদ্ধা শিষ্যা। তাঁরা 'লেডিজ ক্যুপে'তে বার্থ পেয়েছেন। একদিকের তিনটি বার্থই তাঁদের। এ কামরায় কর্তারা কেউ না থাকার জন্যই বোধ হয় তাদেব জন্য 'ক্যুপে'র ব্যবস্থা। আর তাই আমাকে তাঁদের কাঁথা-কম্বল বিছিয়ে দিতে হয়েছে। তাঁরা জপের মালা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

মালা জপরতা ও নামাবলী গায়ে দেয়া সেই বৈষ্ণবীদের সঙ্গে ঐ একই ক্যুপেতে যাচ্ছে স্বচ্ছ শাড়ি এবং সংকুচিত ও সংক্ষিপ্ত জামা-পরিহিতা তিনটি বিজ্ঞানের ছাত্রী। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ও সহপাঠীদের সঙ্গে শিক্ষা-ভ্রমণে রাজস্থানে চলেছে। জন-তিনেক সহপাঠী রয়েছে এখানে। অধ্যাপকসহ বাকি সকলে

পাশের কামরায়। বৃদ্ধা বৈষ্ণবীরা ছাত্রীদের চাল-চলনে বিরক্ত, আর ছাত্রীরা তাঁদের আচার-বিচারে রোমাঞ্চিত। তবে দু'দলই নিঃশব্দে দু'দলের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছেন। এখন ভালোয়-ভালোয় রাতটা কাটলে হয়।

আমাদের দলের আমরা চারজন পুরুষ রয়েছি এখানে। অন্যান্যরা সবাই মহারাজ ও ব্রহ্মচাবীদের সঙ্গে পাশের কামরায়। আমাদের মধ্যে আবার মাত্র একজন আশ্রমেব শিষ্য। নাম কৃষ্ণচন্দ্র খাণ্ডা। সস্ত্রীক যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। স্ত্রীর সিট পড়েছে পাশের কামরায়। ব্রহ্মচারীদের বহু অনুবোধ করেও তিনি তাঁকে এখানে আনতে পারেন নি। স্বভাবতই একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শ্রীখাণ্ডা মেদিনীপুরের লোক। বয়সে প্রবীণ। তাঁর মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় তেলহীন ঝাঁকড়া চুল, গায়ে নামাবলী। দামোদর ব্রত শুরু হয়ে গেছে। এ সময় ভক্ত-বৈষ্ণবদের তেলের ব্যবহার ও ক্ষৌবকর্ম নিষিদ্ধ।

আমার অন্য দু'জন সহযাত্রীব নাম কার্তিক বসু ও গোবিন্দ চক্রবর্তী। বোসবাবুও বয়সে প্রবীণ। ছোট-খাটো শান্ত-শিষ্ট ভদ্র চেহারা। বালিগঞ্জ প্লেসে থাকেন। অবিবাহিত—সংসারে আপন বলতে বিধবা মা। কলকাতার একটি সওদাগরী অফিসে চাকরি করেন।

গোবিন্দ আমার সমবয়সী, তবে অতিশয় স্বাস্থ্যবান। অবস্থাপন্নও বটে। দক্ষিণ-কলকাতায় নিজের বাড়ি। বাড়ীতে স্ত্রী ও একটি ছেলে আছে। ছেলেটির বয়স বছর দশেক। চাল-চলন দেখে বুঝতে পারছি, গুরুমহারাজের শিষ্য না হলেও নিয়মিত আশ্রমে আসে এবং কীর্তনে অংশ নেয়। আমার মতো আনকোরা নয়।

কথায় কথায় বোসবাবু বললেন, "আমি আনন্দময়ী মায়ের শিষ্য।"

"তাই নাকি, এই কথাটা বলেন নি এখনও!" চক্রবর্তী চিৎকার করে ওঠে।

বোসবাবু শান্তস্বরে জবাব দেন, "ওটা আর এমন কি কথা যে, গাড়িতে উঠেই বলতে হবে?"

"আনন্দময়ীর কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছেন?" চক্রবর্তী প্রশ্ন করে।

"না, মা তো নিজে দীক্ষা দেন না।" বোসবাবু উত্তর দেন।

"কে দেন তাহলে?"

"দিদিমা, মানে, আনন্দময়ী মায়ের মা।"

"তিনি বেঁচে আছেন এখনও?"

"হ্যাঁ।"

"তা, দীক্ষা নেবার জন্য আপনাকে কি কি করতে হল?"

"কি আবার করতে হবে! মা কলকাতায় এসেছেন শুনে একদিন তাঁর কাছে গেলাম, বললাম সব কথা। তিনি পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে অভুক্ত অবস্থায় আশ্রমে যেতে বললেন। গেলাম, দীক্ষা হয়ে গেল।"

"হয়ে গেল!" চক্রবর্তী চেঁচিয়ে ওঠে। সে আমার দিকে তাকায়। আমি অনভিজ্ঞ মানুষ, তার মৌন-জিজ্ঞাসার মর্ম উদ্ধার করতে পারি না। চুপ করে থাকি। চক্রবর্তী [illegible]। সে কৃষ্ণবাবুর দিকে তাকায়। তিনি একটু হাসেন। আর [illegible]! চক্রবর্তী অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ প্রাণভরে হেসে নিয়ে সে বোসবাবুকে বলে, "আরে মশাই, দীক্ষা ব্যাপারটা কি অত সহজ! কি বলেন খাণ্ডাপ্রভু?"

"বটেই তো", খাণ্ডা সায় দেন, "এই যে আমি এবং আমার স্ত্রী গুরুমহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছি........"

"দণ্ডবৎ প্রভু, দণ্ডবৎ! ধন্য আপনার জীবন!" মাঝখান থেকে চক্রবর্তী হাতজোড় করে বলে ওঠে।

খাণ্ডা মাথা নত করেন। তারপরে চক্রবর্তীকে বলেন, "সবই তাঁর কৃপা প্রভু, সবই তাঁর কৃপা! কৃষ্ণ কৃপা না করলে সদ্‌গুরু পাওয়া যায় না, আবার সদ্‌গুরু না পেলে কৃষ্ণলাভ হয় না।"

"তাই তো আমি বলছিলাম প্রভু, দীক্ষাটা কি সহজ ব্যাপার?

দেওয়া আর নেওয়া ছুটোরই যোগ্যতা থাকা চাই।” চক্রবর্তী মন্তব্য করে।

“তা আর বলতে! কত কষ্ট করে গুরুর মন পেয়েছি, তা তিনিই জানেন! জয় গুরু, জয় রাধে!”

“আপনি পরম ভক্ত প্রভু, তাই গুরু আপনাকে কৃপা করেছেন।”

চক্রবর্তী আবার মাথা নুইয়ে খাণ্ডাকে দণ্ডবৎ করে। খাণ্ডাও প্রতি-দণ্ডবৎ করেন। গাড়ির অন্যান্য যাত্রীরা সতৃষ্ণ নয়নে বৈষ্ণব-বিনয় দেখছেন। আর বোসবাবু ও আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছি।

দণ্ডবৎ শেষ হবার পরে খাণ্ডা চক্রবর্তীকে বললেন, “আপনিও কম ভক্ত নন প্রভু।”

“না না, এ কি বলছেন? আমার যে এখনও দীক্ষাই হল না।” চক্রবর্তীর কণ্ঠে হতাশা।

“হবে, এবারে হয়ে যাবে।”

“[illegible]

[illegible]রে আমি গুরুকৃপা লাভ করব?”

“নিশ্চয়ই!”

চক্রবর্তী নির্বাক। মনে হচ্ছে আনন্দে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমি তেমনি চুপ করে আছি। ছুই ভক্তের এই আলোচনায় আমার স্থান কোথায়? আমি তাই বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। তুফান এক্স্প্রেস চলেছে ছুটে। চলেছে একদল ভক্ত-বৈষ্ণবকে নিয়ে মথুরার পথে।

“আপনিও ভক্ত প্রভু!”

“আমাকে বলছেন?” চমকে পাশে তাকাই। আমার পাশে খাণ্ডা।

তিনি একটু হেসে বলেন, “হ্যাঁ প্রভু, আপনাকেই বলছি। বলছি যে, আপনিও ভক্ত—পরম ভক্ত!”

"কিন্তু আমি তো দীক্ষা নিই নি, নেবার কোন ইচ্ছাও নেই।"

খাণ্ডা আবার তেমনি মুচকি হাসেন। বলেন, "এখন না থাকতে পারে, পরে হবে। আরে প্রভু, পূর্ব-জন্মের সুকৃতি না থাকলে কি কেউ এই বন-যাত্রায় আসতে পারে? কৃষ্ণ ভগবান একদিন আপনাকে চরণে আশ্রয় দেবেন।"

কি বলা উচিত বুঝতে পারছি না। তাই চুপ করে থাকি। বোসবাবুর দিকে তাকাই। তিনি একটু হাসেন। ভদ্রলোক সেই যে চুপ করে গেছেন, আর শব্দ করেন নি। এবারেও নীরব থাকেন।

কিন্তু নীরব থাকতে পারে না চক্রবর্তী। থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে বলে ওঠে, "ঠিকই বলেছেন প্রভু। পূর্ব-জন্মের সুকৃতি না থাকলে, আর ভক্ত না হলে কি কেউ ব্রজ-পরিক্রমায় আসতে পারে? তোমারও……এই রে, 'তুমি' বলে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না দাদা।"

"না না, মনে করার কি আছে!" আমি তাড়াতাড়ি বলি, "বেশ তো, আমাকে 'তুমি' করেই বলবেন।"

"তা হয় না।" চক্রবর্তী আপত্তি করে।

জিজ্ঞেস করি, "কেন?"

"তাহলে যে আমাকেও আপনার 'তুমি' বলতে হবে!"

"বেশ, বলব।" সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাই।

"আরে ভক্ত না হলে কি এমন সরলপ্রাণ হয়? আপনিই বলুন প্রভু!" সে খাণ্ডার দিকে তাকায়। খাণ্ডা মাথা নাড়ে। চক্রবর্তী খুশি হয়।

আমিও খুশি হই। কিন্তু সে প্রসঙ্গে কিছু বলার আগেই বাইরের দিকে নজর পড়ে। গাড়ির গতি কমে এসেছে। বর্ধমান এসে গেল। সকালে তাড়া-হুড়ায় খেয়ে আসা হয় নি। কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। আমি উঠে দাঁড়াই।

চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাচ্ছ?"

"প্ল্যাটফর্মে।"

"কেন?"

"খিদে পেয়েছে। তোমরা খাবে নাকি কিছু?"

"না, আমরা তো আশ্রম থেকে প্রসাদ পেয়ে এসেছি। গরম গরম অন্ন, ঘি, ডাল…"

তাহলে আমার আশঙ্কা অমূলক নয়। এঁরা দিনে আর কোন খাবার দিচ্ছেন না। অথচ আমাকে বলেছিলেন, বাড়িতে খেয়ে আসার দরকার নেই।

কিন্তু এখন আর সেকথা ভেবে লাভ কি? বড্ড খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ি।

আমিষ ও নিরামিষ দু'রকমের খাবারই পাওয়া যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমিষ খাবার এলো। গাড়িতেও অনেকে খাবার নিচ্ছেন। কিন্তু ভাত খেতে হলে জায়গায় বসে খেতে হবে। সেটি সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে ব্রজ-পরিক্রমায় চলেছি। বাধ্য হয়ে ঠাণ্ডা সিঙ্গারা ও মিহিদানা দিয়ে পেটের তাগিদ খানিকটা কমিয়ে নিই।

গাড়ি ছুটে চলেছে। কিন্তু গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে কানে আসছে হুল্লোড়ের শব্দ। ক্যুপেতে বসে ছাত্র-ছাত্রীরা 'চিকেন-কারি' খাচ্ছে। তিন বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁদের কোন সাহায্য করাই সম্ভব নয়। আমি শুয়ে পড়ি।

আস্তে আস্তে গাড়ির গোলমাল কমে আসছে। অনেকেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছেন। কারও বা ইতিমধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেছে। কেবল ঘুম নেই ওদের চোখে—তরুণ ও তরুণী বৈজ্ঞানিকদের। তারা সমানে হুল্লোড় করে চলেছে। অনেকেই বিরক্ত বোধ করছেন। মৃদুকণ্ঠে নানা মন্তব্যও করছেন। শুনে হাসি পাচ্ছে আমার—বিশ বছর বাদে জন্মালে যে আমরাও ওদেরই মতো মাতিয়ে রাখতাম তুফান এক্সপ্রেসের এই কামরাটিকে। আর বিশ বছর বাদে ভাবীকালের তরুণ-তরুণীদের

দেখে এই ছাত্র-ছাত্রীরাও হয়তো আমাদেরই মতো মন্তব্য করবে। নূতনের প্রতি পুরাতনের ঈর্ষা চিরন্তন।

শুয়ে বসে ও গল্প করে দিনটা কেটে গেল। ইতিমধ্যে কেবল বারছয়েক বৃদ্ধাদের জল এনে দিয়েছি। একবার শুধু একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কোন অসুবিধে হলে বলবেন।"

"কি কইলা?" প্রবীণতমা বৈষ্ণবী বলে উঠেছিলেন, "অসুবিধা? খুবই হইতে আছে। কিন্তু কি করমু, চউক্ কান বুইজা কোন রকমে দাঁতে দাঁত লাগাইয়া বইস্যা আছি। ক্যাবল ভগবানরে ডাকতে আছি। বলতে আছি—বাবা, তুমি আমারে তাড়াতাড়ি মথুরা লইয়া চলো, আমি যে আর ছ্যাখ্‌তে পারতেছি না!"

আমি তাঁকে কিছু বলার আগেই একটি ছাত্রী তার পাশের ছাত্রটিব দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছে। ছাত্রটি বলে উঠেছে, "হ্যাঁ, আমাদের নামেই 'কম্‌প্লেন' করছে মনে হচ্ছে!"

ব্যাপারটা ভাল নয় বুঝতে পেরে আমি তাড়াতাড়ি ক্যুপে থেকে পালিয়ে এসেছি। আর ও-মুখো হই নি।

সন্ধ্যার পরে গাড়ি এসে পাটনা থামল। ঠাণ্ডা সিঙ্গারা হজম হয়ে গেছে বহুক্ষণ। বর্ধমানে যাঁরা ভাত খেয়েছিলেন, তাঁরা রাতের খাবার নিচ্ছেন। কাজেই বোসবাবুব সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে নেমে আসি। চক্রবর্তী ও খাণ্ডা পথের খাবার খাবেন না।

বোসবাবু চা খান না। আমি এক ভাঁড় চা হাতে নিয়ে তাঁকে খাবারের খোঁজ করতে বলি। কিন্তু তিনি এগিয়ে যাবার আগেই চক্রবর্তীর ডাক কানে আসে, "এই যে বোসবাবু! খাবার এসে গেছে। গাড়িতে উঠে আসুন!"

যাক্ গে, তাহলে এঁরা রাতের খাবার দিচ্ছেন! তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে আসি।

দু'জন ব্রহ্মচারী পেতলের বালতিতে করে খাবার নিয়ে এসেছেন। জায়গায় বসতেই তাঁদের একজন এক টুকরো খবরের কাগজ আমার হাতে দেন।

দু'হাতে কাগজখানি ধরি। ওঁরা তার ওপরে কয়েকখানি পুরি ও এক হাতা শুকনো আলুর দম দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। কোন-রকমে কাগজখানি কম্বলের ওপর রাখি। চক্রবর্তী হেঁকে ওঠে, "রেখে দিলে কেন? তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, ভোগের প্রসাদ।"

"খাচ্ছি।" থতমত খেয়ে খেতে শুরু করি। পুরিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে চামড়ার মতো শক্ত হয়ে গেছে। হবেই তো, কাল রাতে ভাজা হয়েছে যে!

নজর পড়ে পাশের সিটেব মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের দিকে। তিনি নিরামিষ খাবার নিয়েছেন, ভাত ডাল ভাজা তরকারী আচার পাপর ও দই। ক্যুপের ভেতর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেব কথা ভেসে আসছে। ওরা 'চিকেন' ও 'মাটন'-য়ের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করছে।

আমিষের আলোচনা থাক, এক প্লেট নিরামিষ খাবার নিলেও জঠরাগ্নির জ্বালা মিটতে পারত। কিন্তু আমি যে তীর্থযাত্রী—দামোদর ব্রতধারী ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে বৃন্দাবন চলেছি। আমি তাই চর্মবৎ পুরি চিবোতে চেষ্টা করি।

চেষ্টা করলেই সংসারের সব মানুষ সব কাজ কবতে পারে না। আমিও পারলাম না। এ পুরি খেয়ে খিদে নিবারণ করার চেয়ে না খেয়ে থাকা অনেক ভালো। কিন্তু এ তো কেবল পুবি-তরকারি নয়, এ যে প্রসাদ! প্রসাদ ফেলে দেয়া পাপ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পাপ কাজই করতে হল আমাকে। আর তা করতে দেখে চক্রবর্তী চেঁচিয়ে উঠল, "সে কি! প্রসাদ ফেলে দিলে?"

"হ্যাঁ ভাই, পেট ভরে গিয়েছে। আর খেতে পারলাম না।"

"তাই বলে প্রসাদ ফেলে দেবে! আমাকে দিলে না কেন?"

"আমার এঁটো খাবার তোমাকে দেব!" এবারে আমার বিস্মিত হবার পালা।

হো হো করে হেসে উঠল চক্রবর্তী। হাসি থামিয়ে খাণ্ডাকে প্রশ্ন করে "শুনলেন প্রভু? ঘোষ কি বলছে? প্রসাদ নাকি আবার

এঁটো হয় ?" তারপরে আমার দিকে ফিরে বলে, "তুমি দেখছি ভাই, নিয়ম-কানুন কিছুই জানো না। বৃন্দাবনে গিয়ে তো বিপদে পড়বে।"

হেসে বলি, "বিপদে পডব কেন? তুমি সঙ্গে রয়েছ তো! তোমার কাছ থেকে নিয়ম-কানুন সব জেনে নেব!"

চক্রবর্তী খুশি হয়। বলে, "তাই কবো। গুরুমহারাজকে বলে তুমি আমাব ঘরে সিট নিও। আমি তোমাকে সব বলে দেব।" বলতে বলতেই তাব নজর পড়ে বোসবাবুব দিকে। তিনি খাবারটা বেখে দিয়ে জোড়াসন কবে চোখ বুজে চুপচাপ বসে আছেন। চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করে, "আবে, বোসবাবু কি সন্ধ্যা করছেন নাকি?"

বোসবাবু চোখ মেলেন না। তেমনি বসে থাকেন। খাণ্ডা ফিসফিস কবে চক্রবর্তীকে বলে, "বোধহয় তাই করছেন।"

চক্রবর্তী মাথা নাড়ে। সে নীরবে বাইবের দিকে তাকিযে বযেছে। বাইরে চাঁদেব আলো। কিন্তু সে কি জ্যোৎস্নালোকিত সমতল বিহাবেব সৌন্দর্য দর্শনের জন্যই অমন নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে? না, ভাবছে—আনন্দময়ী মাযের এক কায়স্থ শিষ্য সন্ধ্যা না কবে খাবাব স্পর্শ কবলেন না, আব সে কিনা গুরুমহাবাজের একজন ব্রাহ্মণ ভক্ত হযেও সন্ধ্যা-আহ্নিকের কথা ভুলে বসে আছে?

কিছুক্ষণ বাদে বোসবাবুর সন্ধ্যা হযে যায়। তিনি আমাদেব দিকে ফিবে পা ঝুলিয়ে বসেন। চক্রবর্তীকে বলেন, "সন্ধ্যাটা সেরে নিলাম।"

"আপনি রেলগাড়িতে বসে সন্ধ্যা কবলেন?" চক্রবর্তী তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" বোসবাবু একটু হাসেন, "ভগবানকে ডাকব, তার আবাব স্থান বিচার কি? তিনি তো সর্বত্র বিচবণশীল। যে কোন জায়গায়, যে কোন সময় তাঁব আবাধনা করা যেতে পাবে।"

চক্রবর্তী আর কিছু বলতে পারে না। বোধহয় বলার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

তুফান এক্স্প্রেস চলেছে ছুটে। আমরা চলেছি ছুটে—চলেছি মধু-বৃন্দাবনে।

কেটে যায় আরও কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যে নানা কথার ভেতর দিয়ে আবহাওয়াটা অনেক হাল্‌কা হয়ে এসেছে। চক্রবর্তী আবার তার খবরদারী শুরু করেছে। অন্যান্য যাত্রীরা শুয়ে পড়ার ব্যবস্থা করছেন, আমরাও বিছানা ঠিক করে নিই।

কিন্তু শুয়ে পড়তে পারি না। সহসা বৈষ্ণবীদের দলনেত্রী ছুটে আসেন। বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করি, "কি ব্যাপার দিদিমা! আপনি এখনও শুয়ে পড়েন নি!"

"পারলাম না বাবা! শুইয়া থাকতে না পাইরা তোমাগো কাছে ছুইট্টা আইলাম। এ তোমরা কোন্ নরকে আমাগো রাইখ্যা দিলা?"

"নরক!" বুঝতে পারি না তাঁর কথা।

তিনি আমার পাশে বসে ফিস ফিস করে বলেন, "নরক ছাড়া আর কি কমু বাবা! সারা দিন তো মেচ্ছ খাদ্য খাইছে, অশ্লীল কথা কইছে। চউক্-কান বুইজ্যা পইড়া রইছি। এহন কি করতে আছে জানো?"

"কি?" চক্রবর্তী প্রশ্ন করে।

"ঘরের বাতি নিবাইয়া, এক এক কম্বলের তলায় এক এক জোড়া পোলা-মাইয়া বইস্যা বইস্যা গপ্প করতে আছে।"

যাক্, বাঁচা গেল! ভাবছিলাম দিদিমা কি না যেন বলে ফেলেন? খাওয়া-দাওয়ার পরে সহপাঠীরা সহপাঠিনীদের সঙ্গে বসে গল্প করছে। শীতের রাত, স্বভাবতই তারা কম্বল গায়ে দিয়ে নিয়েছে। কিন্তু দিদিমা বিগত যুগের মানুষ। এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের এই ঘনিষ্ঠতা বরদাস্ত করতে না পেরে ছুটে এসেছেন এখানে।

কিন্তু কেন? দিদিমা কি করতে বলেন আমাদের? বোসবাবু চুপ করে আছেন, এসব ক্ষেত্রে বোধকরি চুপ করে থাকাই তাঁর স্বভাব। কিন্তু খাণ্ডা আর চক্রবর্তীও চুপ করে আছে। খাণ্ডার কথা

বলতে পারি না। তিনি বৃদ্ধ এবং গাঁয়ের মানুষ। কিন্তু চক্রবর্তী? তার তো এমন নীরব থাকা সাজে না! তার ব্যাপারটা বিস্ময়কর ঠেকছে। সে কি তাহলে ঐ বদমায়েশ ছেলে-মেয়েগুলিকে শায়েস্তা করবার কোন মতলব ভাজছে মনে মনে? কি মতলব? মারপিট করবে? তার গায়ে বেশ জোর। মনে হচ্ছে মারামারিতেও সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তাহলে যে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে! প্রথম কথা ওরা কলকাতার ছাত্র, তার ওপরে দলে ভারী। অবশ্য আমরা সংখ্যায় ওদের চেয়ে বেশিই হব। কিন্তু আমার বৈষ্ণব সহযাত্রীরা আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় যে মোটেই পারদর্শী নয়।

কাজেই চক্রবর্তী কোন ডিসিসান নেবার আগেই বলে ফেলি, "দিদিমা, পাপ মনে করলেই পাপ, নইলে নয়। যে শ্রীশ্রী-রাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ভাবস্বরূপ আব শ্রীরাধিকা প্রাণস্বরূপা, তার মধ্যেও তো কত নাস্তিক কত দোষ খুঁজে বার করেন।"

দিদিমা তাড়াতাড়ি মাথায় হাত ঠেকান। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই আমি আবার বলি, "আমিও তাই বলছিলাম দিদিমা, সহপাঠী ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে বসে একটু গল্প করছে, এতে মনে করার কি আছে? আপনার নাতি-নাতনীরাও যে এই করে থাকে। যে যুগের যা ধর্ম।"

"তাই বলে গাড়ির ভেতরে এমনি বেলেল্লাপনা করবে?" চক্রবর্তী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

গম্ভীর স্বরে বলি, "আমিও সেই কথাই বলছি চক্রবর্তী। এটা তোমার বাড়ি নয়, এটা গাড়ি। এখানে পরের ব্যাপার নিয়ে অমন চেঁচামেচি না করাই ভাল।"

চক্রবর্তী আমার এ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত নয়। সে ধমক খেয়ে চুপ করে থাকে। আমি শান্তস্বরে দিদিমাকে বলি, "আপনি চলুন দিদিমা, আমি আপনাকে জায়গায় রেখে আসছি।"

এবারে দিদিমা একেবারে ভেঙে পড়েন। করুণ স্বরে বলেন, "আমি এট্টা কথা কইতেছেলাম বাবা!"

"কি কথা?" জিজ্ঞেস করি।

"কইতেছেলাম যে, তোমরা একজনে যদি আমার জাগায় গিয়া শোও, তাইলে আমি সেই জাগায় শুইতে পারতাম।"

একটু হেসে বলি, "তা তো হবার নয় দিদিমা, আপনাদের ঐ খুপরিটা মেয়েদের জন্য। ওখানে তো আমরা কেউ শুতে পারব না।"

"ক্যান্, ঐ পোলাগুলান শুইছে যে?"

আবার একটু হাসতে হয়। বলি, "ওরা গল্প করছে। গল্প শেষ হলে নিজেদের জায়গায় এসে শোবে।"

"ছাই শুইবে! তোমারে আমি কইয়া রাখলাম বাবা, ঐ হ্যামরা-ছামরীরা জোড়ায় জোড়ায় আইজ রাইতে ফুলশইয্যা করবে।"

"না না, তা কি করে হয়! আপনি চলুন!" আমি দিদিমাকে এক রকম জোর করেই ক্যুপের সামনে নিয়ে আসি।

দিদিমা বলেন, 'বাতিটা জ্বালাও, অন্ধকার!"

কথাটা মিথ্যে নয়। আমি হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপি, ক্যুপের আঁধার ঘুচে যায়। দিদিমার সহযাত্রী বৈষ্ণবীরা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ছেলে-মেয়েরা কিন্তু জেগেই রয়েছে। আলো জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই, বিশেষ করে মেয়েরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

আমার পক্ষে এখন এখানে দেরি না করাই ভাল। তাই দিদিমাকে শুইয়ে দিয়ে, আলো নিভিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসি নিজের জায়গায়।

॥ দুই ॥

এমনিতেই সকালে ওঠার অভ্যাস, তার ওপরে গাড়িতে আবার ভাল ঘুম হয় না আমার। তাই সবার আগে উঠে বাথরুমের ব্যাপারটা সেরে নিই। আজও তাই করলাম।. আমার পরে বোসবাবু উঠলেন, তারপরে খাণ্ডা। সবার শেষে চক্রবর্তী।

সে কিন্তু উঠেই চেঁচামেচি শুরু করে দিল, "এরই মধ্যে বাথরুমে ভিড় পড়ে গেছে! আমার যে আবার ঘুম থেকে উঠেই বাথরুমে যাবার অভ্যেস!"

হেসে বলি, "তোমাকে আমি কালই বলেছি চক্রবর্তী, এটা তোমার বাড়ি নয়, গাড়ি। এখানে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে বাথরুম খালি পাওয়া যায় না।"

"সে তো বুঝলাম, কিন্তু আমি এখন কি উপায় করি?"

"কেন, প্রেসার কি খুবই বেশি?"

"হ্যাঁ।"

"বাথরুমে কারা রয়েছে?"

"বোধহয় ছাত্র-ছাত্রীরা।"

"যাও না, গিয়ে একটু বলো। ওরা তোমাকে একটা বাথরুম ছেড়ে দেবে।"

"আমার লজ্জা করছে!" সলজ্জ স্বরে চক্রবর্তী বলে।

"আচ্ছা, চলো দেখি!" চক্রবর্তীকে নিয়ে বাথরুমের সামনে আসি। ছাত্র-ছাত্রীরা চারজন দাঁত মাজছে। বুঝলাম ওদেরই দু'জন বাথরুমে ঢুকেছে।

বিনীত স্বরে বলি, "ভাই! আপনাদের কেউ কি বাথরুমে গেছেন?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো?" একটি ছেলে পাল্টা প্রশ্ন করে।

"তাদের একজনকে যদি একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে বলেন, বড়ো ভাল হয়।" তারপরে চক্রবর্তীকে দেখিয়ে বলি, "এই ভদ্রলোক একবার বাথরুমে যাবেন।"

"অবস্থা খুব খারাপ বুঝি?" অন্য ছেলেটি মুখ থেকে ব্রাশ বের করে জিজ্ঞেস করে।

আমি মাথা নাড়ি। চক্রবর্তী নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। আর মেয়ে দুটি খিল খিল করে হেসে উঠেছে। তাদের 'বয়-ফ্রেণ্ড'রাও সে হাসিতে যোগ দেয়।

হাসি থামলে আগের ছেলেটি গিয়ে একটা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে চীৎকার করে বলতে থাকে, "এই বিপ্লব, একটু তাড়াতাড়ি বের হ,' এদিকে জনৈক জেণ্ট্‌লম্যানের কেস সিরিয়াস!"

আবার ছেলে-মেয়েব মিলিত কলহাস্য। আমি নির্বাক। চক্রবর্তী দম বন্ধ করে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যিই তার অবস্থা সুবিধের নয়।

ছেলেটি আবার দরজা ধাক্কা দেয়, "এই বিপ্লব! শালা কি করছিস? তাড়াতাড়ি কর!"

এবারে কাজ হয়েছে। ভেতরে খিল খোলার শব্দ হচ্ছে। চক্রবর্তী দরজাব সামনে এগিয়ে যায়। দরজা খুলে বিপ্লব বেরিয়ে আসে। সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে, "এই সংগ্রাম! শালা অমন চেঁচাচ্ছিলি কেন?"

ছেলেটি ইসাবায় চক্রবর্তীকে দেখিয়ে দেয়। বিপ্লব পাশে সরে আসে। আর সেই অবসবে চক্রবর্তী ক্ষিপ্রবেগে বাথরুমে ঢুকে যায় এবং ক্ষিপ্রতর বেগে দরজা বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু আমি তাদের ধন্যবাদ দেবার সুযোগ পেলাম না। কারণ, এবারে তারা গলা ছেড়ে হাসতে শুরু করেছে। আর বিপ্লবও যোগ দিয়েছে সে হাসিতে।

নীরবে নিজের জায়গায় ফিরে চলি। ভাবি, ভাগ্যিস চক্রবর্তী কাল ওদের সঙ্গে মারামারি বাঁধিয়ে বসে নি!

এসে দেখি দিদিমা আমার সিটে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করি, "কি ব্যাপার, আপনি এখানে ?"

"ক্যান্ বাবা, দিনের বেলায় তো আসার কোন বাধা নাই ?"

"না, বাধা নেই। তবে নিজেব জায়গা ছেড়ে······"

"জাগা !" আমাকে শেষ করতে দেন না দিদিমা। প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, "জাগা কইও না, কও নরক। সাল্লা রাইত ঘুমাইতে পারি নাই।"

"কেন ?"

"জিগাও আবাব ! ঐ ছ্যামরা-ছ্যামরীগুলান জ্বালাতন করছে। কি না করছে বাবা, সব করছে।"

"থাক্ গে ওসব কথা। বেশ তো, আপনি এখানেই থাকুন।" তাড়াতাড়ি সন্ধি কবি।

চক্রবর্তী ফিরে আসে। চোখে-মুখে খুশির হাসি। গোপাল ভাঁড়েব সেই 'কোষ্ঠসাফ্' গল্পটিব কথা মনে পড়ছে। কিন্তু মুখে কিছুই বলি না, কেবল চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে থাকি। বোসবাবু এবং সেনবাবুও তাকে দেখছেন।

সে জায়গায় বসে। বলে, "ছেলে-মেয়েগুলি ফাজিল হতে পারে, কিন্তু বেশ কন্সিডাবেট্, মানে পরোপকারী।"

"কি কইলা ? তুমি কারগো কথা কইতে আছো ?"

এই বে, সেরেছে ! তাড়াতাড়ি চক্রবর্তীকে একটা চিমটি কাটি। সে চুপ কবে থাকে।

কিন্তু তাতে কোনই লাভ হয় না। দিদিমা বলে চলেন, "উপ্কার ! উপ্কার করা অরগো কুষ্ঠিতে ল্যাখা নাই। নাইলে অরা এই বুড়ীগুলানরে সমস্ত রাইত ঘুমাইতে ছায় না !" একটু থামেন তিনি। তারপরে চক্রবর্তীর দিকে ফিরে আবার বলেন, "কি না করছে বাবা, সব করছে।"

কিন্তু কালকের মতো চক্রবর্তী আজ আর ক্ষেপে [illegible] বরং সে দিদিমাকে শান্ত করতে চায়। বলে, "[illegible] দিদিমা,

ওরা তো আর আপনার বা আমার বাড়ির ছেলে-মেয়ে নয়। তাছাড়া কথা বলে দেখলাম, সবাই ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রী, লেখাপড়ায় ভাল। শিক্ষা-ভ্রমণে রাজস্থান যাচ্ছে, আগ্রাতে নামবে। আমি ওদের ফেরার পথে বৃন্দাবন দর্শন করে যেতে বলেছি। সে-সময় আমরাও বৃন্দাবনে থাকব কিনা।"

"এ তুমি কী করলা বাবা?" দিদিমা গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন।

"কেন, কি হয়েছে?"

"ওই মেলেচ্ছগুলান বৃন্দাবনে গ্যালে যে বেরজোধাম অপবিত্র হইয়া যাইবে।"

চক্রবর্তী কিন্তু তাঁকে সমর্থন করতে পারে না। বরং সে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেই ওকালতি করে, "এ আপনি কি বলছেন দিদিমা? ব্রজধাম যে সর্বপাপহারী শ্রীহরির লীলাভূমি। সে পুণ্যভূমি কলুষিত হবে কেন? বরং পাপীর পরিত্রাণের জন্য সে আরও বেশি পবিত্র হয়ে উঠবে।"

এর পরে কেবল একটা কথাই বলা যেতে পারে—একি কথা শুনি আজ চক্রবর্তীর মুখে! কিন্তু তা বলার সুযোগ নেই। আর সময়ও নেই। কানপুর এসে গেছে, এবারে পেটভরে কিছু খেয়ে নিতে হবে।

যথারীতি ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেকফাস্ট এলো—টোস্ট ওমলেট ও পট-এর চা। আমার ওসব খাবার অধিকার নেই—আমি ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে বৃন্দাবনে চলেছি। তাই প্ল্যাটফর্মে নেমে সিঙ্গারা ও মিষ্টি খেয়ে ওমলেটের লোভ সংবরণ করি।

একটু বাদেই খাওার ডাক কানে আসে, "প্রভুরা, চলে আসুন। প্রসাদ এসে গেছে।"

গাড়িতে উঠে আসি। একজন ব্রহ্মচারী তেমনি খবরের কাগজ আর পেতলের বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা কা[illegible] তিনি হেঁকে ওঠেন, "কোথায় থাকেন মশাই, [illegible]তে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়!"

"আজ্ঞে প্রভু, অপরাধ নেবেন না। একটু পায়চারি করছিলাম।" চক্রবর্তী হাতজোড় করে।

"নিন, এবারে প্রসাদ নিন।" ব্রহ্মচারী অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলেন। তিনি আমাদের এক টুকরো করে খবরের কাগজ দেন। তারপরে বালতির ঢাকনা সরান। নামমাত্র দৈ দিয়ে চিড়ে মাখা হয়েছে—শক্ত ও সাদা। চিনির পরিমাণ না খেয়ে বোঝার উপায় নেই।

ব্রহ্মচারী সেই কাগজের ওপরে তারই এক-একদলা প্রসাদ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যান। বার বার ফেলে দেওয়া ভাল দেখায় না। ওরা সবাই ভক্তিভরে খাচ্ছে। অতএব আমাকেও কষ্ট করতে হয়। খুবই কষ্ট হচ্ছে। গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। তবু কোনমতে গলাধঃকরণ করে ফেলি। আমি যে ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে বৃন্দাবনে চলেছি।

"প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।" চক্রবর্তী হাতজোড় করে খাণ্ডাকে বলছে।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর! ভক্ত হঠাৎ বৈষ্ণবের প্রতি এমন ভক্তিময় হয়ে উঠল কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না। অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছি। আর সবচেয়ে বড় কথা, খাণ্ডারও একই অবস্থা। মনে হচ্ছে তিনিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। তবে তিনি 'সীনিয়র' ভক্ত। তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চক্রবর্তীর প্রতি হাতজোড় করে ফেলেছেন। এটাই বৈষ্ণব-রীতি।

চক্রবর্তী বলে চলে, "কাল রাতে একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছি প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"কি করেছেন প্রভু?" খাণ্ডা জিজ্ঞেস করেন। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে আছেন।

"কাল রাতে জল খেতে গিয়ে আপনার বিছানাটা ভিজিয়ে ফেলেছি।"

"বিছানা ভিজিয়েছেন! কোথায়? দেখি!" খাণ্ডা হাত

গুটিয়ে নিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি চক্রবর্তীর পায়ের কাছে রাখা তাঁর বিছানাটার দিকে ঝুঁকে পড়েন। চক্রবর্তী ভিজে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়।

"ইস্, এ যে দেখছি সারা বিছানাটাই ভিজিয়ে ফেলেছেন মশাই!" তাঁর কণ্ঠে বিরক্তি। আর তাই তিনি বোধহয় প্রভুর বদলে 'মশাই' শব্দটি ব্যবহার করলেন। বটেই তো, নিজে না শুয়ে সযত্নে বিছানাটি রেখে দিয়েছেন। এখন তিনি স্ত্রীর কাছে কিকৈফিয়ৎ দেবেন?

চক্রবর্তী আবার হাতজোড় করে সবিনয়ে বলে, "জলটা পড়ে গেল প্রভু, অপরাধ মার্জনা করবেন!"

কিন্তু খাণ্ডা তার অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন না। তিনি শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চক্রবর্তীকে বলেন, "যা হবার তা তো হয়েই গেছে।"

চক্রবর্তী নীরব। তবে সে এখনও হাতজোড় করে রয়েছে। আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিই। ছাত্র-ছাত্রীদের চেঁচামেচি কানে আসছে। আজ সকালে আরও কয়েকটি ছেলে-মেয়ে পাশের কামরা থেকে এসে ওদের দলবৃদ্ধি করেছে। খাওয়া আর তাসখেলা সমানে চলেছে।

দিদিমা সেই যে তাঁর জায়গা ছেড়ে এখানে এসেছেন, আর ও-মুখো হন নি। এতক্ষণ তিনি চুপচাপ ছিলেন। এবারে কথা বলেন। কথা নয়, আদেশ, "এই সব ছাই-ভস্মের কথা রাইখ্যা, এট্টু ভাল কথা কও।"

"ভাল কথা!" চক্রবর্তী বিস্মিত।

"হ্যাঁ, ধম্মকথা।" দিদিমা বলেন।

"ধর্মকথা তো বৃন্দাবনে গিয়েই শুনতে পাবেন!" চক্রবর্তী এড়াতে চায়।

কিন্তু দিদিমা অত সহজে ভুলবার পাত্রী নন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, "ক্যান্, এহানে শোনাইলে কি কোন ক্ষেতি আছে?"

চক্রবর্তী অপ্রস্তুত। কোনমতে সামলে নিয়ে বলে, "না।"

"তাইলে কও, চুপ কইরা আছো ক্যান্ ?"

চক্রবর্তী তবু নীরব। এবারে দিদিমা নির্ঘাৎ ক্ষেপে যাবেন। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি, "কি শুনবেন দিদিমা, রামায়ণ ?"

সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকান তিনি। স্নিগ্ধ স্বরে বলেন, "বাইচ্যা থাকো বাবা! তাই কও, রামায়ণের কথাই কও!" তিনি ঠিক হয়ে বসেন।

চক্রবর্তী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

আমি বলি, "আপনি তো জানেন দিদিমা, আমরা মথুরা চলেছি!"

"আহা, তাও জানি না! শ্রীকৃষ্ণেব জন্মভূমি মথুরা—পরম পবিত্রভূমি!" দিদিমা আবার কপালে হাত ঠেকান।

আমি বলতে শুরু করি, "লঙ্কা বিজয়েব পরে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তিনি ভরতেব কাছ থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করে সুখে বাজত্ব শুরু করলেন। কিছুকাল বাদে একদিন সনক, সনাতন, বাল্মীকি, নারদ ও অগস্ত্য প্রভৃতি মহামুনিগণ জানকীবল্লভকে অভিনন্দন জানাতে অযোধ্যায় এলেন। তিনিও পরম সমাদরে তাঁদের বরণ করলেন।

"কুশল-বিনিময়ের পরে কথায় কথায় মহামুনি অগস্ত্য রঘুপতিকে রাক্ষসদের গল্প বলতে শুরু করলেন। বললেন মথুরাপুরীর অধিপতি মধুদৈত্যের কথা।"

আমি থামতেই দিদিমা বলে ওঠেন, "হও না বাবা, সেই কথা! এই বুড়িরে পুণ্যকাহিনী শোনাইলে তোমার অক্ষয় পুণ্য হইবে বাবা!"

হাসি পায় আমার। তবু গম্ভীর স্বরে বলি, "আমার পুণ্য লাভের কথা থাক্ দিদিমা। সে কাহিনী শুনতে আপনার যদি ভাল লাগে, তাহলেই আমি ধন্য হব।"

"ভাল লাগবে না আবার, খুউব ভাল লাগবে। তুমি কও বাবা!"

দিদিমার বোধহয় আর তর সইছে না। তাই বলতে থাকি,

"মধুদৈত্য থেকেই মথুরার নাম হয়েছে। তিনি ছিলেন অতিশয় শক্তিশালী।

"তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে তিনি এক সাংঘাতিক শূল লাভ করেছিলেন। সেই মহাস্ত্র দান করার সময় শিব তাঁকে বর দিয়েছিলেন, এই শূল যার হাতে থাকবে, কেউ তাকে বধ করতে পারবে না।

"সেই মধুদৈত্য একদিন রাবণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে লঙ্কায় গিয়ে রাবণের বোন কুম্ভনসীকে হরণ করে মথুরা তথা মধুপুরীতে নিয়ে এলেন।

"বিভীষণের কাছে খবরটা শুনে রাবণ তো রেগেই আগুন! তিনি সসৈন্যে সাগর পেরিয়ে এলেন। মধুপুরী অবরোধ করে নিজে প্রাসাদ তোরণে উপস্থিত হলেন। মধুদৈত্য তখনও ঘুমিয়ে।

"স্বামী এবং দাদা দু'জনকেই জানতেন কুম্ভনসী। তাই স্বামীকে না জাগিয়ে, ছুটে এলেন তিনি দাদার কাছে। ক্রুদ্ধ রাবণ বোনকে দেখে মোটেই শান্ত হলেন না। বরং আরও রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় সেই দৈত্যটা? আজ আমি তার মাথাটা কেটে নিয়ে তবে লঙ্কায় ফিরব।'

"কুম্ভনসী কেঁদে ফেলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'শূর্পণখার স্বামীকে মেরে তুমি তাকে বিধবা করেছ দাদা, আমাকে তুমি দয়া কর!'

"তাঁর কান্নায় কিন্তু রাবণের মনে বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হল না। তাই কুম্ভনসী তখন চোখ মুছে ছুটে গেলেন প্রাসাদে। শিশুপুত্র লবণকে নিয়ে ফিরে এলেন একটু বাদে। রাবণকে বললেন, 'আমাকে দয়া না কর, তোমার এই ভাগ্নের মুখ চেয়ে অন্তত তোমার ভগ্নীপতিকে ক্ষমা কর দাদা!'

"এইবারে রাবণ শান্ত হলেন। বললেন, 'বেশ, মধুকে ডাক্। সে আমার সঙ্গে চলুক্। আমি অমরাবতী জয় করে ইন্দ্রকে পরাজিত করব।'

"কুম্ভনসী তখন মধুদৈত্যকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাবণের সামনে নিয়ে এলেন। মধুদৈত্য রাবণের চরণ-বন্দনা করে তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।"

"হইয়া গেল?" আমি থামতেই দিদিমা প্রশ্ন করেন।

তুফান এক্‌স্‌প্রেস ছুটে চলেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের তাসখেলাও চলেছে। ওদের বেলযাত্রা অবশ্য আপাতত প্রায় শেষ হয়ে এলো। টুণ্ড্‌লা চলে গেছে অনেকক্ষণ। আগ্রার আর খুব বেশি দেরি নেই। সেখানে গাড়ি পাল্‌টে ওরা যাবে রাজস্থান—যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কবতে। বিজ্ঞানেব সঙ্গে কাব্যেব কি সম্পর্ক জানি না। কিন্তু ভাবী বৈজ্ঞানিকেরা বেলযাত্রাকে কাব্যময় করে তুলতে চেষ্টাব ত্রুটি কবছে না।

তবু কাব্যেব কথা এখন থাক্‌, মহাকাব্যের কথায় ফিরে আসা যাক্‌। আমি দিদিমাকে বামায়ণেব কাহিনী বলছিলাম। একটু হেসে তাঁকে বলি, "না, দিদিমা। মধুদৈত্যের কথা শেষ হয় নি। সেদিন অগস্ত্যমুনি বঘুনাথকে রাবণের অমরাবতী জয়ের কাহিনী বলেছিলেন। বলেছিলেন, মেঘনাদ কেমন করে ইন্দ্রকে পরাজিত করে ইন্দ্রজিৎ নাম লাভ কবেছিলেন, আর সে যুদ্ধে মধুদৈত্য কিভাবে সাহায্য কবেছিলেন বাবণকে। কিন্তু সে কাহিনীর সঙ্গে .মথুবাব কোন সম্পর্ক নেই বলে, আজ তা আব আমি বলব না আপনাকে। আমি শুধু আপনাকে রামায়ণের উত্তবাকাণ্ডে বর্ণিত শত্রুঘ্নের মথুবা-জয়ের কাহিনী বলছি। কারণ সেই থেকেই মথুবামণ্ডল, অর্থাৎ ব্রজধামের ইতিহাস শুরু।"

"তাই ভাল বাবা, তাড়াতাড়ি কও!" দিদিমা আমার আরও কাছে এগিয়ে আসেন। এ রকম অনুগত শ্রোতা পাওয়া ভাগ্যের কথা। মানসীর কথা মনে পড়ছে আমার।*

আমি বলতে শুরু করি, "তারপরে বহুদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে মধুদৈত্য পুত্র লবণকে সেই শিবদত্ত শূল দান করে

* লেখকের 'উত্তরস্যাং দিশি' দ্রষ্টব্য।

বরুণালয়ে গমন করেছেন। লবণ তখন মধুপুরীর অধিপতি। আর এদিকে প্রজারঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র প্রাণপ্রিয়া সীতাকে নির্বাসন দিয়েছেন। সীতা যমুনার তীরে বাল্মীকির আশ্রমে বাস করছেন। মনের অবস্থা যাই হোক্, রামচন্দ্র কিন্তু দক্ষতার সঙ্গেই রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন। এই সময় একদিন যখন তিনি পাত্র-মিত্র ও সভাজনসহ দেওয়ানে বসে আছেন, তখন লক্ষ্মণ এসে জানালেন, 'মহামুনি ভার্গব আপনার দর্শনপ্রার্থী।'

—'আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের দিন লক্ষ্মণ, তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এসো এখানে।'

"লক্ষ্মণ ভার্গব মুনিকে নিয়ে এলেন রাজসভায়। অযোধ্যাপতি তাঁর চরণ-বন্দনা করে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন।

"ভার্গব মুনি বলিলেন, 'রাম! তুমি রাবণ নিধন করে ত্রিভুবন রক্ষা করেছ। কিন্তু ইদানিং যে আমরা আর এক দুর্জনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি!'

—'কে সেই দুরাচার মুনিবর?'

—'মধুদৈত্যের ছেলে ও রাবণের ভাগ্নে লবণ।'

"রামচন্দ্র পাশে দাঁড়িযে থাকা তিন ভাইয়ের দিকে তাকালেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন তিনজনেই করজোড়ে দাদার কাছে লবণ-বধের অনুমতি চাইছেন। কিন্তু রামচন্দ্র কিছু বলার আগেই শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ এবং ভরতকে বললেন, 'তোমরা জীবনে অনেক বড় বড় কাজ করেছ। আর আমি—আমি তো কিছুই করতে পারি নি। আজ তোমরা আমাকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করো না!'

"রামচন্দ্র তাঁর কথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি শত্রুঘ্নকেই লবণ-বধের দায়িত্ব দিলেন। শত্রুঘ্ন খুশি মনে ভার্গব মুনির সঙ্গে মথুরার পথে রওনা হলেন। এত দিনে দাদা তাঁকে একটা মনের মতো কাজ দিয়েছেন। লবণদৈত্যকে বধ করার পর তিনি ত্রিভুবনে যশলাভ করতে পারবেন।

"ভার্গব মুনির সঙ্গে শত্রুঘ্ন চললেন মথুরায়। পথে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হলেন তিনি। আর আশ্চর্য, ঠিক তখুনি লব ও কুশের জন্ম হল। কিন্তু বাল্মীকি সে সংবাদ শত্রুঘ্নকে জানালেন না।

"শত্রুঘ্ন সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার রওনা হলেন মথুরার পথে। পৌঁছলেন ভার্গব মুনির আশ্রমে। শত্রুঘ্নকে বিদায় দেবার আগে মহামুনি ভার্গব তাঁকে কিছু পরামর্শ দিলেন। বললেন, 'লবণকে তুমি মোটেই অবহেলা করো না শত্রুঘ্ন। হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও মধুদৈত্যের পুত্র সে। সংগ্রামে দুর্জয় এই লবণ। তার ওপর সে আবাব শিবদত্ত মহাশূলের অধীশ্বর। সে শূল তার হাতে থাকলে তুমি কিছুতেই তার সঙ্গে পেরে উঠবে না।'

—'তাহলে উপায়?' চিন্তিত শত্রুঘ্ন ভার্গব মুনিকে প্রশ্ন করেন।

—'আছে, উপায় আছে শত্রুঘ্ন। আমি বলছি সে উপায়ের কথা। তুমি মন দিয়ে শুনে নাও। প্রত্যহ সকালে লবণ মৃগয়ায় বের হয়। তখন সে সেই শূল রেখে যায় শিবমন্দিবে। সেই সময়ে, অর্থাৎ মৃগয়া থেকে ফিরে আসার পথে তাকে তোমাব আক্রমণ করতে হবে। অস্ত্রহীন লবণ তখন তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে না। তুমি অনায়াসে তাকে বধ করতে পারবে।'

"মুনিবরকে প্রণাম করে শত্রুঘ্ন এগিয়ে চললেন মথুরার পথে। তিনি সসৈন্যে যমুনা পেরিয়ে মথুবায় পৌঁছলেন। পরদিন সকালে লবণ মৃগয়ায় চলে যাবার পরে শত্রুঘ্ন তাঁর শিবমন্দির অবরোধ করলেন।

"যথাসময়ে লবণ মৃগয়া থেকে ফিরে এলেন। শত্রুঘ্ন আক্রমণ করলেন তাঁকে। নিরস্ত্র হয়েও কিন্তু তিনি যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। গাছ, পাথর প্রভৃতি হাতের কাছে যা পেলেন, তাই ছুঁড়ে মারলেন শত্রুঘ্নকে। আর তারই একটার ঘায়ে শত্রুঘ্ন অচেতন হয়ে পড়লেন। লবণ তখন মৃগয়া নিয়ে ছুটে চললেন শিবমন্দিরের দিকে। উদ্দেশ্য শূল নিয়ে ফিরে এসে শত্রুঘ্নকে বধ করা।

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আর সে সুযোগ পেলেন না। একটু বাদেই শত্রুঘ্নের জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি পলায়নরত লবণের দিকে বিষ্ণুবাণ যোজনা করলেন। বিপদ বুঝে লবণ ঘুরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আমাকে একটু সময় দাও শত্রুঘ্ন! আমি এখন পর্যন্ত জলগ্রহণ করি নি। মৃগয়া রেখে একটু জলযোগ করে এখুনি ফিরে আসছি। তখন তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।'

"হেসে শত্রুঘ্ন বললেন, 'আমিও যে উপবাসী লবণ! তুমি ভরা-পেটে যুদ্ধ করবে আর আমি খালিপেটে যুদ্ধ করব? সেটা কি ভাল দেখায়? তার চেয়ে এসো দু'জনেই উপবাসী থেকে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে তুমি একেবারে যমালয়ে গিয়ে উপবাস ভঙ্গ করবে।'

"শত্রুঘ্নের উপহাসে লবণ ক্ষেপে গেলেন। তিনি তাঁকে মারবার জন্য এলেন এগিয়ে। আর শত্রুঘ্ন সুযোগ বুঝে তখুনি নিক্ষেপ করলেন বিষ্ণুবাণ। বাণ গিয়ে বিঁধল লবণেব বুকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে……"

"জয় রাধে, জয়…" চক্রবর্তী চেঁচিয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে থামতে হয় আমাকে।

দিদিমাও বিরক্ত হলেন চক্রবর্তীর আচরণে। তিনি তাকে ধমক লাগালেন। বললেন, "তুমি আবার এয়ার মইধ্যে রাধাকৃষ্ণবে ক'থায় পাইলা বাপু? এয়া হইল গিয়া রামায়ণের কথা!"

"সবই তাঁর লীলা দিদিমা, সবই তাঁর লীলা! যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ!"

"আরে রাইখ্যা দেও তোমার ঐ সকল বড় বড় কথা। আমারে মধুরার কথা শোন্‌তে দেও।" দিদিমা আবার ধমক দেন চক্রবর্তীকে।

সে আর কিছু বলতে সাহস পায় না। চুপ করে থাকে। দিদিমা আমাকে বলেন, "কও বাবা, কি কইতে আছিলা? কও, হেয়ার পরে কি হইল?"

"লবণকে নিহত হতে দেখে," আমি শুরু করি, "দেবগণ স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টিসহ শত্রুঘ্নের জয়ধ্বনি করে উঠলেন। সন্তুষ্ট ব্রহ্মা এসে

দাঁড়ালেন শত্রুঘ্নের সামনে। বললেন, 'লবণকে হত্যা করে তুমি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের শঙ্কা নিবারণ করেছ। এই মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আমি তোমাকে বর দান করব। বল, কি তোমার প্রার্থনা?'

"আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন দেবাদিদেব! আমি যেন এই মধুপুরীতে জনপদ প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আর আপনি সেই জনপদে চিরবিরাজ করবেন।'

'তথাস্তু!' বলে পদ্মযোনি ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। যাবার সময় শত্রুঘ্ন প্রণাম করলেন তাঁকে।

"তারপরে শত্রুঘ্ন নগর নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন। বন ও উপবন পরিষ্কার করে বাড়ি-ঘর ও সরোবর তৈরি হল। প্রতিবেশী রাজ্য থেকে দলে দলে মানুষ এসে সেই নবনির্মিত নগরে বসবাস শুরু করল। এলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এলো পশু-পক্ষী। এলো ময়ূর-ময়ূরী। মথুরামণ্ডল রমণীয় রাজ্যে পরিণত হল। আর রামানুজ শত্রুঘ্ন সুখে রাজত্ব করতে থাকলেন সেখানে।"

"আহা, কি অপূর্ব কথা তুমি বাব' শোনাইলা আমারে। ভগবান বাসুদেব তোমার ভাল করবেন। তোমার ব্রজো-মণ্ডল পরিক্রমা সফল হইবে।" বৃদ্ধা বার বার আশীর্বাদ করলেন আমাকে। তারপরে বললেন, "আচ্ছা, আমি তাইলে এহন আমার জাগায় যাই, দেহি ঐ মেলেচ্ছ মাইয়াগুলান সেহানে কতদূর নরককুণ্ড বানাইয়া রাখছে।"

দিদিমা চলে যাবার পরে বোসবাবু কথা বলেন। ভদ্রলোক এমনিতেই স্বল্পভাষী এবং চিন্তাশীল। তার ওপর স্বাভাবিকভাবেই তিনি বোধহয় চক্রবর্তীকে এড়িয়ে চলতে শুরু করছেন। তাই কাল সেই দীক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনার পরে আর বড় একটা কথাবার্তা বলেন নি। কিন্তু আজ দিদিমা চলে যাবার পর সহসা তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেন, "আচ্ছা, রামায়ণের এই বর্ণনা থেকে আপনার কি মনে হয়, ঘোষবাবু?"

হেসে বলি, "আপনি আপনার মতটা বলুন না, দেখি আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি কি না?"

বোসবাবু বলেন, "আমার মনে হয়, রামচন্দ্রের রাজত্বকালের প্রথমদিকেও মথুরায় যাদবগণ রাজত্ব করছিলেন। তখনও সেখানে চাতুর্বর্ণ্য সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় নি। রাজা দশরথের সময় এখানে রাজা ছিলেন মধু এবং তাঁর নাম থেকেই মথুরা-মণ্ডলের প্রাচীন নাম হয়েছিল মধুপুরী। শত্রুঘ্ন লবণকে পরাজিত করে এখানে অযোধ্যা-মণ্ডলের সাময়িক উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ফলে মথুরা-মণ্ডলে চাতুর্বর্ণ্য আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আবার সম্ভবত তখন থেকেই মধুপুরীর নাম হয় মথুরা। মনুসংহিতায়ও মথুরা নামের উল্লেখ নেই। মথুরা নামটি প্রথম পাওয়া যায় মহাভারতে। কাজেই মনে হয় মনুসংহিতা রচিত হবার পরে এবং মহাভারত রচনার আগে মধুরার অপভ্রংশ মথুরা নামটি প্রচলিত হয়েছে।

"কানিংহাম অনুমান করেছেন, বর্তমান মথুরা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে মহোলি নামে যে ছোট্ট গ্রামটি আছে, সেখানেই ছিল মধুদৈত্যের মধুপুরী। পরে শত্রুঘ্ন বর্তমান ভূতেশ্বর মন্দিরের কাছে কাট্রা গ্রামে জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন।*

"আবার অনেকে বলেন, পরবর্তীকালে যমুনার গতিপথ পরিবর্তিত হয়। তখন যাদবগণ আবার যমুনার তীরে জনপদের পত্তন করেন। মহাভারতে সেই জনপদই মথুরা নামে খ্যাত হয়েছে। এবং এই মথুরার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শত্রুঘ্ন প্রতিষ্ঠিত মধুরা বা শূরসেনা নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত হয়ে যায়। সেই অরণ্যই এখন মধুবন নামে পরিচিত। অর্থাৎ মধুবনেই ছিল শত্রুঘ্নের রাজধানী শূরসেনা নগরী।"

॥ তিন ॥

সবার সঙ্গে আমিও মালপত্রসহ প্ল্যাটফর্মে নেমে আসি। প্রায় তিরিশ ঘণ্টা বন্দী থাকার পরে তুফান এক্সপ্রেসের হাত থেকে মুক্তি পেলাম—মথুরা পৌঁছলাম।

বৃন্দাবন আশ্রমের অধ্যক্ষ বৃন্দাবন মহারাজ সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন সবাইকে। বললেন, "বাইরে বাস দাঁড়িয়ে আছে, মালপত্র নিয়ে সেখানে চলে যান।"

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে গেটের বাইরে আসি। মাঝারি আকারের ছিমছাম রেল-স্টেশন মথুরা। স্টেশন প্রাঙ্গণটি বাঁধানো। সেইখানেই সাইকেল-রিক্সা, টাঙ্গা, ট্যাক্সি ও বাসস্ট্যাণ্ড। মথুরা থেকে বৃন্দাবন ছ' মাইল। মূলতঃ এই পথটুকু যাবার জন্যই এত আয়োজন। তবে মথুরা থেকে বাস চলে জেলার প্রায় সর্বত্র। ইচ্ছে করলে বাসে চড়েও দ্বাদশ-বন দর্শন করা যায়। এখন তো আর বন নেই, শহর হয়ে গেছে। অধিকাংশ বনেই তৈরি হয়েছে বাস-পথ।

মথুরা থেকে বৃন্দাবন রেলগাড়িতেও যাওয়া যায়। কিন্তু সারাদিনে মাত্র দু'খানি গাড়ি। তাই অধিকাংশ যাত্রী বাস, রিক্সা কিংবা টাঙ্গা করেই বৃন্দাবন যাওয়া-আসা করেন।

আমাদের বাসের কাছে কয়েকজন ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যাত্রীদের মালপত্রের তদারকি করছেন। তাঁদেরই একজনের হাতে বিছানা ও বাক্সটি সঁপে দিয়ে বাসে উঠে আসি। হিমালয়ের পথে বাসে চড়ে সামনের দিকে বসার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। তাই ড্রাইভারের পেছনের সিটগুলি খালি দেখে তারই একটিতে বসতে যাই।

"আরে আরে,···কি করতে আছেন মশায়? সামনে দিকে ক্যান্, প্যাছনে যান। সামনে মহারাজারা বসবে, আমরা বসুম।"

চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখি, নরেনবাবু—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র কর্মকার। গুরুমহারাজের বাল্যবন্ধু এবং আশ্রমের অন্যতম কর্মকর্তা। এই যাত্রায় যোগদানের ব্যাপারে আমাকে যে ক'দিন আশ্রমে যেতে হয়েছে, প্রায় প্রতিদিনই তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনিই আমাকে গুরুমহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং একমাত্র পরিচিত কর্মকর্তার ধমক খেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কোনমতে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করি, "আমি কোথায় বসব ?"

"যেহানে খুশি বসেন গিয়া। ক্যাবল সামনের দিগে দুই সাইর সিট মহারাজ আর আমাগো লাইগ্যা ছাইড়া দ্যান।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারি। আশ্রমিক 'রিভাইজ্‌ড রুল্‌স'এও সর্বদা 'সীনিয়রিটি' মেনে চলতে হয়। প্রথম সারিতে বসবেন মহারাজারা, অর্থাৎ ক্লাস ওয়ান অফিসাররা। দ্বিতীয় সারিতে ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ক্লাস টু অফিসাররা। নরেনবাবু সন্ন্যাসী না হয়েও অফিসারের মর্যাদার অধিকারী। তিনি আশ্রমের ক্যাশিয়ার-কাম্‌-মার্কেটিং ম্যানেজার।

অতএব নিঃশব্দে এসে পেছনের দিকের একটি সিটে বসে পড়ি।

এতক্ষণে সবাই এসে পৌঁছলেন। স্বাভাবিকভাবেই জায়গা নিয়ে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মচারীদের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

সবার শেষে বাসে উঠে এলেন বৃন্দাবন মহারাজ। বলা বাহুল্য তাঁর জায়গা রিজার্ভ করা ছিল। তিনি আসন গ্রহণ করতেই ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিলেন। আর সেই সঙ্গে গুরুমহারাজ বলে উঠলেন, "বল, চুরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা কী ?"

"জয় !" সমবেত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে আমিও গলা মেলাই। একবার, দু'বার, তিনবার। তারপরে মহিলারা একযোগে উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

বাস চলতে শুরু করেছে। মথুরার জনবহুল পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। মন-মথুরা থেকে চলেছি মন-বৃন্দাবনে।

কয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ। তারপরেই সহসা মথুরা মহারাজ গলা ছেড়ে গান ধরলেন—

"কৃষ্ণ জিন্‌কা নাম হ্যাঁয়,
গোকুল জিন্‌কা ধাম হ্যাঁয়,
এয়সে শ্রীভগবানকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥
যশোদা জিন্‌কা মাইয়া হ্যাঁয়,
নন্দজী বাপইয়া হ্যাঁয়,
এয়সে শ্রীগোপালকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥
রাধা জিন্‌কী প্যারী হ্যাঁয়,
কৃষ্ণজী-মুরারি হ্যাঁয়,
এয়সে শ্রীঘনশ্যামকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥
লুট লুট দধি মাখন খায়ো,
গোয়ালবাল সঙ্গ ধেনু চরায়ো,
এয়সে লীলাধামকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥
দ্রুপদসুতাকী লাজ বঁচায়ো,
গজ আউর গ্রাহকে ফন্দ ছুঁড়ায়ো,
এয়সে কৃপাধামকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥
কুরু পাণ্ডবকো যুদ্ধ মচায়ো,
অর্জুনকো উপদেশ শুনায়ো,
এয়সে দীননাথকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥"*

বড় ভাল লাগছে। এই পরিবেশের মাঝে আমিও যেন গিয়েছি হারিয়ে। বনযাত্রাব বাকি দিনগুলি যদি এমনি করে কেটে যায়, তাহলে যে মধু-বৃন্দাবন চিরমধুময় হয়ে থাকবে আমার মনের মণি-কোঠায়।

ভেবে চলি নিজের কথা। পরিবেশ মানুষকে কত সহজে পরিবর্তিত করে তোলে। ভক্তিহীন অ-বৈষ্ণব আমি। বছর তিনেক

আগে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলাম। তখন শুনেছিলাম এই বন-পরিক্রমার কথা। নেহাৎই ভ্রমণের নেশায় আমি আজ সঙ্গী হয়েছি এঁদের। কিন্তু কখনও ভাবি নি এঁদের সঙ্গে কীর্তন করব, এবং তা প্রথম যাত্রাতেই।

বাস চলেছে এগিয়ে। আমরা আজ বৃন্দাবন-পথযাত্রী। তবু চলার পথে থামার অবকাশ নেই। কিন্তু পথের কথা ভাবার অসুবিধে কোথায়? এই সেই পথ—গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পথ, বৃষভানু-নন্দিনী নীলবসনা শ্রীরাধিকার পথ। এই পথ দিয়ে একদিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন লুপ্ত বৃন্দাবনে, এসেছিলেন শ্রীরূপ-সনাতন লুপ্ত বৃন্দাবনকে প্রকট করে তুলতে। অনন্তকালের অসংখ্য ভক্তের পদরেণু-রঞ্জিত এই পথ। আজ সেই পথ দিয়ে চলেছি আমি—চলেছি মন-বৃন্দাবনে। ধন্য আমি, ধন্য আমার জীবন!

কত সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর বেদনার সাক্ষী এই পথ। ইতিহাসের কত শত অধ্যায় রচিত হয়েছে এই পথের বাঁকে বাঁকে। সে ইতিহাস শুরু হয়েছে মধুদৈত্য থেকে, আর শেষ……! না, আজও তা শেষ হয় নি। ইতিহাসের শেষ নেই।

ভেবে চলি সেই ইতিহাসের কথা—মথুরার ইতিহাস। মধু, লবণ ও শত্রুঘ্নকে যদি ঐতিহাসিক সত্য বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে মেনে নিতে হয় যে, শূরসেনদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার পূর্বে মথুরামণ্ডলে শৈব প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। কারণ, মধু ও লবণ শৈব ছিলেন। শত্রুঘ্নের রাজত্বকালে এখানে চাতুর্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাতে শৈবপ্রভাব বিলুপ্ত হয় নি। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবার পরেও ব্রজধাম শৈব প্রভাবমুক্ত হয় নি। জৈন এবং বৌদ্ধ যুগেও মথুরামণ্ডলে অনেক শৈব সন্ন্যাসী বাস করতেন। ফলে মথুরামণ্ডলে বহু শিবমন্দির স্থাপিত হয়েছিল। সেগুলির অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। যে ক'টি এখনও রয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটি মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বলভদ্র কুণ্ডের কাছে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির, কাম্যবনে কামেশ্বর শিবমন্দির,

গোবর্ধনে চক্রেশ্বর শিব, বৃন্দাবনে গোপেশ্বর মহাদেব ও কঙ্কালী-টিলার কাছে শিবতলা। ব্রজমণ্ডলের অধিকাংশ ঘাটেই শিবমূর্তি আছে। এর মধ্যে শৃঙ্গারঘাটে পিপ্পলেশ্বর মহাদেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ শূরসেন বংশেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষরাই মথুরায় রাজত্ব করতেন। কংসকে হত্যা করার পরে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে দ্বারকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু মথুরা কখনই শূরসেনদের হাতছাড়া হয় নি। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মেগাস্থিনিস ভারতে আসেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তখন 'মেথোরা' (মথুরা) শূরসেনার একটি প্রধান নগরী। তবে মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের আমলে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে মথুবা কিছু কালের জন্য পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। পরবর্তীকালে মথুরামণ্ডল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মথুরায় শূরসেনদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

শূরসেনগণ সকলেই ভাগবত বা সাত্বৎ মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁরাই ব্রহ্মাবর্তে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত-ধর্মের প্রচার করেন। তাঁদের প্রভাবে মথুবামণ্ডল আর্যদের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এই প্রভাব প্রায় এক হাজার বছর স্থায়ী ছিল।

তাবপর জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে মূল-মথুরায় ভাগবত প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। উনবিংশ জৈন-তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও একবিংশ তীর্থঙ্কর নেমীনাথ মথুরায় জন্মগ্রহণ ও মোক্ষলাভ করেন। দিগম্বর জৈনদের মতে ১০৭ থেকে ১৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পুষ্পদন্ত আচার্য মথুরাসংঘে বসে সমস্ত জৈনাঙ্গ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে ৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মথুরাসংঘেই জৈনসিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। মথুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু সুপ্রাচীন জৈন-পুরাকীর্তি পাওয়া গিয়েছে। তার অধিকাংশই অন্যান্য বৌদ্ধ ও হিন্দু-পুরাকীর্তির সঙ্গে মথুরার প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। শুনেছি এই যাদুঘরটি অবশ্য দর্শনীয়, জানি না আমরা

এ যাত্রায় সে সুযোগ পাব কিনা। যাক্ গে, যেকথা ভাবছিলাম—মথুরা আজও জৈনদের মোক্ষতীর্থ বলে সমাদৃত।

জৈনধর্মের পরে মথুরামণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরায় প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। অশোক এখানে চারটি বড় এবং অনেকগুলি ছোট স্তূপ নির্মাণ করেন। কুষাণ-সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরা বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তীকালের বিদেশী পর্যটকদের, বিশেষ করে ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৫ খ্রীঃ) ও যুয়ান চোয়ঙের (৬২৯-৬৪৫ খ্রীঃ) বর্ণনা থেকে জানা যায়, মথুরামণ্ডল একই সময়ে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ফলে বহুকাল ধরে মথুরা ছিল ভারতীয় সভ্যতার মধ্যমণি।

মথুরামণ্ডলে কখনই আর্য প্রভাব বিলুপ্ত হয় নি। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বৈষ্ণব প্রভাব খর্বিত হয়েছিল। আর তারই ফলে শ্রীকৃষ্ণের অধিকাংশ লীলাস্থল লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর পরে গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় মথুরামণ্ডল আবার বৈষ্ণব মহিমায় আলোকিত হয়ে ওঠে। 'বিষ্ণু-পুরাণে' সেকালের মথুরামণ্ডলের বর্ণনা আছে।

পরবর্তীকালে কনৌজের রাজাদের এবং রাজপুতনার রাণাদের যত্নে মথুরামণ্ডলে বৈষ্ণব প্রভাব পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সমস্ত লীলাস্থল উদ্ধার করে ব্রজমণ্ডলের আয়তন স্থির করা হয়—

'বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।
পদেপদেঽশ্বমেধানাং পুণ্যং নাত্র বিচারণম্॥' *

ভগবান বলেছেন—আমার এই মথুরামণ্ডল বিংশ যোজন বিস্তৃত ; এখানে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়।

'বরাহ-পুরাণে'র মতে মথুরামণ্ডল বারোটি বন, বারোটি তীর্থ ও পাঁচটি স্থল নিয়ে গঠিত। বনগুলি হল—বৃন্দাবন, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যবন, বহুলাবন, ভদ্রবন, খাদিরবন, মহাবন, লৌহবন, বিল্ববন ও ভাণ্ডীরবন। তীর্থ বা উপবন এবং স্থলগুলি এই দ্বাদশ বনের ভেতরে অথবা কাছাকাছি অবস্থিত। কাজেই বন-পরিক্রমা করার সময় যাত্রীদের অধিকাংশ তীর্থ এবং স্থল দর্শন হয়ে যায়। চুরাশী ক্রোশ পায়ে হেঁটে এই বন-পরিক্রমা পূর্ণ করতে হয়।

মূল-বনযাত্রা শুরু হয় নন্দোৎসবেব পরদিন। ব্রজবাসীরা এই যাত্রা পরিচালনা করেন। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তরা নিজেদের সুবিধা মতো সময়ে বনযাত্রা করে থাকেন। যেমন আমরা এসেছি এই দিনে—এই কার্তিক মাসে। এসেছি সেই অভিন্ন উদ্দেশ্যে—ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল দর্শন করতে। এসেছি মথুরায়, চলেছি বৃন্দাবনে—মধু-বৃন্দাবনে।

যাক্ গে, যেকথা ভাবছিলাম—নিষ্ঠাবান রাজাদের সহায়তায় ভক্তগণ মনের মতো করে ব্রজধামকে সাজিয়েছিলেন। যে সব ধন-রত্ন ও মণিমুক্তা দিয়ে তাঁরা ব্রজমণ্ডলকে গড়ে তুলেছিলেন, আজ যদি তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকত, তাহলে বৃন্দাবনের স্থান হত আগ্রার অনেক ওপরে। বিদেশী পর্যটকরা আগ্রা থেকে সোজা দিল্লী চলে যেতে পারতেন না। মথুরায় নেমে অবশ্যই মথুরা-বৃন্দাবন দর্শন করতেন। চক্রবর্তীকেও আর আগ্রা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ফেরার পথে বৃন্দাবন আসার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বার বার অনুরোধ করতে হত না। তারা বৃন্দাবনের জন্যেই বৃন্দাবনে আসত, চক্রবর্তীর জন্য নয়।

কিন্তু বৃন্দাবনের কথা এখন থাক্, এখন মথুরার ইতিহাসের কথা ভাবা যাক্। সে ইতিহাস বড়ই নিষ্ঠুর।

না, কথাটা মোটেই ঠিক হল না। ইতিহাস নিষ্ঠুর হবে কেন? নিষ্ঠুর সেই মর্মান্তিক ধ্বংসযজ্ঞের নায়করা, যাঁরা সেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

তাঁদের মধ্যে প্রথম মনে পড়ছে গজনীর সুলতান মাহমুদের কথা। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মথুরামণ্ডল আক্রমণ করেন। মহাবনের রাজা কুলচন্দ্র জন্মভূমি ও ধর্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সে যুদ্ধে ষাট হাজার বৈষ্ণব-সৈন্য জীবন উৎসর্গ করলেন, কিন্তু লক্ষাধিক সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে গঠিত মাহমুদের অজেয় বাহিনীকে রুখতে পারলেন না। সত্যাশ্রয়ী কুলচন্দ্র প্রিয়তমা মহিষীকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করলেন। মহাবনের মহামূল্যবান ধন-সম্পদ মাহমুদের হস্তগত হল। শতাধিক হাতির পিঠে সেই সব ধন-রত্ন বোঝাই করে মাহমুদ মথুরায় প্রবেশ করলেন।

মাহমুদ মথুরার ঐশ্বর্যের গল্প শুনেছিলেন। কিন্তু বাস্তবের মথুরা তাঁর কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেল। তখন মথুরা-বৃন্দাবনে যমুনার তীরে তীরে শিল্প-চাতুর্যময় মণিমুক্তাখচিত সহস্রাধিক মন্দির ছিল। সেই সব মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে মাহমুদের সহচর জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'যদি কেহ ইহার তুল্য সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিতে চাও, তবে সহস্র সহস্র সুবর্ণ দির্‌হাম ব্যয় করিতে হইবে, কিন্তু বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুনিপুণ স্থপতিদিগকে দুইশত বৎসর অবিশ্রান্ত খাটাইলেও এরূপ সৌধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে কিনা সন্দেহ!'*

মন্দিরের বিগ্রহগুলি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, পাঁচটি মন্দিরের মূর্তি ছিল দশ হাত উঁচু এবং সোনার পাতে মোড়া। কয়েকটি মূর্তির চোখ ছিল মূল্যবান হীরা কিংবা নীলকান্ত মণির। বহু মন্দিরের বিগ্রহ ছিল মণিমণ্ডিত সোনার মূর্তি। তার মধ্যে একটি ছিল প্রায় দেড় হাত উঁচু। অন্যান্য মন্দিরে ছিল রূপার প্রতিমা।

মাহমুদ বিশ দিন ধরে ব্রজমণ্ডল লুণ্ঠন করে সমস্ত ঐশ্বর্য সংগ্রহ করলেন। তখন তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু তিনি চাইলেন না যে, পাষাণ-প্রতিমাসহ মন্দিরগুলি অক্ষত থাকে। তাই তিনি এবং

*ব্রজ-পরিক্রমা—সম্পাদনা শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

তাঁর সৈন্যরা শত শত বছরের লক্ষ লক্ষ শিল্পীর শ্রমে ও সাধনায় গড়ে ওঠা মন্দিরগুলি ভেঙে আগুন ধরিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে চলল ব্রজবাসীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা। ব্রজধাম হল মন্দির-শূন্য। হাজার হাজার ব্রজবাসীর রক্তে নীল যমুনা লাল হয়ে গেল।

তাবপরে শতাধিক বছর ব্রজমণ্ডলের কোন সংস্কার হয় নি। এই সময় তীর্থযাত্রীরাও ব্রজধামে আসতে চাইতেন না। তাই বৈষ্ণবগণ আবার ব্রজমণ্ডলের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তবে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামান্য কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছিল।

কিন্তু ধর্মান্ধ সুলতান সেকেন্দার লোদীর (১৪৮৮–১৫১৭ খ্রীঃ) সেটুকুও সহ্য হল না। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে মথুরামণ্ডল ধ্বংস করবার আদেশ দিলেন। তাবা মথুবা-বৃন্দাবনের একটি মন্দিরও অক্ষত রাখল না। বাখার আদেশও ছিল না। আদেশ ছিল—একটি দেবালয়কেও অক্ষত রাখা চলবে না। ভগ্ন দেবালয়গুলিতে মুসলমান সরাইখানা ও মাদ্রাসা স্থাপন করতে হবে। দেবমূর্তি ও শালগ্রাম শিলাগুলিকে গোরুব মাংস ওজনের বাটখারা করার জন্য কসাইদের দিয়ে দিতে হবে এবং হিন্দুদেব পূজা-পার্বণ নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, সুলতানের সুযোগ্য সেনাবাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সে আদেশ পালন করল। তারই ফলে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল-সমূহ জনহীন জঙ্গলে পরিণত হতে থাকল।

বৈষ্ণবদের সৌভাগ্য, এই নিগ্রহ তাঁদের খুব বেশিদিন ভোগ করতে হয় নি। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। ইতিপূর্বে শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডল পবিক্রমা করে গেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল মহাপ্রভু লুপ্ত ব্রজমণ্ডলের পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছেন। তাঁরই আদেশে তখন শ্রীরূপ-সনাতন লুপ্ত ব্রজমণ্ডলকে প্রকট করে তুলবার চেষ্টা করছেন। সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মহারাজা মানসিংহের সক্রিয় সহায়তায় তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হল—লুপ্ত বৃন্দাবন প্রকট হল।

সেই ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করতেই আজ আমি বৃন্দাবনে এসেছি। আজকের এই বৃন্দাবন রূপ-সনাতন এবং তাঁদের সতীর্থ ও শিষ্যদের অবদান। কিন্তু সেকথা এখন থাক্। আমাদের বাস এসে আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়েছে। কীর্তন থেমে গেছে। এবার বাস থেকে নামতে হবে। যাত্রীরা অনেকে ইতিমধ্যে বাস থেকে নেমে পড়েছেন। তাঁরা পথের ধূলি মাথায় মাখছেন। আমিও তাড়াতাড়ি নেমে আসি পথে—বৃন্দাবনের পথে। এক মুঠো ধূলি হাতে তুলে নিই—ব্রজধামের ধূলি, ব্রজরজঃ।

পথের পাশেই আশ্রম। চারিদিকে দেওয়াল-ঘেরা। অনেকখানি জায়গা নিয়ে মন্দির, নাট-মন্দির, যাত্রীনিবাস, অতিথিশালা ও বাগান। সব মিলিয়ে বেশ বৃহৎ ব্যাপার।

সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই বাগান। তারপরে বাঁধানো চত্বর। চত্বরের একদিকে অতিথিশালা, অন্যদিকে নাট-মন্দির। অতিথিশালাটি নতুন। লাগোয়া বাথরুমসহ চারখানি বেশ বড় বড় ঘর।

নাট-মন্দিরটি প্রকাণ্ড। মেঝেতে 'টাইল্‌স' বসানো। অনেকটা উঁচু। ওপরে ইলেকট্রিকের কয়েকটি সুদৃশ্য ঝাড় ঝুলছে। রয়েছে মাইকের ব্যবস্থা। দুটি স্পীকার লাগানো হয়েছে মন্দির-চূড়ায়। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, প্রতিবেশীরা যাতে পাঠ-কীর্তন শুনতে পান।

নাট-মন্দিরের পরে একফালি বাঁধানো জায়গা, তার পরেই সু-উচ্চ মন্দির। বড় নয়, তবে ভারী সুন্দর। পাথর ও ইটের তৈরি—শ্বেত-পাথরের মেঝে। চারিদিকে গোলস্তম্ভযুক্ত বারান্দা। ভেতরে রাধাকৃষ্ণের মূল বিগ্রহ—সিংহাসনে উপবিষ্ট। বেশ বড় এবং মনোহর মূর্তি। পাশে কৃষ্ণ-বলরাম ও সুভদ্রা—অপেক্ষাকৃত ছোট মূর্তি। সবার সঙ্গে আমিও মাটিতে লুটিয়ে পড়ি—সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। 'জন্মৈশ্বর্য-শ্রুত-শ্রী' অর্থাৎ বংশ, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য ও রূপের অহঙ্কার ত্যাগ করে শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তদের চরণে মাথা নত করি। আমি যে বৃন্দাবনে এসেছি—মধু-বৃন্দাবনে।

মন্দিরের পেছনে যাত্রীনিবাস। বড় একটি দোতলা বাড়ি—

দুটি অংশে বিভক্ত। ডানদিকের অংশ পুরুষদের ও বাঁদিকের অংশ মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। পুরুষদের অংশে আটখানি ঘর। নিচের চারখানি ঘরের দু'খানিতে অফিস এবং ভাঁড়ার। বাকি দু'খানায় থাকবেন গুরুমহারাজ ও অন্যান্য মহারাজরা। ওপরের চারখানি ঘরের দু'খানিতে থাকবেন প্রবীণ ব্রহ্মচারীরা। বাকি দু'খানি নির্দিষ্ট হয়েছে স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত শিষ্যদের জন্য। অন্যান্য শিষ্যরা থাকবেন নাট-মন্দিরে এবং রাস্তার ওপারে একটি ধর্মশালায়। সকলেই বৃন্দাবন মহারাজের নির্দেশ মতো নিজ নিজ আস্তানায় চলে যাচ্ছেন।

একটু বাদে দেখি বোসবাবু ও আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখানে। তাই তো হবে, ওঁরা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী অথবা শিষ্য। ওঁদের জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমরা দু'জন যে কিছুই নই—'না ঘরকা, না ঘাটকা'। বড়জোর অতিথি বলা যেতে পারে—'পেয়িং গেস্ট'। কিন্তু সেকথা বৃন্দাবন মহারাজকে বলি কেমন করে? অথচ না বললে যে গতি হবে না তাও বেশ বুঝতে পারছি। চক্রবর্তীকে পেলে একটা সুরাহা হত। কিন্তু কোন ফাঁকে সে-ও যেন কেটে পড়েছে। চাচা, আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছে আর কি!

এমন সময়·····। হ্যাঁ, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?' এমন সময় সহসা নজর পড়ে। নরেনবাবু এদিকে আসছেন। বাসে উঠে সেই ধমক খাবার পরে আর তাঁর কাছে এগোই নি। কিন্তু এখন যে তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। নরেনবাবু ছাড়া আর কেউ তো আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন না। অতএব তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসি—অসহায়ের হাসি। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়। নরেনবাবু আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "আপনারা এহানে দাঁড়াইয়া আছেন ক্যান্?"

"আজ্ঞে, কোথায় যাব?"

"হায় কৃষ্ণ! এত মানুষ যাওয়ার জাগা পাইল, আর আপনারা পাইলেন না! না, মশায়। আপনাগো দিয়া কিছু হইব না ছাখ্‌তে আছি।"

একবার থামেন তিনি। আমরা চুপ করে থাকি। কি যেন একটু ভেবে নিয়ে নরেনবাবু আঁবার বলেন, "বিছনা ছুইডা কান্দে লইয়া লয়েন আমার লগে।"

"বাক্স ?" সবিনয়ে প্রশ্ন করি।

"পরে লইয়া যাইবেন। অহন চলেন, আগে জাগাডা ঠিক কইরা দেই।"

আর বাক্যব্যয় না করে আমি এবং বোসবাবু বিছানা ছুটো কাঁধে নিয়ে নরেনবাবুকে অনুসরণ করি। যাত্রীনিবাসের দোতলায় আসি। আর এসেই দেখি চক্রবর্তী সেখানে বিছানা পেতে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আমাকে দেখেই সে সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে, "আরে এসো এসো, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

আমরা কোন উত্তর দেবার আগেই নরেনবাবু বলেন, "এই ঘরে বিছনা পাইত্যা ফ্যালেন। দেরি করবেন না, জাগা দখল হইয়া যাইব।"

অতএব চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি ফাঁকা জায়গা দেখে কম্বল বিছিয়ে ফেলি।

'ব্যস্, হইয়া গেল! ভাল ঘর, 'এ্যাটাচ্ড বাথ্'। ভয় ভাববেন না, ক্যাবল আপনাগো, এই ঘরের মানুষ কয়জনের লইগ্যাই বাথরুম! বারান্দায় যারা থাকব, তারাও এই বাথরুম 'ইয়ুস' করব।"

"তা করুক্ গে। সকলের সঙ্গে সবকিছু সমানভাবে ভাগ করে নেব বলেই তো আপনাদের সঙ্গে এ যাত্রায় এসেছি।"

"এই এট্টা কথার মতন কথা কইছেন।" নরেনবাবু খুশি হন। বলেন, "আচ্ছা, আমি তাইলে অহন চলি। আপনারা নিচের 'টিউব-ওয়েল'য়ে গিয়া হাত-মুখ ধুইয়া আসেন। আইজ দোতলায় জল পাইবেন না। সন্ধ্যার মধ্যেই প্রসাদ পাইবেন।"

জলহীন বাথরুম বস্তুটি বিচিত্র ব্যাপার। তবু সে প্রসঙ্গ না তুলে বলি, "নরেনবাবু, আমাদের বাক্স ছুটো কি নিজেদেরই আনতে হবে ?"

"দেহি, লোকজন জোগাড় করতে পারুলে পাডাইয়া দিমু হনে। তয় একটা কথা মশায়!"

"কি?"

"এহানে বাবু-টাবু ডাকবেন না। এহানে আমরা কেউ বাবু না, সব্বাই প্রভু। কথাডা মনে থাকব তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" লজ্জিত স্বরে উত্তর দিই।

"না থাকলেও দোষ নেই প্রভু!" চক্রবর্তী তাঁকে বলে, "আমি ওকে মনে কবিয়ে দেব।"

"তাই দিয়েন।" নবেনপ্রভু ঘব থেকে বেবিয়ে যান। আমি বিছানাব ওপব বসে পড়ি।

কয়েক মিনিটেব মধ্যেই ঘর বোঝাই হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এ ঘবে ন'জনেব ঠাঁই হয়েছে। দু'সাবি বিছানা পড়েছে। আমার সাবিতে আমরা পাঁচজন। বোসবাবুব সাবিতে চাবজন। কারণ, ওদিকেই সেই জলহীন বাথরুমের দরজা। খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখতে হয়েছে।

আমাব পাশে সেনবাবু। কলকাতাব লোক, বয়স বছর পঞ্চাশেক; ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে রেখে সস্ত্রীক যাত্রায় এসেছেন। তিনি আশ্রমের শিষ্য নন। তবে জনৈক ব্রহ্মচাবী তাঁর আত্মীয়। সুতরাং তিনি এ ঘবে জায়গা পেয়েছেন। স্ত্রী রয়েছেন মেয়েদের মহলে।

সেনবাবুব পবে মথুরা মহাবাজেব শিষ্য মধু ব্রহ্মচারী। বয়স বছর পঁচিশেক। কালো বোগা ও লম্বা চেহাবা। বেশ চালাক-চতুর। মনে হচ্ছে বাড়িব অবস্থা স্বচ্ছল। ছেলেটির সত্যিকথা বলার বদভ্যাস আছে।

মধুব পরে চেকারপ্রভু। ভদ্রলোক প্রথম জীবনে সৈনিক ছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। যুদ্ধ থেমে যাবার পরে রেলে যোগদান করেন। তিনি টিকেট চেকার ছিলেন। আর তাই বোধহয় খুব ইংরেজী ও হিন্দী বলেন। এখন আশ্রমবাসী। বয়স

বছর ষাটেক—ভগ্ন-স্বাস্থ্য। তবে যৌবনে বোধহয় স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ ছিলেন।

তারপরে বণিকপ্রভু। আসানসোল নিবাসী গুরুমহারাজের জনৈক রোগক্লান্ত বৃদ্ধ শিষ্য। শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছেন। বিছানা-পত্র দেখে মনে হচ্ছে অবস্থা বেশ ভালই। শুনলাম ভদ্রলোক নিঃসন্তান। ভাইপোদের মানুষ করেছেন। তিনিও সস্ত্রীক যাত্রায় এসেছেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নাকি আরও খারাপ।

এই গেল আমাদের সারির কথা। বোসবাবুদের সারিতে ওঁরা চারজন। আমার উল্টোদিকে কেষ্টপ্রভু—সত্যিকারের প্রভু। আশ্রমের প্রবীণতম ব্রহ্মচারী। গুরুমহারাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র। অথচ এখনও মহারাজ, তথা সন্ন্যাসী হতে পারেন নি। শুনেছি এঁদেরও পদোন্নতি হয় 'সীনিয়রিটি-কাম্-এফিসিয়েন্সি বেসিস'-য়ে, তাহলে কি কেষ্টপ্রভু 'ইন্-এফিসিয়েন্ট্'? কিন্তু তাঁর কথাবার্তা শুনে তো মোটেই তা মনে হচ্ছে না। তার ওপরে শুনেছি তিনি খুব ভাল কীর্তন গাইতে পারেন। আশ্রমিক 'ডিপার্ট্‌মেণ্ট্যাল্ টেস্ট'-য়ে কীর্তন একটি প্রধান বিষয়। তাহলে এঁদেরও 'সি. সি আর' আছে, এবং যে কোন কারণেই হোক কেষ্টপ্রভুর সেটি খুব ভাল নয়।

তিনি নিজে অবশ্য বলেন, "সন্ন্যাসী হবার অনেক অসুবিধে। সর্বদা লাঠি নিয়ে চলতে হবে আর জুতো পরতে পারব না।" কিন্তু আশ্রমবাসী হয়েও কেউ কেবল জুতোর জন্য সন্ন্যাসী হলেন না, কথাটা ভাবতে যে একটু দ্বিধা হচ্ছে।

কেষ্টপ্রভুর পরে বোসবাবু ও চক্রবর্তী। তারপরে হরিদাসপ্রভু। তিনিও সস্ত্রীক যাত্রায় এসেছেন। বয়সে প্রবীণ, কিন্তু স্বাস্থ্যবান। কর্মজীবনে শিল্পী ছিলেন—কমার্সিয়াল আর্টিস্ট। এক ছেলে—খুব ভাল চাকরি করেন। কলকাতায় বাড়ি ও গাড়ি আছে। হরিদাসপ্রভুকে দেখে শান্তশিষ্ট ভাল মানুষ বলেই মনে হচ্ছে।

বিকেল পাঁচটার সময় হঠাৎ একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। সচকিত

হয়ে উঠলাম। কেষ্টপ্রভু বললেন, "থালা, বাটি ও গ্লাশ নিয়ে চলো হে, প্রসাদ পাবার সময় হল।"

ছ'দিন হল পেটে ভাত নেই। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসি। দেখি, মন্দির ও যাত্রীনিবাসের মাঝখানে বাঁধানো জায়গায় সবাই সারি বেঁধে বসে গেছেন। কেউ বা আসনে বসেছেন, কেউ বা খবরের কাগজে। আমরা কি পেতে বসব? আমাদের যে কিছুই নেই! চেকারপ্রভু বলেন, "মাটিতে বসে পড়ুন, এ হল গিয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবন। এখানে মাটি মানেই ব্রজরজঃ।"

তাই করি। কিন্তু তাতেও পরিত্রাণ পাওয়া গেল না। আমার কলাই-করা থালা-বাটি এবং প্লাস্টিকের গ্লাশ দেখে জনৈক ব্রহ্মচারী ধমকে উঠলেন, "এগুলো কি এনেছেন মশাই? এসব বাসন চলবে না এখানে।"

তাকিয়ে দেখি কথাটা মিথ্যে নয়, প্রত্যেকের সামনেই অ্যালুমিনিয়াম্ কিংবা কাঁসার বাসনপত্র। কিন্তু আমি যে আমার এই থালা-বাটি নিয়ে হিমালয়ের বহু পুণ্যতীর্থ পরিক্রমা করেছি। সেখানে তো কেউ আপত্তি করেন নি। তবু সেকথা এখন বলা যাবে না। অতএব অসহায়ের দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে থাকি। তাঁর বোধহয় মমতা হয় আমার জন্য। বলেন, "আপনি থালা-বাটি পেছনে সরিয়ে রাখুন। আমি পাতা দিচ্ছি—শালপাতা।" একটু থামেন তিনি। তারপরে চিন্তিত স্বরে বলেন, "গ্লাশের কি করবেন?"

"খাবার সময় জল খাব না, আপনি আমাকে একখানি পাতা দিন।" আমি সকৃতজ্ঞ স্বরে বলে উঠি।

"জল তো খাবেন না বুঝলাম, কিন্তু দুধ খাবেন কেমন করে? দুধ পাবেন যে!"

চুপ করে থাকি। ব্রহ্মচারী আবার বলেন, "আচ্ছা, আজ আপনি গ্লাশটা ব্যবহার করুন। কাল বাজার থেকে একটা থালা বাটি আর একটা গ্লাশও কিনে নেবেন, বুঝলেন?"

আমি ভক্তিভরে মাথা নাড়ি।

· খিদের পেটে খাওয়াটা ভালই হচ্ছে—ভাত ডাল আলু-কপির ঝোল। গরম গরম বেশ লাগছে। বলতে গেলে একটু বেশিই খেয়ে নিচ্ছি। আর তারই ফলে চেয়ে ফেললাম, "আমাকে চারটি ভাত দিন না!"

"ভাত!" সঙ্গে সঙ্গে ধমক লাগালেন সেবক। "ভাত কোথায় মশাই! এখানে সবই প্রসাদ, অন্ন। অন্ন বলবেন, বুঝলেন?" শাসন শেষ করে তিনি আমাকে অন্নদান করলেন।

আমি মাথা নেড়ে বলি, "আচ্ছা, আর ভাত বলব না। কাউকে ঝোল দিতে বলুন না!"

"ঝোল! আবার ঝোল বলছেন? না মশাই! আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি! ঝোল কি মশাই, ঝোল নয় রসা, রসা বলবেন।"

"আচ্ছা!" আবার মাথা নাড়ি। ভয়ে আর ডাল চাইতে পারি না। কি জানি এঁরা আবার ডালকে কি বলেন?

যথারীতি সন্ধ্যারতি, মন্দির-প্রদক্ষিণ, কীর্তন ও পাঠ হল। সব কিছুই আমার কাছে নতুন এবং মনে রাখার মতো। মনেও আছে। কিন্তু সেকথা এখন থাক্। এখন প্রোগ্রামের কথা বলে নিই। হ্যাঁ, প্রোগ্রাম, মানে ইস্তাহার তথা আগামীকালের কর্মসূচী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের পরে গুরুমহারাজ মাইকে পরদিনের প্রোগ্রাম ঘোষণা করলেন। এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার দেখছি—ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঠাসা প্রোগ্রাম। দুপুর বেলা স্নান-খাওয়ার জন্য কেবল দু'ঘণ্টা ছুটি। এর থেকে যে 'মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স'-এর প্রোগ্রামও ঢের সহজ!

তাই তো হবে। বৈষ্ণব মাউন্টেনিয়ার হয়েছেন, কিন্তু মাউন্টেনিয়ারের পক্ষে বৈষ্ণব হওয়া বোধ করি অসম্ভব। অবশ্য তাতে আমার কিছু এসে যাচ্ছে না। প্রথমতঃ, আমি মাউন্টেনিয়ার নই। দ্বিতীয়তঃ, আমি এসেছি ব্রজমণ্ডলে ঘুরে বেড়াতে এবং সেই সঙ্গে সহযাত্রী ভক্ত-বৈষ্ণবদের দেখতে। বৈষ্ণব হবার কোন বাসনা নিয়ে বৃন্দাবনে আসি নি আমি।

আবার ঘরে আসা গেল। বিছানা করাই আছে। এবারে মশারী টাঙিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। কিন্তু মশারী? আমার মশারীটা কোথায় গেল?

না, নেই। কোথাও নেই। অথচ মন্দিরে যাবার সময় বিছানার ওপরেই রেখে গিয়েছিলাম। নরেনপ্রভু টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র সামলে রাখতে বলেছিলেন। তাই বলে মশারী? মশারী চুরি যাবে! কিন্তু এর চেয়ে যে কিছু টাকা-পয়সা চুরি যাওয়া ঢের ভাল ছিল! টাকা হারালে শুয়ে থাকা যায়, কিন্তু মশারী ছাড়া যে বৃন্দাবনে রাত্রিবাস অসম্ভব! খুবই মশা এখানে।

"কোথায় রেখেছিলেন বলুন তো?" সেনবাবু প্রশ্ন করেন।

আমি জায়গাটা দেখিয়ে দিই।

"তাহলে আমিই ভুল করেছি।" সেনবাবু বলেন। "বাড়ি থেকে ছুটো মশারী এনেছি ভেবে আপনার মশারীটা আমার স্ত্রীকে দিয়ে এসেছি। সে অবশ্যি তখুনি বলল, এ মশারী আমাদের নয়। তবু আমি সেটা তার কাছেই রেখে এসেছি। আজ আর আনা যাবে না, মেয়ে-মহলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।" একটু থামেন সেনবাবু। আমি বিপদ বুঝেও চুপ করে থাকি। সেনবাবু আবার বলেন, "তাই তো, মুশকিল হল! আমার মশারীটাও বড্ড ছোট, ছু'জনে শোওয়া যাবে না।"

"আমার মশারীটা অবশ্য বড়ই। কিন্তু ভাই, আমার আবার একটু বেশি জায়গা না হলে রাতে ঘুম হয় না।" চক্রবর্তী বলে ওঠে।

তাড়াতাড়ি বলতে হয় আমাকে, "না না, ঠিক আছে। তুমি শুয়ে পড়ো।"

"আপনি বিছানা নিয়ে আমার এখানে চলে আসুন ঘোষবাবু!" বোসবাবু আমাকে আমন্ত্রণ জানান। বলেন, "আমার মশারীটাও বড় নয়, তবে কষ্ট করে একটা রাত ছু'জনে কাটিয়ে দিতে পারব।"

আর দেরি না করে আমি বোসবাবুর নির্দেশ পালন করি। মনে মনে ধন্যবাদ জানাই বোসবাবুকে। ভাগ্যিস তিনি এ ঘরে আশ্রয়

পেয়েছেন। নইলে আজ যে আমার কি হাল হত, তা কেবল কৃষ্ণই জানেন। আর জানেন বলেই বোধহয় তিনি বোসবাবুকে এ ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন। কৃপাসিন্ধু বৃন্দাবনচন্দ্রকে মনে মনে প্রণাম করে বোসবাবুর পাশে শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি বৃন্দাবনের কথা—

'বৃন্দার সেবিত বন, নাম তার বৃন্দাবন,
ত্রিলোক বাঞ্ছিত মুখ্যধাম।'

আমি আজ সেই শ্রীধাম বৃন্দাবনে এসেছি, এসেছি মধু-বৃন্দাবনে। ধন্য আমি—ধন্য আমার জীবন।

॥ চার ॥

ঘুম ভেঙে গেল। নাট-মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। ঘরে বাতি জ্বলছে। অনেকেই দেখছি আমার আগে ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। কেষ্টপ্রভুর মশারী খোলা, বিছানা গোটানো। অন্যান্যরাও কেউ মশারী খুলছেন, কেউ বিছানা গোটাচ্ছেন, আর কেউ বা বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বলতে গেলে সেখানে রীতিমত লাইন পড়ে গেছে। পড়বেই তো, ঘরের ও বাইরের প্রায় পনেরোজন পুণ্যার্থীর জন্য নির্দিষ্ট এই স্নানাগার।

ঘড়ির দিকে তাকাই, চারটে বেজে গেছে। ঠিক পাঁচটায় কীর্তন, সাড়ে পাঁচটায় মঙ্গলারতি, ছ'টায় পাঠ আর সাড়ে সাতটায় পরিক্রমা আরম্ভ। মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় হাতে আছে। এর মধ্যে আমরা এতগুলো লোক বাথরুমের ব্যাপারটা সারব কেমন করে? তবে কি প্রাতঃকৃত্য না সেরেই মন্দিরে যেতে হবে?

তাছাড়া উপায় কি? তাহলে আব এখুনি ওঠার কি দরকার? বাইরে এখনও অন্ধকার রয়েছে। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা যাক্।

কার্তিকের বৃন্দাবন। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। বেশ শীত শীত করছে।

কিন্তু বণিকপ্রভুও যে শুয়ে রয়েছেন। কি ব্যাপার? তিনিও আমার মতো বাথরুম না সেরেই মন্দিরে যাবেন নাকি? সেটা কি তাঁর পক্ষে উচিত হবে? তিনি গুরুমহারাজের শিষ্য। তাঁর যে শুদ্ধ মতো মন্দিরে যাওয়া উচিত!

কেষ্টপ্রভু বেরিয়ে এলেন বাথরুম থেকে। তিনি স্নান সেরে নিয়েছেন। ব্রহ্মচারী মানুষ, দৈনিক তিন-চারবার স্নান করতে হয়। স্নান না করে কোন কাজ করার নিয়ম নেই তাঁদের।

কিন্তু এদিকে যে অবস্থা খারাপ। কেষ্টপ্রভু দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই চক্রবর্তী 'ডাইভ্' মেরে বাথরুমের ভেতরে ঢুকে যায়। সঙ্গে

সঙ্গে চেকারপ্রভু চেঁচিয়ে ওঠেন, "আরে, আপনি ঢুকলেন কেন? আমি যে আপনার আগে থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি!"

কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর কেমন করেই বা শোনে? চক্রবর্তীর যে ঘুম ভাঙলেই বাথরুমে যেতে হয়। কাল ট্রেনে ছাত্র-ছাত্রীরা 'কেস'টা 'কনসিডার' করেছিল বলে সবাইকেই বিবেচনা করতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। তাই আজ তাকে এই সামান্য কৌশলটুকু অবলম্বন করতে হল। সে ভেতরে ঢুকেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চেকারপ্রভু ক্ষেপে গেলেন "মোস্ট আন্‌ম্যানারলি ক্রীচার্, আন্‌ডিসিপ্লিন্‌ড, আন্‌কালচার্‌ড, আন্‌সিভিলাইজড, ইম্‌পার্টিনেন্ট···"

কিন্তু যার উদ্দেশে এই সব বাক্যবাণ, সে বোধহয় কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। বাথরুমের ভেতর থেকে শুধু ভেসে আসছে জলের শব্দ।

বণিকভু এখনও শুয়ে আছেন। ভদ্রলোক বলেছিলেন, তিনি অসুস্থ। আবার শরীর-টরীর খারাপ হল না তো? আমি তাঁকে ডাক দিই। তিনি সাড়া দেন। বলি, "শুয়ে রয়েছেন যে, মন্দিরে যাবেন না?"

"যাব!" উত্তর দেন বণিকপ্রভু। "আমাকে আবার বিছানা ছাড়লেই বাথরুমে যেতে হয়, আর, একটু বেশি সময় লাগে। আপনারা মন্দিরে যান, আমি পরে আসছি। কাল গুরুমহারাজকে বলেছি একথা।"

কেষ্টপ্রভু গোপীচন্দন ও আয়না নিয়ে তিলকসেবা করতে বসে গেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমিই বা এখনও শুয়ে আছ কেন? তৈরি হয়ে নাও, সময় হয়ে এলো যে!"

"আমার আবার তৈরি হবার কি আছে?" হেসে বলি, "আমাকে তো আপনার মতো স্নানাহ্নিক সেরে তিলকসেবা করতে হবে না!"

"অন্ততঃ মুখ-হাত ধুয়ে নেবে তো?"

"এখানে যা অবস্থা, সুযোগ পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। একেবারে নিচে নেমে টিউব-ওয়েল থেকে মুখ ধুয়ে নিয়ে মন্দিরে চলে যাব।"

"টিউব-ওয়েলের জল কিন্তু ভীষণ নোনা।" সেনবাবু মনে করিয়ে দেন।

"তা হোক্‌গে।"

"ভেতরে কে আছেন?" ঝড়ের বেগে পাশের ঘরের গোবর্ধন মহারাজ এঘরে আসেন। "দরজা খুলুন, শিগগীর খুলুন!" তিনি সজোরে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেন।

গিরিরাজ গোবর্ধনকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয় নি এখনও। কিন্তু গোবর্ধন মহারাজের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তিনি পাহাড়ের মতই সুবিশাল। ভয় হচ্ছে দরজাটা আবার ভেঙে না যায়। আর ভদ্রলোক কী-ই বা করবেন? তাঁর যে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ভেতরের বেগটা বোধহয় খুবই প্রবল। কিন্তু তিনি এঘরে এলেন কেন? 'জুনিয়ার্‌' সন্ন্যাসী বলেই কি 'সিনিয়ার্‌'-দের ভিড় এড়াতে এঘরে এসেছেন?

বলা বাহুল্য তাঁর এ আগমন বৃথা হবে না। কারণ তাঁকে দেখে চেকারপ্রভু একপাশে সরে দাঁড়িয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন চক্রবর্তী বেরুবার পরেও তিনি 'চান্স্‌' পাচ্ছেন না। আশ্রমিক অনুশাসনে সন্ন্যাসীর আগে কোন শিষ্যের কোথাও যাবার অধিকার নেই। বাথরুমের ব্যাপারেও নিশ্চয়ই নিয়মটা প্রযোজ্য।

কেষ্টপ্রভু নিচে নেমে গেলেন। চক্রবর্তীর তিলকসেবাও প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর সময় নষ্ট না করে আমরা নেমে আসি নিচে। পা-দুটোয় বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে। কিন্তু কি করব? আশ্রমের ভেতরে জুতো পরার নিয়ম নেই। কেবল তাই নয়, পরিক্রমাও করতে হবে খালি পায়ে। অতএব অভ্যেস হওয়া ভাল।

মন্দিরের সামনে এসে দেখি বেশ ভিড় পড়ে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় সবাই উপস্থিত হয়েছেন। মন্দিরে প্রণাম করে

নাট-মন্দিরে এসে বসেছেন। খাণ্ডাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলে ওঠেন, "দণ্ডবৎ প্রভু, দণ্ডবৎ! আপনি কোথায় উঠেছেন?"

ঘরটা দেখিয়ে দিই। খাণ্ডা বলেন, "আপনারা ভক্ত, কৃষ্ণের কৃপায় ভাল জায়গা পেয়েছেন।" তাঁর স্বরে অভিমান।

"আপনি কোথায় আছেন?"

"ধর্মশালায়। ঘর খারাপ নয়, জলের ব্যবস্থাও ভাল। কিন্তু বড়ই বানরের উৎপাত। কালই আমার স্ত্রীর একখানা শাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে, তাছাড়া এত সকালে সব গুছিয়ে এখানে আসা খুবই কষ্টকর।"

শ্রীখাণ্ডা থামতেই দিদিমার দিকে নজর পড়ে আমার। তিনি বলে ওঠেন, "আরে, তুমি ক'থায় আছ?"

উত্তর শুনে আবার বলেন, "ভালই হইছে বাবা, আমিও আশ্রমেই আছি। কখন ঠ্যাকা-বেঠ্যাকা পইড়া যায়। আহা! তোমার উপুগার, ভুলমু না বাবা!"

লজ্জা পেয়ে বলি, "কি আর এমন উপকার করেছি?"

"আহা! এডা কি কও? তুমি না থাকলে, আমার না জানি কি হইত বাবা! যে পাল্লায় পড়ছেলাম···"

এই রে, সেরেছে! আজ ব্রাহ্মমুহূর্তে আবার সেই ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রাদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলি, "আপনার শরীর ভাল আছে তো?"

"তা আর থাকবে না, খুব ভাল আছে বাবা! থাকতেই হইবে, বোঝলা না, বৃন্দাবনচন্দ্রের আশ্রয়ে আইছি। আইছি গুরুদেবের লগে। এ অদ্দিষ্ট কয়জনের হয়?"

"তা তো বটেই।" আমি মন্তব্য করি। কিন্তু তার পরেই কথাটা দিদিমার মনে পড়ে যায় আবার। তিনি পাশের ভদ্র-মহিলাকে বলেন, "বোঝলা জানকীর মা, এই হেই পোলাডা। ভাইগ্যে সঙ্গে আছিল, তাই আমরা আইতে পারছি। সেবকরা আমাগো কোন খোঁজ-খবর লয় নাই।"

· "ও, এই বুঝি!" জানকীর মা আমার দিকে তাকান। জানকী তাঁর পাশেই রয়েছে, সেও আড়চোখে দেখছে আমাকে। আমাদের সঙ্গে যে দুটি মাত্র অবিবাহিতা মেয়ে এসেছে, জানকী তাদের অন্যতমা। গায়ের রঙটা কালো হলেও, মেয়েটি দেখতে সুশ্রী—স্বাস্থ্য ভাল। বয়স বছর বিশেক। চাল-চলন যথেষ্ট আধুনিক। অবস্থাও ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু সে পড়াশুনা কিংবা ঘরকন্না না করে হঠাৎ বন-পরিক্রমায় এলো কেন?

গুরুমহারাজ এসে পৌঁছলেন। মন্দিরের দরজার সামনে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা সরে গেলেন তাড়াতাড়ি। গুরুমহারাজ লুটিয়ে পড়লেন মন্দির-দ্বারে।

প্রণাম শেষে তিনি উঠে এলেন নাট-মন্দিরে। মন্দির-দ্বারকে বাঁ পাশে রেখে, বিগ্রহকে আড়াল না করে, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন গুরুমহারাজ। তাঁর গুরুভাইরা সারি বেঁধে দাঁড়ালেন তাঁর ডানদিকে। তাঁদের পরে শিষ্য-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা। তারপরে গৃহী-শিষ্য ও অ-শিষ্যরা। আমার স্থান হল নাট-মন্দিরের অপর প্রান্তে, একেবারে দেওয়ালের ধারে।

গুরুমহারাজ জয়ধ্বনি শুরু করলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে গলা মেলালাম। নবদ্বীপ থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত যাবতীয় তীর্থ, বৃন্দাবনচন্দ্র থেকে নবদ্বীপচন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন দেবদেবী এবং গুরু বৈষ্ণবদের নামে নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হল।

জয়ধ্বনি শেষে পুনরায় প্রণামের পালা। প্রথমে গুরুমহারাজ বিগ্রহকে প্রণাম করলেন। তারপরে পদমর্যাদা অনুসারে সবাই প্রণাম করলেন রাধা-কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে। এবার শুরু হল গুরু, শিষ্য ও ভক্তদের প্রণাম করার পালা। প্রথমে প্রণাম করলাম গুরু-মহারাজ, অন্যান্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারীদের। তারপরে নিজেরা নিজেদের—কেউ কারও পা ছুঁয়ে নয়, একসঙ্গে সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রণাম করলাম।

এই প্রণামের পরে ভক্ত-বৈষ্ণবদের দিন শুরু হল। আমাদেরও

তাই শুরু হল—ব্রজ-পরিক্রমার প্রথম দিন। বেজে উঠল খোল-করতাল। কেষ্টপ্রভু গেয়ে উঠলেন—

'উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে
গেলা নগর-ব্রাজে।
তাথই তাথই বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে॥'

চমৎকার গলা কেষ্টপ্রভুর। ভারী সুন্দর গাইছেন, বড় ভাল লাগছে। আমরা একমনে শুনছি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত সেই চিরকালের কীর্তন—

'কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আব,
চৌদ্দ-ভুবন-মাঝে।
জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুব নাম,
অবিদ্যা-তিমির তপন-রূপে,
হৃদ্-গগনে বিরাজে॥'

কীর্তন শেষ হল। বেজে উঠল মন্দিরের ঘণ্টা। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। যুক্তকরে মন্দির-দ্বারে সমবেত হলাম। শুরু হল আরতি—মঙ্গলারতি। পুরোহিত ঘণ্টাধ্বনিসহ রাধাকৃষ্ণের আরতি করছেন। বেজে উঠল খোল-করতাল। জনৈক প্রবীণ ব্রহ্মচারী আবার কীর্তন আরম্ভ করলেন—

'জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল-মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ॥

মদনমোহন-রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর।
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছ-চূড়া মনোহর॥
ললিতমাধব-বামে বৃষভানু-কন্যা।
নীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা॥'

পূজারীর আরতি শেষ হল। তিনি জ্বলন্তপ্রদীপ এনে রাখলেন মন্দিরের সামনে। আমরা সে পুণ্যশিখা স্পর্শ করে হাত মাথায় ছোঁয়ালাম। কয়েক মিনিট বিরতির পরে শুরু হল মন্দির-প্রদক্ষিণ। নিঃশব্দে নয়, সংকীর্তন পরিক্রমা। সেই প্রবীণ ব্রহ্মচারী আগে আগে গেয়ে চলেছেন—

'নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
হরিমনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল॥
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায়।
প্রিয়নর্মসখী যত চামর ঢুলায়॥'

শেষ হল মন্দির-প্রদক্ষিণ। একবার নয়, সাতবার। তারপরে ঠাকুরকে প্রণাম করে আমরা উঠে এলাম নাট-মন্দিরে।

কীর্তন শেষ হলে সবাই বসে পড়লাম। এবারে আরম্ভ হবে পাঠের আসর। মথুরা মহারাজ ভাগবত পাঠ করবেন। কেন যেন তিনি একটু ঘরে গেছেন। মনে হচ্ছে কয়েক মিনিট দেরি হবে। এই অবসরে বাথরুমটা সেরে এলে হয়। সবাই এসে গেছেন এখানে। এখন নিশ্চয়ই খালি পড়ে আছে। নিঃশব্দে কেটে পড়ি নাট-মন্দির থেকে।

ঘরে কেউ নেই। কিন্তু বাথরুম বন্ধ কেন? তাহলে অন্ততঃ একজন আছেন এবং তিনি বাথরুমে ঢুকেছেন। তিনি কে? কখন বেরুবেন?

বের হলেন প্রায় পনেরো মিনিট পরে। অন্য কেউ নন, স্বয়ং বণিকপ্রভু। আমার বোঝা উচিত ছিল। তিনি তো বলেছিলেন, তাঁর বাথরুমে একটু দেরি হয়, তাই তিনি যাবেন সবার শেষে। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, "মঙ্গলারতি হয়ে গেল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দুর্ভাগ্য আমার, কোনদিনই দেখতে পারি না—এই বাথরুমের ব্যাপারটার জন্য।"

বাথরুম সেরে ফিরে আসি নাট-মন্দিরে। পাঠ শুরু হয়ে গেছে। মথুরা মহারাজ বলছেন—

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জন্মেছিলেন দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে। আর্যসভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য তিনি প্রাচীন শাস্ত্রগুলির যুগোপযোগী নতুন রূপ দান করলেন। তাঁর রচিত সেই গ্রন্থগুলিই পুরাণ। শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনারূপে সমাদৃত হল। কিন্তু বেদব্যাসের মনে শান্তি এলো না। তিনি তৃপ্ত হলেন না। এই সময় একদিন যখন তিনি অশান্তচিত্তে সরস্বতী নদীর তীরে বসে আছেন, তখন হঠাৎ নারদ উপস্থিত হলেন সেখানে। অন্তর্যামী দেবর্ষি মহর্ষিকে বললেন, 'বেদব্যাস! তুমি শাস্ত্রের সব কথাই বলেছো, কিন্তু বল নি তাঁর লীলাময় জীবনের কথা, যাঁর মহাজীবনের মাঝে সমস্ত শাস্ত্র সার্থক হয়েছে। তুমি শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা কর। তাহলেই তোমার অশান্ত চিত্ত শান্ত হবে আর বিশ্বজনও শান্তি লাভ করবে।'

"মহর্ষি বেদব্যাস তখন রচনা করলেন ভাগবত। তারপরে তিনি সেই ভাগবতীয় তত্ত্বরস দান করলেন তাঁর পুত্র ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীশুকদেবকে। ভাগবত লাভ করে শ্রীশুকদেব ভাগবত হলেন —জীবন্ত ও চলন্ত ভাগবত। চলতে চলতে তিনি পৌঁছলেন হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে। সেখানে তখন এক বিরাট জনসভা চলছে। মধ্যস্থলে বসে আছেন ভারত-সম্রাট পরীক্ষিৎ—অর্জুনের পৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র। শ্রীশুকদেব মহারাজা পরীক্ষিৎকে সেখানে দেখে বিস্মিত হলেন। পরে তিনি তাঁর আগমনের কারণ জানতে পারলেন।

"রাজা পরীক্ষিৎ জন্মেছিলেন দ্বাপরের শেষে। কিন্তু তিনি কিছুতেই কলিকে স্থান দিতে রাজী হচ্ছিলেন না। কলি তাই পরীক্ষিতের দেহে পাপ খুঁজতে শুরু করলেন। এই সময় একদিন মহারাজা

পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গিয়েছেন। কলি কৌশল করে তাঁকে সঙ্গীহীন এবং পিপাসার্ত করে ফেললেন। পিপাসায় কাতর পরীক্ষিৎ উপস্থিত হলেন সমীক ঋষির আশ্রমে। জল চাইলেন ঋষির কাছে। কিন্তু ঋষি তখন ধ্যানস্থ। রাজার প্রার্থনা তাঁর কানেই পৌঁছল না।

"ক্ষুব্ধ রাজা তখন তাঁর ধনুকের মাথা দিয়ে একটি মৃত সাপ তুলে ঋষির গলায় জড়িয়ে দিলেন। পরক্ষণেই রাজা তাঁব ভুল বুঝতে পারলেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। মহৎ ব্যক্তিকে অপমান করার জন্য তাঁর যে পাপ হয়েছে, তারই ভেতর দিয়ে কলি নিজের পথ করে নিয়েছেন।

"এদিকে পিতাকে অপমান করবাব জন্য সমীক ঋষির পুত্র মহারাজা পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিলেন, 'সাতদিন পরে সর্প দংশনে আপনার মৃত্যু হবে।'

"পরীক্ষিৎ কিন্তু সে অভিশাপে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি হরিদ্বারে গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডেব তীবে অনশনরত অবস্থায় আসন গ্রহণ করলেন আর সেখানেই সেদিন উপস্থিত হলেন শ্রীশুকদেব।

"মহারাজা পরীক্ষিৎ তাঁর কাছে হরিকথা শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কবলেন। তাঁর মুখপদ্ম থেকে সপ্তাহকাল অখণ্ডভাবে হবিকথাব অমৃতধারা প্রবাহিত হল। সেই 'শুক মুখাদমৃতদ্রবসংযুতং' বার্তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত—নিখিল শাস্ত্রের সার, দুঃখতপ্ত ও কলিগ্রস্ত সংসাবী জীবগণের বেঁচে থাকবার একমাত্র অবলম্বন। সেই কথাই আমি আপনাদের বলব।

"আমাদের হিন্দুধর্মের আঠারখানি পুবাণ আছে। কিন্তু তার সব কয়খানিতে শ্রীকৃষ্ণ-বৃত্তান্ত নেই; মাত্র নয়খানিতে শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে। পুরাণ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ-বৃত্তান্ত আছে মহাভারত ও হরিবংশে। কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত। কারণ আমরা মনে করি, বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মের যে নিগূঢ়তত্ত্ব অভিহিত হয়েছে, একমাত্র ভাগবতেই তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই ভাগবতগ্রন্থ

আমাদের কাছে অমৃতস্বরূপ। আসুন, আমরা এখন সেই অমৃতধারায় আমাদের তৃষিত প্রাণকে সিঞ্চিত করি।

"কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। ভাগবত না হতে পারলে ভাগবতগ্রন্থ পাঠ শোনা বৃথা।"

"ভাগবত কাকে বলব মহারাজ?" মাঝখান থেকে চক্রবর্তী প্রশ্ন করে।

মথুরা মহারাজ উত্তর দেন, "যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে আশ্রয় করেন, সর্বদা তাঁর সেবায় রত থাকেন, একমাত্র তিনিই ভাগবত।"

চক্রবর্তী মাথা নাড়ে। মথুরা মহারাজ বলতে থাকেন, "শ্রীমদ্ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক দ্বাদশটি স্কন্ধে বিভক্ত। কোন কোন আচার্যের মতে ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ তাঁর উরু, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্কন্ধ দুই পার্শ্বদেশ, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ দুই বাহু, নবম হৃদয়, একাদশ কপাল ও দ্বাদশ মস্তক আর দশম স্কন্ধটি পরম প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের অধরের মধুর হাসি—'মঞ্জু হাস্যতাম্।' কারও সঙ্গে সামান্য সময়ের জন্য দেখা হলে যেমন তার মুখের হাসিটি দেখা উচিত, আমরাও তেমনি আমাদের স্বল্পকালীন বৃন্দাবন অবস্থানের সময় কেবল এই দশম স্কন্ধটি পাঠ করব।

"দশম স্কন্ধ পাঠ করার আরও একটি কারণ আছে। এই স্কন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা রয়েছে। একটু আগে আমি আপনাদের বলেছি, শ্রীশুকদেব যখন রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীভাগবতী কথা শোনাতে শুরু করলেন, তখন তাঁর মাত্র সাতদিন পরমায়ু অবশিষ্ট ছিল। নয়টি স্কন্ধ শুনতে তাঁর তিনটি দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন শুরু হল দশম স্কন্ধ। আমরাও এখন তাই পাঠ করছি।

"কিন্তু পাঠ শুরু করার আগে বলে নেয়া দরকার, এই দশম স্কন্ধটি সুবৃহৎ—৯০টি অধ্যায় এবং ৩৯৪৩টি শ্লোকে বিস্তৃত। এই শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত

হয়েছে। আমরা এই যাত্রাকালে তার প্রথম ছুটির লীলামৃত পান করব।

"আপনারা নিশ্চয়ই মহারাজা চন্দ্রের পুত্র নহুষের নাম শুনেছেন। এই নহুষের ছেলে হলেন যযাতি। যযাতির দুই স্ত্রী—দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর ছেলে যদু, আর শর্মিষ্ঠার ছেলে পুরু। বসুদেব ও কংস যদুর বংশধর, আর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু জরাসন্ধ দ্রুপদ ও দ্রোণাচার্য প্রভৃতি মহারাজা পুরুর বংশধর। কুন্তীদেবী বসুদেবের পাঁচ বোনের অন্যতমা। কাজেই কৃষ্ণ এবং অর্জুন মামাতো-পিসতুতো ভাই।

"যাক্ গে, এবারে মূল কাহিনীতে আসা যাক্। মথুরার রাজা কংসের বোন দেবকীকে বিয়ে করলেন বসুদেব। বিবাহোৎসব শেষ হয়ে গেছে। বর ও বধূকে বিদায় দেবার সময় সমাগত। তাঁরা রথে উঠে বসেছেন। দেবকী কংসের প্রিয়তমা ভগিনী। তাই তিনি নিজে গিয়ে সারথীর আসনে বসেছেন। এমন সময় সহসা এক দৈববাণী হল—'অস্যাস্তামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ।'
—মূর্খ কংস, তুই সারথিরূপে যাকে বহন করছিস, সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোকে বধ করবে।

"স্তম্ভিত কংস তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তিনি এক হাতে দেবকীর চুল ধরে আরেক হাতে তাঁকে বধ করবার জন্য খড়্গ ওঠালেন। শঙ্কিত বসুদেব বললেন, 'আপনি বীর, ভোজবংশের যশোবর্ধক। আপনি শেষ পর্যন্ত একটি মেয়েকে, আপনার বোনকে বধ করবেন?'

"কিন্তু বসুদেবের যুক্তি ও আবেদন মৃত্যুভয়ে ভীত কংসের মনে কোন রেখাপাত করতে পারল না। তিনি আবার খড়্গ তুললেন। উপায়ান্তর না দেখে বসুদেব তখন বিপদের হাত থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পাবার জন্য কংসকে বললেন—

'ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য, যদ্‌বাগাহাশরীরিণী।
পুত্রান্‌ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্‌॥'

—হে সৌম্য, যা আকাশবাণী হয়েছে, তাতে তো দেবকী আপনার মৃত্যুর কারণ নয়। সুতরাং তার থেকে আপনার কোন ভয় নেই—দেবকীর ছেলে থেকেই ভয়। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দেবকীর ছেলে হওয়া মাত্র আমি তাদের আপনার হাতে সঁপে দিয়ে যাব।

"সত্যবাদী বসুদেবের কথা বিশ্বাস করে কংস তাঁদের ছেড়ে দিলেন। বসুদেব দেবকীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

"কালক্রমে দেবকীর একটি ছেলে হল। সত্যাশ্রয়ী বসুদেব তাকে এনে কংসের হাতে দিলেন। কংস কিন্তু ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার অষ্টম সন্তান থেকেই আমার ভয়, কাজেই আপনি একে নিয়ে যান।'

"এভাবে হয়ত দেবকীর সাতটি সন্তান বেঁচে যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না। একদিন নারদ এসে কংসকে বললেন, 'যদুবংশের সবাই দেবতা এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচর। তাঁরা প্রত্যেকে কংসের চিরশত্রু।'

"কংস তখন দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে বন্ধ করে রাখলেন এবং তাঁদের সন্তানদের হত্যা করতে থাকলেন। এইভাবে কংস একে একে দেবকীর ছয়টি পুত্রকে হত্যা করলেন।......

"আজ এই পর্যন্তই থাক্।" থামলেন মথুরা মহারাজ। ভাগবতখানা বন্ধ করে তিনি সেই পবিত্র পুরাণকে প্রণাম করলেন। আমরাও প্রণাম করি ঐ মহাপুরাণকে।

আজকের মতো পাঠ শেষ হল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল কীর্তন। এবারে প্রকৃতই কীর্তন। কেষ্টপ্রভু আগে গাইছেন, তারপরে অন্য সবাই। এই ফাঁকে একটু চা খেয়ে এলে হত। আশ্রমের বাইরে, ঠিক ধর্মশালার সামনেই চায়ের দোকান। ভক্ত এবং শিষ্যদের চা পান নিষিদ্ধ, কারণ চা একটা নেশা। কাজেই 'টি-রিসেস্' বলে কোন ছুটি নেই আশ্রমিক প্রোগ্রামে।

সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসি নাট-মন্দির থেকে। খালি

পায়েই রাস্তায় আসি। চলতে কষ্ট হচ্ছে। ঠাণ্ডা তো লাগছেই, সেই সঙ্গে পাথরের কুঁচি পায়ে বিঁধছে। বিঁধুক গে, অভ্যেস হওয়া দরকার। খালি পায়ে বন-পরিক্রমা করতে হবে। আমি দোকানের দিকে এগিয়ে চলি।

আরে! এখানে যে অনেকেই রয়েছেন দেখছি। চক্রবর্তী বণিকপ্রভু সেনবাবু জানকী মায় দিদিমা পর্যন্ত। চক্রবর্তী ডাক দেয় আমাকে, "এসো হে, কি ব্যাপার, চা খাবে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও তাই। বুঝলে, এই চা-টা না খেয়ে পারি না। তাই সুযোগ বুঝে পালিয়ে এলাম।"

"কিন্তু তোমাকে তো আমি গাড়িতে চা খেতে দেখি নি?"

"খেয়েছি রে ভাই, খেয়েছি। প্ল্যাটফর্মে নেমে চুপি চুপি খেয়ে নিয়েছি, ঐ খাণ্ডাটা সঙ্গে ছিল যে। দেখলেই মহারাজদের কাছে বলে দিত।"

"মহারাজরা চা খান না বুঝি?"

"জয় রাধে, জয় রাধে। একি প্রশ্ন করলে তুমি? মহারাজরা চা খাবেন কি? তাঁরা হলেন গিয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।"

"আপনি কিছুই জানেন না চক্রবর্তীদা।" মাঝখান থেকে জানকী বলে ওঠে। ওরা পূর্ব-পরিচিত। উভয়েরই কলকাতার আশ্রমে যাতায়াত আছে।

"কি বললে?" চক্রবর্তী প্রশ্ন করে।

জানকী বলে, "আপনি কিছুই জানেন না। অনেক মহারাজ সর্দি হলে আদা-চা খান। আমি নিজে বানিয়ে দিয়েছি।"

"আরে সে তো হল গিয়ে ওষুধ। সর্দি হলে খাবেন না কেন?"

"বেশি শীত পড়লেও খান।" জানকী আবার বলে।

"ঐ একই কথা।" চক্রবর্তী আবার উত্তর দেয়।

"অনেক সময় খুব গরম পড়লেও খান।"

এবারে আর চক্রবর্তী কিছু বলতে পারে না।

জানকী বলে চলে, "এখানে সকালে যা শীত আর দুপুরে যে রকম গরম, দেখবেন অনেক মহারাজ আর ব্রহ্মচারীরাই লুকিয়ে লুকিয়ে চা খাবেন।"

নাঃ, মেয়েটা সত্যি বড় নাছোড়বান্দা। চক্রবর্তী চুপ করে যাবার পরেও সমানে বলে চলেছে।

চা খেয়ে আমরা ফিরে আসি আশ্রমে। কীর্তন শেষ হয়ে গেছে। সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন মন্দিরের সামনে। ব্রহ্মচারীদের গলায় খোল, সেবকদের হাতে করতাল। শিষ্য-শিষ্যাদের হাতে পতাকা—বড় বড় বাঁশের ছিপের ডগায় ত্রিকোণাকৃতি রঙীন পতাকা। তাতে স্বস্তিক চিহ্ন ও হিন্দীতে আশ্রমের নাম ছাপানো রয়েছে। না, শোভাযাত্রাটা সত্যিই শোভাযুক্ত হবে।

নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রায় প্রত্যেকেই তিলকসেবা করে নিয়েছেন। আর তাই দেখে চক্রবর্তী বলে ওঠে, "ইস্, তাড়াতাড়িতে আমার তিলকসেবাটা ভাল হল না ভাই!"

কথাটা মিথ্যে নয়, ওর তিলকসেবা দেখে অনেকে মুচকি হাসছে। তবে সেটা তাড়াতাড়ির জন্য, কি চক্রবর্তীর অপটু হাতের জন্য তা ভেবে দেখবার বিষয়। কারণ তিলকসেবা একটা আর্ট এবং বহুদিন প্র্যাক্‌টিস করে সেটি রপ্ত করতে হয়। তবু চক্রবর্তীকে খুশি কবতে আমাকে অন্য কথা বলতে হয়। বলি, "বেশ তো, কাল থেকে ধীরে-সুস্থে তিলকসেবা করো। তাহলে অবশ্যি তোমাকে আরও সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে।"

"উপায় কী, তাই উঠব। তবে জানো তো ভাই। আমি চাকরি করি না। তোমাদের মতো সাত-সকালে উঠে নাকে-মুখে গুঁজে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে হয় না আমাকে। আটটার আগে ঘুম ভাঙে না বলে আমি বারোটাব আগে কোনও এ্যাপয়েন্ট্‌মেণ্ট্ করি না।"

"বুঝতে পারছি খুবই কষ্ট হবে তোমার। তবু ভালভাবে তিলক-সেবা করতে হলে সকালে ওঠা ছাড়া উপায় নেই, বৈষ্ণবের জীবন যে ত্যাগ আর ভক্তি দিয়ে গড়া!"

"ঠিকই বলেছো ভাই, কাল থেকে তাই করতে হবে।" চক্রবর্তীর বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উথলে ওঠে। মনে মনে ভাবি, ভোগের প্রতি যদি এতই আসক্তি, তাহলে বৈষ্ণব হবার সাধ কেন?

মহারাজরা ঘর থেকে বেরিয়ে মন্দিরের সামনে এলেন। নরেন-প্রভুও তাঁদের সঙ্গে এসেছেন। মঙ্গলারতির সময় তাঁকে দেখেছিলাম একবার। কিন্তু পাঠ-কীর্তনের আসরে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না! বোধহয় ভাঁড়ার কিংবা রান্নাঘবে ব্যস্ত ছিলেন। এতগুলি লোকের খাওয়া-দাওয়া, সোজা ব্যাপাব নয় তো! বলতে গেলে সবই দেখতে হচ্ছে তাঁকে। এবারে বোধহয় একটু ফুরসৎ পেয়েছেন, তাই পরিক্রমায় চলেছেন। নিশ্চয়ই চলেছেন, নইলে তিনি এমন ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করবেন কেন? না, কোন অন্যায় করেননি তিনি। 'মিটিং কা কাপড়া' যদি থাকতে পারে, তাহলে 'পবিক্রমা কা পোশাক' থাকবে না কেন?

যথানিয়মে মন্দিরে প্রণাম করে সারি বেঁধে আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসি আমরা। নরেনপ্রভু হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, "না, এগুলানরে আর মানুষ করা গ্যালো না।"

চমকে উঠি। কাকে বলছেন—আমাদেব নয তো?

না, আমাদের নয়। নরেনপ্রভু একজন ব্রহ্মচারীকে বলছেন, "না কইয়া দিলে কি তোমরা একটা কথাও মনে রাখবা না?"

"কেন, কি হয়েছে প্রভু?" বেচারী ব্রহ্মচাবী কোনমতে জিজ্ঞেস কবেন।

"আবার জিগাইতে আছো, কি হইছে! বলি 'ফেস্টুন্'ডা কই? হেইডা লইতে লাগব না?"

ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি জিভে কামড় দেন।

"যাও, আর দেরী কইরো না। শিগ্‌গীব লইয়া আও।" নরেনপ্রভু তাঁকে তাড়া দেন। ব্রহ্মচারী ছুটে অফিস ঘরে চলে যান।

বেজে উঠল খোল-করতাল কাঁসর ও শঙ্খ। মহিলারা একযোগে

উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন। আমাদের যাত্রা হল শুরু। সেই সঙ্গে শুরু হল কীর্তন – নগর সংকীর্তন ও দর্শন।

সবার আগে গেরুয়া রঙের ফেস্টুন হাতে দু'জন ব্রহ্মচারী। ফেস্টুনটি প্রায় ফুট পাঁচেক লম্বা ও ফুটখানেক চওড়া। দু'দিক দুটি সরু লাঠির সঙ্গে লাগানো। সেই লাঠি দুটি ধরে অনেকটা উঁচু করে নিয়ে ব্রহ্মচারীরা এগিয়ে চলেছেন। ফেস্টুনে হিন্দীতে আমাদের আশ্রমের নাম লেখা আছে। ভাগ্যিস নরেনপ্রভু কথাটা মনে করেছিলেন! ফেস্টুন ছাড়া পরিক্রমা অর্থহীন। শত শত আশ্রম এবং কয়েক ডজন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছেন বৃন্দাবনে। পথচারীরা কেমন করে বুঝবেন যে, আমরা এই আশ্রমের পক্ষ থেকে পরিক্রমা করছি! 'পলিটিক্যাল ওয়ার্লড্'-য়ের মতো 'রিলিজিয়াস ওয়ার্লড্'-য়েও 'পাবলিসিটি'র একটা মূল্য আছে বৈকি!

ফেস্টুনের পরে মালা গলায় গুরুমহারাজ ও অন্যান্য মহারাজরা। তার পরে সীনিয়ারিটি হিসাবে খোল-করতাল ও কাঁসর নিয়ে ব্রহ্মচারী ও সেবকরা চলেছেন। তাঁরাও গলায় মালা দিয়েছেন, নরেনপ্রভু রয়েছেন প্রথম দিকেই। বলা বাহুল্য তাঁরও গলায় একটি মালা।

মহারাজ ও ব্রহ্মচারীদের পরে মহিলারা। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের হাতে পতাকা। কেবল জানকীর হাতে রয়েছে শাঁখ। ওর দিকে নজর পড়তেই সেই একই ভাবনাটা দেখা দেয় মনে—এই মেয়েটি বন-পরিক্রমায় এলো কেন? এ বয়সে এই কৃচ্ছ্রসাধনের কি প্রয়োজন ওর?

মহিলাদের পরে আমরা—শিষ্য ও অশিষ্যের দল। প্রণামের পরে সেই যে কীর্তন শুরু হয়েছে, তা কিন্তু আর থামে নি। থামবেও না, থামবার নিয়ম নেই। কীর্তন পরিক্রমার প্রধান অঙ্গ। কারণ কীর্তনের একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। কীর্তন জোর করে মনকে উঁচুতে নিয়ে যায়। আমরা তাই ভক্তিভরে গেয়ে চলেছি—

'নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥

শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে,
প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব-ধর্ম সার ॥'

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত এই অপরূপ নগর-কীর্তনের আবেশে উদ্বেলিত হয়েছি আমরা, উচ্ছলিত হয়েছেন ব্রজবাসীরা। শিশু-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, ধনী-নির্ধন সবাই ঘর ছেড়ে নেমে এসেছেন পথে। পথের পাশে কর্মজীবন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সবাই জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে আছেন। দোকানী দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছেন, গয়লা গাই দোয়ানো বন্ধ করেছে, মায়েরা রান্না ফেলে এসেছেন, ছেলে-মেয়েরা খেলা ভুলে পথে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা কীর্তন করতে করতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন।

এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। গাড়ি-ঘোড়াও চলছে না। পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ কলকাতার শোভাযাত্রীদের মতো আমরা সারাপথ জুড়ে চলছি না। পথের পাশে যাতায়াতের জায়গা পড়ে আছে। তবু গাড়ি চলছে না, ঘোড়া চলছে না। চলছে না কারণ, সবাই আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে চাইছে।

এই সেই বৃন্দাবন—মধুময় বৃন্দাবন। ভৌগোলিকরা বলবেন ২৭° ৩৩´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৭° ৪২´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই শহর। যমুনা এখানে এমন একটি বাঁক নিয়েছে, যার ফলে সৃষ্ট হয়েছে একখণ্ড উপদ্বীপসদৃশ ভূখণ্ড। সেই ভূখণ্ডই মূল-বৃন্দাবন। যমুনা তিন দিক থেকে সিক্ত করেছে মন-বৃন্দাবনকে। বৈষ্ণবরা বলেন, শ্রীরাধিকার সখী বৃন্দাদেবীর নাম থেকে বৃন্দাবনের নাম হয়েছে। কিন্তু এ জেলার ব্রিটিশ কালেকটর মিঃ এফ. এস. গ্রাউস বলেছেন, তুলসী তথা বৃন্দাবৃক্ষ থেকে বৃন্দাবন নামটি হয়েছে। শুনেছি এখনও

বৃন্দাবনে সহস্রাধিক মন্দির এবং বত্রিশটি ঘাট আছে। আমরা তাঁর কয়েকটি মাত্র দর্শন করব।

বৃন্দাদেবীর মন্দির বৃন্দাবনের প্রথম মন্দির। সেবাকুঞ্জের মধ্যে কোথাও সেই মন্দির অবস্থিত ছিল। কিন্তু এখন তার কোন চিহ্নই নেই। পরবর্তীকালে গোবিন্দ-মন্দির প্রাঙ্গণে বৃন্দাদেবীর মন্দির নির্মিত হয়। সে মন্দির এখনও রয়েছে, আমরা দর্শন করব। কিন্তু আজ দর্শন করতে পারব না বৃন্দাদেবীর মূল-বিগ্রহ। বৃন্দাদেবী রয়েছেন কাম্যবনে।

আওরঙ্গজেব ব্রজমণ্ডল আক্রমণ করছেন খবর পেয়ে জয়পুরের মহারাজা গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধামাধব, রাধাদামোদর ও রাধাবিনোদ বিগ্রহের সঙ্গে বৃন্দাদেবীকেও বৃন্দাবন থেকে নিয়ে যান। জয়পুরের পথে কাম্যবনে, অর্থাৎ ব্রজমণ্ডলের সীমান্তে সহসা বৃন্দাদেবীর রথের চাকা মাটিতে বসে গেল। কিছুতেই সে চাকা তোলা গেল না। তখন বিপন্ন জয়পুরাধিপতি বৃন্দাদেবীর স্তবস্তুতি করে জানতে পারলেন, বৃন্দাবনের গৃহদেবী বৃন্দা ব্রজধাম ছেড়ে যেতে চাইছেন না।

তখন মহারাজা কাম্যবনের একটি পুরানো সাতমহলা বাড়িতে বৃন্দাদেবীকে প্রতিষ্ঠা করে, গোবিন্দ ও অন্যান্য বিগ্রহদের নিয়ে জয়পুরে চলে গেলেন। জয়পুর পৌঁছে প্রথম রাতেই তিনি বৃন্দাদেবীকে স্বপ্ন দেখলেন। দেবী তাঁকে বলছেন—'তুমি বোধহয় জানো না, গোবিন্দদেবের প্রসাদ ছাড়া আমি অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারি না। কাজেই আজ চারদিন হল আমি উপবাসী রয়েছি।'

মহারাজ তখন বৃন্দাদেবীর সেই মন্দিরে একটি গোবিন্দমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পূজা ও ভোগের বন্দোবস্ত করে দেন। সেই থেকেই বৃন্দাদেবী রাধাগোবিন্দের সেবিকারূপে কাম্যবনে অবস্থান করছেন। বন-পরিক্রমার সময় আমরা তাঁকে দর্শন করব।

এখন আমরা চলেছি বৃন্দাবনের গোবিন্দ-মন্দিরে। বৈষ্ণবরা বলেন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির। গৌড়ীয় মতে বৃন্দাবনে এসে

প্রথমে এই মন্দির দর্শন করতে হয়। অনেকে স্টেশন থেকে সোজা মন্দিরে আসেন। সেই দর্শনকে বলে 'ধুলো পায়ে দর্শন'।

কথিত আছে, মহাপ্রভুর পার্ষদদের পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক শক্তির কথা শুনে মহামতি আকবর ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন পরিদর্শনে এলেন। গোস্বামীরা একদিন রাতে তাঁকে চোখ বেঁধে নিধুবনে নিয়ে গেলেন। সম্রাট সেখানে এমন এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলেন যে, তিনি সেখানকার স্থানমাহাত্ম্য স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মহারাজ মানসিংহের সক্রিয় সহায়তায় বৃন্দাবনে নবযুগেব সূত্রপাত হল—গড়ে উঠল গোবিন্দদেবের মন্দির। সেই মন্দির দর্শন করতেই চলেছি আমরা। চলেছি কীর্তন করতে করতে—

'জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদনমোহন হরি অনন্ত মুকুন্দ॥
জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ॥'

রাস্তা থেকে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠে আসি ওপরে। বাঁদিকে বৃন্দাদেবীর ছোট মন্দির। সামনে প্রাচীন গোবিন্দ-মন্দির—লাল পাথরের সুবিশাল মন্দিব। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি উত্তর-ভারতের হিন্দু শিল্প-সমৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। হিন্দু ও গ্রীক স্থাপত্যকলার সংমিশ্রণে সৃষ্ট। তবে মুসলমান স্থাপত্যের কিছু ছাপও রয়েছে। চারিদিকের দেওয়ালগুলি প্রায় দশফুট চওড়া। নাট-মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে একশ' ফুট এবং চমৎকার স্তম্ভে সুশোভিত। গুরুদেব রূপ ও সনাতন গোস্বামীব নির্দেশে রাজা মানসিংহ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন এই সাততলা ও নয় চূড়াযুক্ত সুন্দর এবং সুবিশাল মন্দিরটি। সম্রাট আকবর দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় সমস্ত পাথর। তাঁর রাজদরবারের জেসুইট মিশনারীরা নক্সা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সে আমলেও কেবল মজুরীর জন্য মানসিংহের তেরো লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এ আমলে হলে

অন্তত এক কোটি টাকা মজুরী দিতে হত। কথিত আছে, মন্দির নির্মিত হবার পর আকবর ছদ্মবেশে এসে এই মন্দির দর্শন করে যান। মন্দিরশীর্ষের ঘৃত-প্রদীপটির আলো নাকি আগ্রা থেকে দেখা যেত।

সেই আলো আকবর দেখেছেন। দেখেছেন জাহাঙ্গীর ও শাজাহান। কেউ বা খুশি হয়েছেন, কেউ বা হন নি। তবে তাঁরা কেউ দুঃখিত হন নি। হিন্দু মন্দিরের আলো যদি মুসলমান সম্রাটের প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে দেখা যায়, তাতে ক্ষতি কি?

'ক্ষতি আছে বৈকি! আমি ধার্মিক মুসলমান, আমি হিন্দুস্থানের সম্রাট—সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাকে ঐ কাফেরদের মন্দিরের বাতি দেখতে হবে? ভেঙে ফেল। মথুরা-বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে ঐ দুই নগরীর নতুন নাম রাখো, ইসলামাবাদ ও সেমিনাবাদ।' গর্জে উঠলেন মহামতি আকবরের ধর্মান্ধ প্রপৌত্র আওরঙ্গজেব।

সম্রাটের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুযোগ্য সেনাপতি আবছন্নবি মথুরার পথে রওনা হলেন। সংবাদটা কিন্তু রাজপুতনায় পৌঁছে গিয়েছিল অনেক আগেই। আর তার ফলেই জয়পুরের মহারাজা রাধাগোবিন্দের মূল-বিগ্রহ জয়পুরে নিয়ে গেলেন। সে বিগ্রহ আজও সেখানেই পূজিত হচ্ছে।

মোগলসৈন্য মথুরা-বৃন্দাবনের অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে গোবিন্দ-মন্দিরও ধ্বংস করেছিল। কিন্তু মন্দিরটির গঠন অত্যন্ত মজবুত হওয়াতে একেবারে ভেঙে ফেলতে পারে নি। মূর্তিগুলি বিনষ্ট করে তারা কেবল চূড়াসহ ওপরের চারিটি তলা ভেঙে ফেলে, যাতে মন্দির শীর্ষের আলো আর আগ্রা থেকে দেখা না যায়। এবং সেটুকু করে তারা সেদিন অন্য মন্দিরের দিকে নজর দিয়েছিল বলেই আজও আমরা সেই অপূর্ব স্থাপত্য-শিল্পের কিছু নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি।

সেই ধ্বংসলীলার পরে গোবিন্দ-মন্দির বহুকাল অনাদৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। তারপরে আরেকজন বিধর্মীর নজর পড়ে

এই মন্দিরের দিকে। তিনিই মহানুভব গ্রাউস সাহেব—তৎকালীন মথুরার কালেক্টর। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং জয়পুরের মহারাজার সক্রিয় সাহায্যে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্ন গোবিন্দ-মন্দিরের সংস্কার শুরু হল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কারকার্য শেষ হয়।

আমরা কিন্তু প্রাচীন মন্দিরে প্রবেশ করলাম না। এখন রাধাগোবিন্দের পুজো হয় নতুন মন্দিরে—প্রাচীন মন্দিরের পেছনে। চব্বিশ পরগণার বহড়ু গ্রামের জমিদার ৺নন্দকুমার বসু ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেছেন এই নতুন মন্দির। সেই থেকে রাধাগোবিন্দ-দেব নতুন মন্দিরেই পূজিত হচ্ছেন। পুরনো মন্দিরে এখন শ্রীনিতাই-গৌর বিদ্যমান রয়েছেন। প্রাচীন মন্দিব আমরা পরে দর্শন করব। প্রাচীন মন্দিবের নিচেই 'যোগপীঠ', যেখানে শ্রীবাধাগোবিন্দদেব প্রকট হয়েছিলেন। এখন সেখানে যোগমায়াব একটি মূর্তি আছে।

প্রাচীন মন্দিরকে ডানদিকে বেখে পাথর-বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে আমরা নতুন মন্দিরে এলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কীর্তন করা হল কিছুক্ষণ। তারপরে প্রণাম করলাম গোবিন্দদেবকে। গোবিন্দ-মন্দির সহ অন্যান্য বড় মন্দিরে যাত্রীদের নির্দিষ্ট ভেট দেবাব নিয়ম আছে। কিন্তু আমাদের তা দেবার দবকার নেই। আশ্রমের তরফ থেকেই ভেট দেওয়া হল। আমরা কেবল সাধ্যমত কিছু কিছু প্রণামী দিলাম।

মন্দির প্রদক্ষিণ করে চরণামৃত ও আশীর্বাদ নেবার পরে গুরুমহারাজের নির্দেশে সবাই বসে পড়ি মন্দির-প্রাঙ্গণে। লাঠি হাতে মথুরা মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন। বলতে লাগলেন, "ব্রজের শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনে এলেন। কিন্তু তাঁর পরম-বাঞ্ছিতের সাক্ষাত পেলেন না। তিনি তখন 'হায় গোবিন্দ, হায় গোবিন্দ—হায় প্রাণনাথ, তুমি কোথায়' বলে কাঁদতে কাঁদতে ব্রজমণ্ডলের গ্রামে-গ্রামে ও বনে-বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমন কি ব্রজবাসীদের ঘরে-ঘরেও তিনি তাঁর বাঞ্ছিত শ্রী ভগবানকে খুঁজতে থাকলেন।

"একদিন হঠাৎ এক অপূর্ব জ্যোতিসম্পন্ন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে বললেন—'ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে গোমাটিলায় গিয়ে দেখ, একটি গাভী এক জায়গায় দুগ্ধদান করছে। সেই পবিত্রস্থানে সর্ব ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব রয়েছেন।'

"এই বলে সেই ব্রাহ্মণরূপধারী শ্রীভগবান অদৃশ্য হলেন। শ্রীরূপ নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে গোবিন্দদেবকে পেলেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল এই মন্দির—শ্রীধাম বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির।"

॥ পাঁচ ॥

'(সখি হে), শ্যামের পিরিতি বিষম যে রীতি
যতনে পরাণ রয়।
দিবানিশি হিয়া যেমন করিছে
এ কথা বলিব কায় ॥
মনের আগুন জ্বলিছে দ্বিগুণ
কেবা পরতিত যায়।
আমি সে অবলা ঘব হৈল জ্বালা
লোকলাজ হৈল তায় ॥
আঁধুয়া পুকুবে যেন থাকে মীন
ঝাঁপয়ে ধীবর জালে।
এমতি আছিএ এ ঘরকবণে
গুরুজনা কত বলে ॥
ক্ষুবেব উপব যেমন বসতি
নড়িতে কাটয়ে দেহ।
আমার দুখেব আচাব বিচার
এ কথা বুঝয়ে কেহ ॥
শঙ্খবণিকের করাত যেমন
দুদিক কাটিয়া যায়।
তেমতি আমারে গুরুজনা কাটে
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥'

কীর্তন থামে নি, তবে তার পদ পরিবর্তিত হয়েছে। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের পদ ছেড়ে চণ্ডীদাসের গান। আর সে গান গাইছেন স্বয়ং গুরুমহারাজ। একে তো চমৎকার কণ্ঠস্বর আর বিশুদ্ধ উচ্চারণ, তার ওপর দেবদুর্লভ চেহারা। সত্যিই দেখার মতো। শোনার মতো তো বটেই। তাই গোবিন্দ-মন্দির দর্শন শেষে

মন দিয়ে গান শুনতে শুনতে ফিরে চলেছি আশ্রমে। শুনছি আর ভাবছি—ভাবছি, বৈষ্ণবধর্মের কথা।

বিষ্ণুই যাঁর আরাধ্য, অথবা যিনি বিষ্ণু যজন করেন, তিনিই বৈষ্ণব। আমরা ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ পাই। কাজেই বৈদিক-যুগেও বিষ্ণু-আরাধনার প্রচলন ছিল। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও বিষ্ণুর প্রাধান্য কীর্তিত। প্রাচীন ও আধুনিক যে ২৩৫ খানি উপনিষদ্ দেখতে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশতেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই সব উপনিষদের কতগুলি যে পাণিনির পূর্বে আম্নাত (ব্যক্ত) হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই রকম ছু'খানি উপনিষদে আমরা 'দেবকীপুত্র মধুসূদন' (অথর্ব্বশিরঃ) এবং 'দেবকীপুত্র কৃষ্ণ আঙ্গিরস' (ছান্দোগ্য) কথা ছু'টি দেখতে পাই। তবে মহাভারতেই প্রথম বৈষ্ণবগণের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

মহাভারতের শান্তি-পর্বে বলা হয়েছে যে, উপরিচর নামে একজন রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের সখা এবং নারায়ণের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি সূর্যমুখনিঃসৃত 'সাত্বত' বিধির অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রথমে দেবেশ নারায়ণ এবং পরে পিতামহ ব্রহ্মার অর্চনা করতেন। সাত্বত শব্দের অর্থ সমাহিত হয়ে কাম্য ও নৈমিত্তিক যাজ্ঞীয় ক্রিয়া সাত্বত বিধি অনুসারে নির্বাহ করা। এই বিধি অনুসারে মুখ্যব্রাহ্মণগণ পাঁচরাত 'ভগবৎপ্রোক্ত ভোজ্যাদি' গ্রহণ করতেন। বৈদিকযুগেও সাত্বত বিধির পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। মহাভারতের এই আখ্যান থেকে মনে হয়,:সাত্বত বিধানই প্রথম বৈষ্ণব মত। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত ঋষি সাত্বত বিধির প্রবর্তক।

শ্রীমদ্ভাগবতেও সাত্বত-তন্ত্র প্রকাশের ইতিহাস পাওয়া যায়। বলা হয়েছে—স্বয়ং বিষ্ণুই এই ধর্মের প্রকাশক। তিনি প্রথম ব্রহ্মার কাছে 'ভাগবতধর্ম' প্রকাশ করেন। পরে ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুকদেবকে এবং শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে ভাগবতধর্মের উপদেশ দান করেন।

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত থেকে বুঝতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে বৈষ্ণবধর্ম 'সাত্বতধর্ম', 'ভাগবতধর্ম' ও 'পঞ্চরাত্রধর্ম' নামে অভিহিত হত।

পদ্মপুরাণে চার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের কথা বলা হয়েছে—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক। বলা হয়েছে যে, কলিকালে লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক থেকে চাব সম্প্রদাযেব বৈষ্ণবেব আবির্ভাব ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবরা সকলেই এই চাব মূল-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তবে পরবর্তীকালে অবতাবসদৃশ আচার্যগণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হওয়ায়, তাঁদেব নামেই এই চার সম্প্রদায পবিচিত হযে আসছে—

'রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥'

লক্ষ্মীদেবী বামানুজাচার্যকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং চাবি সন (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমাব) নিম্বার্কাচার্যকে নিজ নিজ সম্প্রদাযেব অভিনব প্রবর্তক বলে স্বীকার কবে নিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মধ্বাচার্য সম্প্রদাযভুক্ত। মধ্বমতে একমাত্র হবি পরমতম বস্তু। এই মতে, জগৎ ও তদ্‌গত ভেদ সত্য বলে স্বীকৃত। জীবগণ হরির অনুচর ও পবস্পর উচ্চ-নীচ ভাবপ্রাপ্ত। জীবেব নিজস্ব সুখানুভূতিই মোক্ষ। অমলা ভক্তিই সেই মোক্ষের সাধন। মাধ্বেরা যে গুরুপ্রণালী স্বীকাব কবেন, তা থেকে দেখা যায়, তাঁদের প্রথম গুরু শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিতীয় গুরু ব্রহ্মা, তৃতীয় নারদ, চতুর্থ বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) এবং পঞ্চম মধ্বাচার্য। এইভাবে মাধ্ব-বৈষ্ণবদেব পঞ্চদশ গুরু জয়ধর্ম। তাঁব দুই শিষ্য—বিষ্ণুপুরী ও পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের শিষ্য বিষ্ণুসংহিতা-প্রণেতা ব্যাসতীর্থ। তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি। লক্ষ্মীপতির শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী। তাঁর তিন শিষ্য—অদ্বৈতাচার্য, ঈশ্বরপুরী এবং নিত্যানন্দ। ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীগৌরাঙ্গ। অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের গুরুদেবের গুরুভাই।

আপনি প্রতভা ও ঐশ্বরিক শক্তিবলে শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণবধর্মকে এক নতুন রূপ দান করেন। আর তারই ফলে বৈষ্ণবধর্ম বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠল এবং এই জয়যাত্রায় অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায় হয়েছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবরা এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলে সুপরিচিত। রাজা থেকে ভিখারী, ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল, পণ্ডিত থেকে মূর্খ পর্যন্ত সংখ্যাতীত মানুষ আজ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রায় পাঁচশ' বছর আগে নবদ্বীপের মাটিতে যে প্রেমধর্ম অঙ্কুরিত হয়েছিল, আজ তা শত শত শাখা ও উপশাখায় পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়ে সারা বিশ্বে পড়েছে ছড়িয়ে।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে দাক্ষিণাত্যবাসীদের নামই প্রথম উচ্চারিত হয়। দক্ষিণ-ভারত থেকেই ভগবদ্ভক্তির বিমল প্রবাহ সারা ভারতকে সিঞ্চিত করেছে। কিন্তু কালক্রমে অসার উপধর্ম, নিষিদ্ধাচার ও ভগবদ্-বহির্মুখতায় যখন বৈষ্ণবধর্ম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং ভারতবর্ষে অধর্মের ঘোর অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, তখন এই বাংলাদেশের হৃদয় হতে প্রেমভক্তির এক অলৌকিক বিগ্রহ প্রকট হলেন—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের উদয় হল। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' ভাষায়—

'নদীয়া উদয় গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হইল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥'

দক্ষিণ-ভারত বৈষ্ণধর্মের প্রধান পীঠস্থান হলেও শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বহু আগে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম বিদ্যমান ছিল। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাণী (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত), জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' ও চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' মধ্যে বাঙালী বৈষ্ণবধর্ম এবং রাধা-কৃষ্ণের লীলারসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাস সম্পর্কে কয়েকটা কথা ভেবে নেওয়া দরকার। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)

মহাকবি চণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভূমিকায় সর্বজ্ঞ শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, 'এই পুঁথিখানিই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম বাঙ্গালা হরপের পুঁথি—উহার চেয়ে পুরান পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।...পুঁথির তারিখ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে পারে...তাহা হইলে পুঁথিখানি হয়ত চণ্ডীদাসের সমসাময়িক ;—কেন না, চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালকে উহাব আগে টানিয়া লওয়া চলে না।' তাঁর মতে—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস তাহা অস্বীকাবের হেতু নাই।'

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমানবিহাবী মজুমদার তাঁর 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'র (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ—১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) ভূমিকায় বলেছেন, 'চণ্ডীদাস অনেক। বহু চণ্ডীদাসেব বহু কাহিনী এক চণ্ডীদাসে আরোপ করার চেষ্টা হইতে আধুনিক সাহিত্যিকদেব মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের সূত্রপাত হইয়াছে।' কিন্তু তাঁর মতে, 'শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে একজন প্রতিভাবান চণ্ডীদাসের উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁহারই পদ আস্বাদন কবিয়া আনন্দলাভ করিতেন। ঐ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি।'

চণ্ডীদাস চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ, যে শতাব্দীরই কবি হয়ে থাকুন, তাঁর রচনা যে মহাপ্রভুকে প্রেমধর্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাবণ, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিভিন্ন স্থানে সেকথা বলেছেন। তিনি মধ্য-লীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন—

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥'৬৬

দশম পরিচ্ছেদে বলেছেন—

'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন-গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥'১১৩

আর অন্ত্য-লীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বলেছেন—

'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥৫
মধ্যে মধ্যে প্রভু আপন শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) প্রলাপ করিয়া ॥'৬

কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ কোন আকস্মিক আবির্ভাব নন, তিনি বাংলার ভক্ত-কবিদের ভাবনার বাস্তব-বিগ্রহ—হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে প্রেমধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে হ্লাদিনী শক্তি-সমন্বিত সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, অর্থাৎ শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনায় ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে জগতে কৃষ্ণপ্রেমের শিক্ষা বিস্তার করে গেছেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ তাঁদের আচার্যদের অবতার বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান এবং অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ তাঁর অংশ। তাঁদের মতে অদ্বৈতাচার্য সদাশিব এবং নিত্যানন্দ বলরাম আর শ্রীবাসাচার্য ও গদাধর ভগবৎশক্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাসাচার্যকে নিয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের পঞ্চতত্ত্ব।

মহাপ্রভুর শিষ্যদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় ছয় গোস্বামীর নাম। এঁরা হলেন—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। এঁরাই মহাপ্রভুর আদেশে লুপ্ত বৃন্দাবনকে প্রকট করে তুলেছেন। এখন সেই কথাই বলছি আমরা। বৃন্দাবনের পথে কীর্তন করে বলছি—

'শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥'
এই ছয় গোসাঁই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ ॥

এই ছয় গোসাঁইর করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥'

আমরাও তাঁদের চরণ-বন্দনা করছি। তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সকল বিঘ্ন নাশ করবেন এবং তাঁদের আশীর্বাদে সফল হবে আমাদের বন-পরিক্রমা।

মথুরা, বৃন্দাবন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে গৌড়ীয় মত প্রচার করতে ষড়্‌গোস্বামীকে যাঁরা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা হলেন শ্রীভূগর্ভ ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী। তাঁরা তখন বৃন্দাবনেই বাস করছিলেন।

পরবর্তীকালের বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য, ঠাকুর নরোত্তমদাস ও শ্রীশ্যামানন্দের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁদেরই ঐকান্তিক চেষ্টায় কিছুকালের মধ্যেই বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে জনপ্রিয়তা আজও রয়েছে। আর তারই ফলে আমাদের এই পরিক্রমা।

আশ্রমের সামনে পৌঁছে গেছি। আমার ভাবনা থেমে গেল। কিন্তু থামল না আমাদের কীর্তন। কীর্তন করতে করতেই মন্দিরের সামনে এলাম। মন্দিরে পুজো শুরু হয়ে গেছে।

কীর্তন থেমে গেল। আমরা মন্দিরে প্রণাম করলাম। এবারে নিশ্চয়ই ছুটি। বহুক্ষণ রোদে হেঁটেছি। একটু বিশ্রাম করে স্নানটা সেরে নেওয়া দরকার।

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েই বাধা পেলাম। চক্রবর্তী চেঁচিয়ে ওঠে, "আরে যাচ্ছ কোথায়? ভোগারতি দেখে মন্দির প্রদক্ষিণ করে যাও!"

তাড়াতাড়ি বলি, "যাচ্ছি না, এখানেই আছি। নাট-মন্দিরে গিয়ে একটু বসছি।"

"তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পুজোর সময় মন্দিরের সামনে না দাঁড়িয়ে, নাট-মন্দির গিয়ে বসবে?"

বলার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই নতমস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি চক্রবর্তীর পাশে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ—পুজো শেষ হয়। পুরোহিত আরতি আরম্ভ করেন। বেজে ওঠে খোল-করতাল। সেই প্রবীণ ব্রহ্মচারী ভোগারতির কীর্তন শুরু করেন—

'ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দযশোমতী-চিত্তহারী ॥
বেলা হ'লো, দামোদর, আইস এখন।
ভোগ মন্দিরে বসি করহ ভোজন ॥
নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥

* * *

রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ॥
ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল ॥

* * *

যশোমতি-আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত ॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধা-কৃষ্ণ গুণ গায় ॥
হরিলীলা একমাত্র যাঁহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সে ভকতি বিনোদ ॥'

কীর্তনের পরে গুরুমহারাজ জয়ধ্বনি শুরু করলেন—
"শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারী কী—"
"জয়।" আমরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিই।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কী……"

"জয়।"

"শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহনজী কী …. "

'জয়।"

"শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাজী কী … "

"জয়।"

"ভক্তবিঘ্নবিনাশক শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব কী · "

"জয়।"

"শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল কী ….."

"জয়।"

"চাবো ধাম কী · ·· "

"জয়।"

"চারো আচার্য কী ·· · "

"জয়।"

"গঙ্গাজী কী··· "

"জয়।"

"যমুনাজী কী · · "

"জয়।"

জয়ধ্বনিব পরে প্রণাম। তাবপব মন্দিবদ্বাব রুদ্ধ হয়ে গেল। এবারে কিছুক্ষণের জন্য দর্শন বন্ধ।

এখন ঘবে গেলে নিশ্চয়ই চক্রবর্তী কোন আপত্তি করবে না। সত্যিই করে না, ববং আমাব কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বলে, "চলো হে, তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিই। একটা বাজে, দেড়টায় প্রসাদ। চারটেয় পাঠ কীর্তন। সেই ফাঁকে একটু গড়া-গড়ি দিয়ে নিতে হবে। আমার আবার দুপুরে একটু শোবার অভ্যাস কিনা।"

মনে মনে ভাবি, আদর্শ ত্যাগীপুরুষ। এমন মানুষ দীক্ষা না

নিলে, কে নেবে? কিন্তু বলি না কিছু। নিঃশব্দে উঠে আসি ওপরে। ঘরে এসে দেখি সেই প্রাতঃকালীন অবস্থার পুনরাবৃত্তি চলেছে—বাথরুম নিয়ে কাড়াকাড়ি। চক্রবর্তীও তাদের সামিল হল। কেবল বোসবাবু ও সেনবাবু অসহায়ের মতো নিজেদের জায়গায় বসে আছেন। তাঁদের অবস্থা দেখে দুঃখ হচ্ছে আমার। বলি, "চলুন, রাস্তার কল থেকে স্নান করে আসা যাক্।"

ওঁরা উঠে দাঁড়ান। আমিও তৈরি হয়ে নিই। গামছা কাঁধে নেমে আসি নিচে। আশ্রম থেকে একটু দূরে পথের ওপর একটি জলের কল আছে, সেখানেই চলেছি আমরা। ঘরে যাদের ঠাঁই নেই, পথই যে তাদের আশ্রয়। আমরা তাই ঘর ছেড়ে পথে নেমেছি।

স্নান সেরে আশ্রমে এসে দেখি সবাই সারি বেঁধে বসে গেছেন। নরেনপ্রভু বলেন, "আরে কাণ্ড! আপনারা এতক্ষণে স্নান কইরা আইলেন? যায়েন যায়েন, তাড়াতাড়ি কাপড় ছাইড়া আয়েন। আইয়া বইস্যা পড়েন।"

তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে নতুন কেনা থালা, বাটি ও গ্লাশ নিয়ে নেমে আসি নিচে। মহারাজদের পরিবেশন করা শুরু হয়ে গেছে। মহারাজ ও ব্রহ্মচারীরা খেতে বসেন উঁচুতে—যাত্রীনিবাসের খোলা বারান্দায়। আর আমরা বসি নিচুতে—মন্দির ও যাত্রীনিবাসের মাঝখানের বাঁধানো আঙ্গিনায়। প্রথম পরিবেশন করা হয় ওপরওয়ালাদের, কিছু স্পেশাল আইটেম থাকে কিনা! তারপরে নিচে পরিবেশন শুরু হয়।

একটু ফাঁকা জায়গা দেখে এগিয়ে চলি সেদিকে। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, বসতে পারি না। পরিবেশনরত জনৈক সেবক বলে ওঠেন, "আরে মশাই, এটা কি পরেছেন আপনি?"

"কেন বলুন তো? লুঙ্গি!"

"আপনি তো মশাই বেশ মানুষ! লুঙ্গি পরে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন? এটা আশ্রম, এখানে লুঙ্গি পরতে নেই। যান,

ঘরে গিয়ে ধুতি পরে আসুন। থালা-বাটি রেখে যান, প্রসাদ দিয়ে দেব।”

আশ্রমিক অভিধানে লুঙ্গিটা যে নিষিদ্ধ পরিধেয় একথা জানা ছিল না আমার। বাড়িতে আমি চিরকালই লুঙ্গি পরি। কিন্তু পাছে সেই নীল লুঙ্গি এঁদের পছন্দ না হয়, তাই আসার আগে গেরুয়া রঙের একটি লুঙ্গি কিনে নিয়ে এসেছি। কিন্তু তাতেও নিস্তার পাওয়া গেল না দেখছি। অথচ আপত্তির কারণটাও বুঝে উঠতে পারছি না। মহারাজদের দিকে তাকাই। তাঁরা তো সবাই আমারই মতন গেরুয়া লুঙ্গি পরে দিব্যি প্রসাদ গ্রহণ করছেন। তাহলে কি তাঁরা পারেন, আমরা পারি না?

কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করি না সেকথা। সেবকটির আদেশ মতো লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি পরে নিঃশব্দে এসে সেনবাবু ও বোসবাবুর মাঝে খেতে বসি।

খেতে খেতে সেনবাবু বলেন, “একে তো আতপ চালের ভাত, তার ওপর আধ-সেদ্ধ। এ খেলে যে আমাশয় হবে!”

হেসে বলি, “হবে না, পেট-ভরে খেয়ে নিন। আমার কাছে ওষুধ আছে।”

“আর খাবই বা কি দিয়ে? এই ঘোড়া-মটর ডাল, লাবড়া আর স্বাদহীন গিমা-কুমড়ার ঝোল দিয়ে কি খাওয়া যায়?”

তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, “চুপ করুন, কেউ শুনে ফেললে মহাবিপদ হবে। কষ্ট করে খেয়ে নিন, জানেন তো দামোদর ব্রতের মাস। একটু সংযম শিক্ষা করুন।”

“আরে মশাই, রেখে দিন আপনার সংযম।” সেনবাবু মোটেই সংযত হন না। “এই সব খাবার একমাস খেলে যে এই বুড়ো বয়সে রিকেট্স হয়ে যাবে মশাই!”

আবার হেসে বলি, “হবে না, আমার কাছে, মাল্টি-ভিটামিন ট্যাব্লেট আছে।”

সেনবাবু আর কিছু বলেন না। তবে বুঝতে পারি তিনি একটু ভোজন-বিলাসী মানুষ—তাঁর সত্যিই খেতে কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু তাঁর কষ্টের কথা আর ভাবার অবকাশ পাই না। হঠাৎ কানে আসে, "জয় গুরু, জয় রাধে···"

কে? আমাদের পেছন দিক থেকে কেউ গুরুগম্ভীর গর্জনে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। আর শব্দটা এদিকেই আসছে। তাড়াতাড়ি পেছনে তাকাই।

না, দেখতে পাচ্ছি না—মন্দিরের আড়াল পড়েছে। তবে যাঁরা বারান্দার কোণে খেতে বসেছেন তাঁরা দেখতে পেয়েছেন তাঁকে। তাই তাঁরাও খাওয়া থামিয়ে সাড়া দিলেন, "জয় রাধে, জয় বৈষ্ণব···"

তিনি কে—যাঁর আগমনে মহারাজদের প্রসাদ গ্রহণের বিরতি ঘটল?

একটু বাদেই দেখতে পাই তাঁকে। ধুতি ও গলাবন্ধ-কোট পরিহিত জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর একখানি পা খোঁড়া। একটা কাঠের 'ক্র্যাচ্'-এ ভর দিয়ে সুবিশাল দেহখানিকে বয়ে এনেছেন। তিনি এসে দাঁড়ালেন মহারাজদের সামনে। সহসা তাঁর হাত থেকে ক্র্যাচ্টা খসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সবেগে তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে—সিমেণ্ট বাঁধানো উঠোনে।

আমি আঁতকে উঠি! ভদ্রলোক হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন নাকি? অতবড় শরীরটা নিয়ে যেভাবে পড়ে গেলেন, তাতে তাঁর নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

একটু বাদেই কিন্তু ভুল ভাঙে আমার। না, ভদ্রলোক জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান নি, ইচ্ছা করেই ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছেন। তিনি মহারাজদের দণ্ডবৎ করছেন।

দণ্ডবৎ শেষে উঠোনে উঠে বসলেন ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গী হাতের ঝুড়িটা মাটিতে রেখে, তাঁর হাতে ক্র্যাচ্টা দিয়ে দেয়। সঙ্গীর সাহায্যে তিনি আবার উঠে দাঁড়ান। হিন্দীতে সঙ্গীকে আদেশ করেন, "ফলের ঝুড়িটা গুরুদেবের ঘরে রেখে এসো।"

"খুব বড় ভক্ত বুঝলেন। প্রেমিক ভক্ত।"

তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। আমার ঠিক সামনে খেতে বসেছেন চেকারপ্রভু। তিনি আবার বলেন, "লুধিয়ানার মস্ত বড় ব্যবসায়ী। শরীর ভাল নয়, তবু পরিক্রমা করতে ছুটে এসেছেন।"

বিস্মিত স্বরে সেনবাবু বলেন, "সে কি! এই পা নিয়ে পরিক্রমা করবেন?"

"হ্যাঁ।" চেকারপ্রভু উত্তর দেন, "এঁর থেকেও অশক্ত মানুষ পরিক্রমা করেন। তেমন অনেকের সঙ্গে দেখাও হবে আপনাদের।"

সেনবাবু বোধহয় বেশি বিস্মিত হলেন, কিন্তু বিস্মিত হই না আমি। আমি যে তাঁদের দেখেছি। দেখেছি হিমালয়ের বিভিন্ন দুর্গম তীর্থে।

সেনবাবু হয়তো ভাবছেন, কেন তাঁদের এই কৃচ্ছ্রসাধন? কিসের আশায় তাঁরা এই দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট সয়ে চলেছেন?

না। এ প্রশ্নের উত্তর পাব না আমরা। যে মন এ উত্তর দিতে পারে, সে মন এখনও গড়ে ওঠে নি আমাতে। কোনদিন আমি তেমন মনের অধিকারী হব কিনা জানি না। আমি শুধু জানি —যাত্রাপথ পৃথক হলেও যাত্রীরা অভিন্ন। যে বিশ্বাস নিয়ে খঞ্জ মারাঠী যুবতী যমুনোত্রী যায়, সেই একই বিশ্বাস নিয়ে এই পাঞ্জাবী সওদাগর যমুনা-পুলিনে এসেছেন।

রাস্তার কল থেকে এঁটো বাসন ও হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে ঘরে আসি। আর এসেই বুঝতে পারি, কথাটা চক্রবর্তীর ঠিক মনে আছে। আমাকে দেখেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, "আরে, তোমার ব্যাপারটা কি বল তো? তুমি লুঙ্গি পরে প্রসাদ পেতে গেছ!"

"কেন, তাতে দোষ কি? মহারাজরাও তো গেরুয়া লুঙ্গি পরেন।"

হো হো করে হেসে ওঠে চক্রবর্তী। হাসি থামলে কেষ্টপ্রভুকে বলে, "শুনুন প্রভু! ঘোষ কি বলছে? মহারাজরা নাকি লুঙ্গি পরেন?"

কেষ্টপ্রভু মৃদু হেসে আমাকে বলেন, "মহারাজরা পরেন বহির্বাস, লুঙ্গির মতই গেরুয়া রঙের একফালি কাপড়, কিন্তু সেলাই করে তার মুখ দুটি জুড়ে দেওয়া হয় না।"

"তার মানে—" আমি বলি, "জোড়াটারই যত দোষ?"

"এই তো বুদ্ধি খুলেছে!" চক্রবর্তী আমার বুদ্ধির তারিফ করে।

হেসে বলি, "না খুলে উপায় আছে, তোমার সঙ্গে এক ঘরে বাস করছি যে?"

চক্রবর্তী নিশ্চয়ই খুশি হয়। কিন্তু সে তা প্রকাশ করবার অবকাশ পায় না। একজন বৃদ্ধা ঘরে ঢোকেন। ভদ্রমহিলার কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের সমস্ত উপরাংশ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দেখে মনে হয়, তাঁর চলা-ফেরা করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দর্শনের সময় দেখেছি, তিনি আমাদের সঙ্গে সমানে পথ চলেছেন। কাল বণিকপ্রভু বলেছিলেন বটে, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অসুস্থ। এখন বুঝতে পারছি এই ভদ্রমহিলাই তাঁর স্ত্রী।

একটা কাচের গ্লাশে কি যেন নিয়ে এসেছেন তিনি। গ্লাশটা বণিকপ্রভুর হাতে দিয়ে বলেন, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।"

"কি?" বণিকপ্রভু প্রশ্ন করেন।

"লেবুর সরবৎ।"

"এখানে এসেও খেতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

অতএব বণিকপ্রভু নিঃশব্দে সরবৎটুকু নিঃশেষ করে স্ত্রীর হাতে গ্লাশটা ফিরিয়ে দেন।

ভদ্রমহিলা গ্লাশটা হাতে নিয়ে একটু হেসে আমাদের বলেন,

"আপনাদের ঘরে আছেন, একটু দেখবেন···অসুস্থ ও বুড়ো মানুষ। নজর রাখবেন, দোকানে-টোকানে গিয়ে যেন আবার কিছু না খেয়ে বসেন।"

আমরা মাথা নাড়ি। এ ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি! ভদ্রমহিলা খুশিমনে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। তাঁর কর্তব্যবোধ ও পতিভক্তি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি না। তিনি নিজেও অসুস্থা, কিন্তু খাবার পর স্বামীর জন্য লেবুর সরবৎটি ঠিক নিয়ে এসেছেন। এ জন্য হয়তো মেয়ে-মহলে তাঁকে উপহাসের পাত্রী হতে হয়েছে। তবু সে উপহাস তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে নি।

কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রীর আচরণে বণিকপ্রভু কিন্তু একটু লজ্জাবোধ করছেন। সলজ্জ স্বরে তিনি বললেন, "আমার আবার খাবার পর একটু লেবুর সরবৎ খাবার অভ্যেস কিনা!"

"বেশ ভাল অভ্যেস।" আমি বলি।

"তাই বলে পরিক্রমায় এসেও আপনি লেবুর সরবৎ খাবেন?" চক্রবর্তী হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করে বসে।

বণিকপ্রভু তার কথার কোন জবাব দিতে পারেন না।

জবাব দেন বোসবাবু। চক্রবর্তীকে তিনি পাল্টা-প্রশ্ন করেন, "খেলে কোন দোষ হয় নাকি?"

"আপনাদের মতে হয় না, কিন্তু আমাদের মতে হয়।" চক্রবর্তী সোজাসুজি আঘাত করে বোসবাবুকে।

তিনি কিন্তু সে আঘাত সহ্য করেন। একটু হেসে বলেন, "সেই দোষটার কথাই শুনতে চাইছি!"

"এ হচ্ছে গিয়ে দামোদর ব্রতের মাস। এ সময় ভক্ত-বৈষ্ণবকে সর্বপ্রকার ভোগ বিসর্জন দিয়ে, ত্যাগের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করতে হয়।"

"লেবুর সরবৎটা বুঝি ভোগের মধ্যে পড়ে?" বোসবাবু আবার হাসেন।

চক্রবর্তী ক্ষেপে যায়। বলে, "পড়ে বৈকি!"

"আর অম্ল, ডাল, রসা, অম্বল, দুধ, দই, রাবড়ি, আপেল, নাসপাতি, কমলালেবু······চা, এগুলি বুঝি ত্যাগের মধ্যে ?"

চক্রবর্তী চট করে কোন জবাব দিতে পারে না। আর জবাব দিতেও হয় না তাকে। সে ভক্ত মানুষ, কাজেই কৃষ্ণ কৃপা করেন তাকে। হরিদাসপ্রভু ঘরে ঢোকেন। সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্তী তাঁর দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ে। তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "কি প্রভু! আপনার রাধারাণীর খোঁজ পেলেন ?"

শ্রান্ত হরিদাসপ্রভু কোন কথা না বলে নিজের বিছানায় এসে বসেন। তারপরে একটু দম নিয়ে বলেন, "নারে ভাই! অনেক মূর্তি দেখলাম, কিন্তু আমার কৃষ্ণের মতো রাধারাণীর মূর্তি একটিও পেলাম না!" আবার দম নেন তিনি। রোদে ঘুরে এসেছেন ভদ্রলোক, খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে। একটু বাদে তিনি আবার বলেন, "তবে একজন দোকানদার বলেছেন, ছবি এঁকে দিলে তিনি ঠিক সেই রকম মূর্তি তৈরি করে দিতে পারবেন।"

"এ আর আপনার পক্ষে কষ্টের কি ?" চক্রবর্তী মন্তব্য করে।

"না, কষ্টের কিছু নয়, তবে রঙ-তুলি, কাগজ-পত্তর কিছুই তো সঙ্গে আনি নি······"

"আরে মশাই, পেনসিল দিয়ে এঁকে দিন।" চেকারপ্রভু পরামর্শ দেন।

"তাই কবব ভাবছি।" হরিদাসপ্রভু বলেন।

"তার আগে নিচে যাও তো", মাঝখান থেকে কেষ্টপ্রভু বলে ওঠেন, "আর দেরি করলে প্রসাদ পাবে না।"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি।" হরিদাসপ্রভু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। শিয়রের দিক থেকে থালা-বাটি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

"এখানে ও মনের মতো মূর্তি পাবে না।" কেষ্টপ্রভু বলেন। বয়সে হরিদাসপ্রভুর পুত্রসম হলেও তিনি ব্রহ্মচারী, কাজেই তাঁকে তাঁর 'তুমি' বলে ডাকার অধিকার আছে।

"কেন পাবে না প্রভু?" চক্রবর্তী প্রশ্ন করে।

"এখানকার কারিগররা ঠিক বানাতে পারবে না। মনের মতো মূর্তি পেতে হলে ওকে যেতে হবে জয়পুরে।"

"সেখানকার কারিগররা বুঝি খুব ভাল মূর্তি গড়তে পারে?"

"নিশ্চয়ই।" কেষ্টপ্রভু উত্তর দেন।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব প্রভু?" বোসবাবু হঠাৎ কেষ্টপ্রভুকে বলেন।

"কর!" কেষ্টপ্রভু অনুমতি দেন।

বোসবাবু বলেন, "আচ্ছা, আমাদের এই বন-পরিক্রমাটা কিভাবে হবে?"

"মানে?" চক্রবর্তী মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে।

কিন্তু বোসবাবু সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই কেষ্টপ্রভু বলেন, "আমি বুঝতে পেরেছি তোমার প্রশ্ন।" একবার থামেন তিনি, তারপব বলতে শুরু করেন, "পাঁচদিন ধরে বৃন্দাবন দর্শন করব আমরা। তারপবে মথুবা যাব। পরদিন সকালে......"

"আপনি প্রথমদিন, দ্বিতীয়দিন করে বলুন, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে।" বোসবাবু বাধা দেন।

"বেশ, বলছি।" কেষ্টপ্রভু সম্মত হন তাঁর প্রস্তাবে। বলতে থাকেন, "প্রথমদিন সকালে বৃন্দাবন থেকে রওনা হয়ে বেলা ন'টা নাগাদ মথুরায় পৌঁছব আমরা। সেখানেই সেদিন দুপুরের প্রসাদ পাব। প্রসাদের পরে পরিক্রমা সহকাবে মথুরা দর্শন শুরু হবে। মথুরাতেই রাত্রিবাস করব।"

"আমাদের মালপত্র কি গোরুর গাড়িতে যাবে?" চক্রবর্তী প্রশ্ন করে।

"না, এখন সব বনেই মোটর-পথ হয়ে গেছে। তাই মালপত্র এবং অশক্ত ও অসুস্থদের জন্য আমরা একটা 'বাস' নিচ্ছি। কাজেই মালপত্রের জন্য চিন্তা করো না, মালপত্র তোমার আগে পৌঁছে যাবে গন্তব্যস্থানে।"

কেষ্টপ্রভু চক্রবর্তীকে আশ্বস্ত করেন। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "দ্বিতীয়দিন সকালে আমরা দর্শন করব ভূতেশ্বর মহাদেবের শ্বেতমূর্তি। ভূতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে বনযাত্রা আরম্ভ ও শেষ করতে হয়।

"যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। দর্শন শেষে আমরা মধুবন যাত্রা করব। মথুরা থেকে মধুবন হাঁটা-পথে সাড়ে তিন মাইল। কৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করে দর্শন করব মধুবনবিহারী শ্রীহরি ও শ্রীবলরাম জীউকে। কিন্তু মধুবনে সেদিন পথ ফুরাবে না আমাদের। সেখানে একটু বিশ্রাম করে প্রসাদ পাব। তারপরে যাব ধ্রুবটীলা ও তালবন। আরও দশ মাইল হাঁটতে হবে সেদিন। দর্শন করব ধেনুকাসুর-বধ স্থান, কুমুদবন ও শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি স্থান। সন্ধ্যায় ফিরে আসব মধুবনে। সেখানেই রাত কাটাব আমরা।

"তৃতীয়দিন সকালে মধুবন থেকে বহুলাবন রওনা হব—দূরত্ব প্রায় আট মাইলের মতো। পথে শান্তনু-কুণ্ড দর্শন করব। সেদিন আমাদের আট মাইল হাঁটতে হবে। আমরা বহুলাবনেই রাত্রিবাস করব।

"চতুর্থদিন খুব সকালে বহুলাবন থেকে রাধাকুণ্ড যাত্রা করব। পথে কদমখণ্ডী দর্শন করে আট মাইল রাস্তা যেতে ঘণ্টাচারেক সময় লাগবে। স্নান ও প্রসাদের পরে পরিক্রমা ও দর্শন শুরু হবে। সন্ধ্যের আগেই শেষ হবে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা। সেদিন রাতে আমরা রাধাকুণ্ডেই থাকব।

"পঞ্চমদিন ভোরে রাধাকুণ্ড থেকে রওনা হব গোবর্ধন। পথে কুসুম সরোবর দর্শন করব। মন্দির দর্শন ও স্নান সেরে প্রসাদ. শুরু হবে তারপরে পৈঠা দর্শন। অবশেষে গিরিরাজ গোবর্ধন পরিক্রমা। দর্শনসহ চৌদ্দ মাইল পরিক্রমা পূর্ণ করতে ঘণ্টা আটেক লাগবে। পরিক্রমা শেষে গোবর্ধনে ফিরে এসে রাত্রিবাস করব আমরা।

"পরদিন আর ভোরে রওনা হবার দরকার পড়বে না। কাজেই সেদিন একটু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিতে পারবে। সকাল

সকাল প্রসাদ পাবে সেদিন। প্রসাদের পরে বেলা এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব ডিগ বা লাঠাবনের উদ্দেশ্যে—দূরত্ব এগারো মাইল। হয়তো সেদিন গাঁঠুলি, শ্রীগোপালস্থান ও গুলালকুণ্ড দর্শন করব। গুলালকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণী ও সখীদের সঙ্গে দোল খেলেছিলেন।

"সপ্তমদিন কিন্তু আবার ভোরে রওনা হতে হবে। সেদিন আমরা যাব কাম্যবন, অনেকটা দূর—লাঠাবন থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল। দুপুরে বিমলাকুণ্ডের তীরে পৌঁছব আমরা। তারপরে আবার পদযাত্রা। কাম্যবনের ধর্মশালায় প্রসাদের ব্যবস্থা হবে। বিকেলে যতটা সম্ভব দর্শন করে নেব।

"কাম্যবন ও তার চারদিকে অসংখ্য দর্শন আছে। তাই সেখানেও দু'রাত থাকতে হবে। পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দর্শন চলবে। প্রায় পনেরো মাইল হাঁটতে হবে সেদিন।

"নবমদিনে খুব সকালে আমরা বেরিয়ে পড়ব বর্ষাণার পথে—দূরত্ব সাড়ে আট মাইল। বর্ষাণার ঝুলনমঞ্চটি দেখবার মতো। প্রিয়াজীর মন্দির তো বটেই। সারাদিন দর্শন করতে পারবে সেখানে। খুব ভাল লাগবে তোমাদের। শ্রীরাধিকার পিত্রালয় বর্ষাণা ভারী সুন্দর জায়গা। সেখানেই রাত্রিবাস করব সেদিন।

"পরদিন সকালে আমরা রওনা হব নন্দগ্রাম—পথে অনেক দর্শন আছে। সেদিন নন্দালয় দেখে নন্দগ্রামেই রাত কাটাব।

"একাদশদিন খুব ভোরে আমরা এগারো মাইল দূরের কোশী রওনা হব। পথে অনেক দর্শন আছে।

"তার পরদিনও আমরা কোশীতেই থাকব। শেষ-শায়ী গিয়ে ক্ষীরসাগর পরিক্রমা করব। এই পরিক্রমা করতে বারো মাইল হাঁটতে হয়।

"পরের দিন যাত্রা করব খেলনবন বা শেরগড়। পথের দর্শন সেরে ন' মাইল পথ যেতে ঘণ্টাচারেক সময় লাগবে। তার মানে

দশটার মধ্যে পৌঁছে যাব সেখানে। স্নান ও প্রসাদের পরে বেলা চারটেয় শুরু হবে দর্শন। কাম্যবনের মতো খেলনবনেও গোপীনাথ ও মদনমোহনের মন্দির আছে। সেদিন সেখানেই রাত্রিবাস করব।

"চতুর্দশদিন ভোরে রওনা হব নন্দঘাটের পথে—দূরত্ব আট মাইল। পথে দর্শন আছে। নন্দঘাটেই সে রাত কাটাব আমরা।

"পরদিন আর সকালে রওনা হবার দরকার পড়বে না। প্রসাদের পরে বেলা দশটা নাগাদ যাত্রা করলেই চলবে। সেদিন নৌকায় যমুনা পার হয়ে আমরা পৌঁছব মাটবন। মাটবনেই রাত্রিবাস করব সেদিন।"

"যমুনায় তো জল নেই, নৌকার দরকার হবে কি?" মাঝখান থেকে বণিকপ্রভু প্রশ্ন করে বসেন।

"জল নেই কথাটা ঠিক নয়।" কেষ্টপ্রভু উত্তর দেন, "খানিকটা জায়গায় জল আছে বৈকি! তবে জল হয়তো বেশি থাকবে না। যাঁরা পারবে, হেঁটে পার হবে।" একবার থামেন তিনি। তারপরে একটু হেসে বলেন, "তবে তুমি পারবে না, তোমাকে অন্যান্য বুড়ো-বুড়ীদের সঙ্গে নৌকায় উঠতে হবে।"

"আচ্ছা, বাস যমুনা পেরোবে কেমন করে? ওখানে তো কোন পুল নেই?" আমি জিজ্ঞেস করি।

কেষ্টপ্রভু বলেন, "বাস যাবে অনেকটা ঘুরে। তাহলেও বাস আমাদের আগেই পৌঁছে যাবে মাটবন। যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম।" একবার থামেন কেষ্টপ্রভু। তারপরে বলেন, "পরদিন আবার খুব ভোরে রওনা হতে হবে। পথে বিল্ববন দর্শন করে আমরা দুপুরের পরে পৌঁছব মান-সরোবর। ভারী সুন্দর জায়গা। রাধারাণী কৃষ্ণের ওপরে মান করে সেখানে গিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর চোখের জলে সৃষ্ট হয়েছে মান-সরোবর। কৃষ্ণ সেখানে গিয়ে তাঁর মানভঞ্জন করেছিলেন। সেই পুণ্য সরোবরের তীরেই রাত্রিবাস করব আমরা।

"সপ্তদশদিন সকালে যাত্রা করব লৌহবন। সেদিন সবশুদ্ধ আট মাইলের মতো হাঁটতে হবে।

"পরদিন, অর্থাৎ আঠারো দিনের দিন সাড়ে সাত মাইল হেঁটে আমরা পৌঁছব গোকুল-মহাবন। পথে রাধারাণীর জন্মস্থান রাবেল দর্শন করব। ব্রহ্মাণ্ডঘাটে, অর্থাৎ, যেখানে কৃষ্ণ মা যশোদাকে ব্রহ্মাণ্ড দশন করিয়েছিলেন, সেখানে রাত্রিবাস করব। দেখবে কেমন চমৎকার জায়গা! পরদিনও সেখানেই থাকবে। সারাদিন ধরে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন শৈশব-লীলাস্থান দর্শন করবে।

"তারপরের দিনই আমাদের পূর্ণ হবে চুরাশী ক্রোশ বিস্তৃত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা। বিশদিন বাদে আমরা আবার ফিরে আসব মথুরা, দর্শন করব ভূতেশ্বর মহাদেবকে।" থামলেন কেষ্টপ্রভু।

চক্রবর্তী প্রশ্ন করে, "মাত্র বিশদিন! আমি যে শুনেছি দেড়মাস সময় লাগে?"

"ভুল শুনেছ।" কেষ্টপ্রভু বলেন, "তবে ভাদ্রমাসে ব্রজবাসীদের পরিচালনায় যে বনযাত্রা হয়, তাতে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁরা সাধারণত ঝুলনের সময় এখানে আসেন। বৃন্দাবনে ঝুলন এবং মথুরায় জন্মাষ্টমী উৎসব দেখেন। ভাদ্র কৃষ্ণা-দ্বাদশীতে, অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর চারদিন পরে মথুরা থেকে সেই বনযাত্রা আরম্ভ হয়। পরিক্রমা পূর্ণ করতে তাঁদের মাসখানেকের মতো সময় লাগে, কারণ তাঁরা কাম্যবন, গোবর্ধন, কোশী ও ব্রহ্মাণ্ডঘাটে তিন দিন করে এবং রাধাকুণ্ড, বর্ষাণা ও নন্দগ্রামে দু'দিন করে থাকেন।"

॥ ছয় ॥

"সমাগত সুধীবৃন্দ ও মাতাগণ, সকালে আমি আপনাদের বলেছি কিভাবে কংস একে একে দেবকীর ছ'টি পুত্রসন্তানকে হত্যা করলেন।"

আমরা মাথা নাড়ি।

কীর্তনের পরে বৈকালিক পাঠের আসর বসেছে। মথুরা মহারাজ ভাগবত পাঠ শুরু করেছেন।

এ বেলা নাট-মন্দির ভরে গেছে। আজ আসাম পাঞ্জাব ও দক্ষিণ-ভারত থেকে প্রায় চল্লিশজন যাত্রী এসেছেন। আরও নাকি আসছেন।

মথুরা মহারাজ বলে চলেছেন, "ছ'টি পুত্র নিহত হবার পরে বাসুদেবের কলাভূত স্বয়ং বলরাম দেবকীর সপ্তম গর্ভে আবির্ভূত হলেন। বলরাম আসছেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচররূপে। কাজেই তাঁকে হারালে কৃষ্ণলীলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই শ্রীহরি যোগমায়াকে আদেশ করলেন 'তুমি ব্রজধামে যাও। সেখানে নন্দালয়ে বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণী রয়েছেন। শেষ নামক আমার যে অংশ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত, তুমি তাকে আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর। তারপরে আমি দেবকীর পুত্র হয়ে পরিপূর্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হব। তুমিও নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে'।"

একবার থামলেন মহারাজ। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি আবার বলতে থাকেন, "অনেকে তাই ভুল করে ভাবেন, শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম গর্ভের সন্তান নন, তিনি দেবকীর সপ্তম পুত্র। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। বলরামই দেবকীর সপ্তম সন্তান। যোগমায়া তাঁকে আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেছিলেন, তাই বলরামের অপর নাম সঙ্কর্ষণ।

"আর একটি কথা," মথুরা মহারাজ বলেন, "কংসের বাবা উগ্রসেন এবং দেবকীর বাবা দেবক সহোদর ভাই। দেবকের সাত কন্যা। তাঁদের মধ্যে দেবকী ছিলেন সবচেয়ে ছোট। বসুদেব তাঁদের সাত-বোনকেই বিবাহ করেছিলেন। কাজেই রোহিণী ছিলেন দেবকীর দিদি। কংসের ভয়ে বসুদেবের অন্যান্য স্ত্রীরা, অর্থাৎ দেবকীর দিদিরা বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে ছিলেন। বসুদেবের বন্ধু গোকুলনিবাসী গোপরাজ নন্দের বাড়িতে বাস করছিলেন রোহিণী।" থামলেন মথুরা মহারাজ। আমরা তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি আবার শুরু করলেন, "এইখানেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় শেষ। এর পরের অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, সনকাদি মুনিগণ, নারদাদি ভক্তগণ এবং মহেশ্বর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কংসের কারাগারে উপস্থিত হয়ে ভগবানের স্তব করছেন। তাঁরা দেবকীকেও নানা সান্ত্বনা দিয়ে তুষ্ট করছেন।

"কিন্তু আমরা আজ আর সে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করব। এই অধ্যায়ে ভাগবতকার কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে, ভাদ্রমাসের 'বিজয়' বেলায়, রোহিণী নক্ষত্র, বুধবার, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন। দেবগণ পরমানন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকলেন।

"এর পরে চতুর্থ অধ্যায়। বসুদেব কেমন করে কৃষ্ণকে গোকুলে নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে মহামায়াকে নিয়ে মথুরায় ফিরলেন, এই অধ্যায়ে ভাগবতকার তারই বর্ণনা করেছেন।

"শ্রীভগবানের নির্দেশে বসুদেব সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে বুকে তুলে নিলেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন যে, যোগমায়ার প্রভাবে তাঁর শেকল খসে পড়ল, কারাগারের লৌহকপাট খুলে গেল। প্রহরীরা নিদ্রিত এবং মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে। অবিরল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে।

"বসুদেব শিশু বাসুদেবকে নিয়ে নিদ্রিত কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন। বৃষ্টিতে তাঁর পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে অনন্তদেব নিজের সহস্র ফণা বিস্তার করে, বসুদেবের সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে থাকলেন।

"বসুদেব যমুনার তীরে এলেন। একে তো বর্ষার ঢল নেমেছে, তার ওপর যমুনা আবার কৃষ্ণস্পর্শলোভাতুরা। আনন্দে উদ্বেলিতা যমুনাকে দেখে বসুদেবের ভয় হল। কিন্তু সেই ভয়ানক আবর্তসঙ্কুলা কালিন্দী বসুদেবকে পথ ছেড়ে দিলেন। বসুদেব নির্বিঘ্নে যমুনা পার হয়ে গোকুলে পৌঁছলেন—পৌঁছলেন নন্দালয়ে।

"সেখানেও সেই একই দৃশ্য—যোগমায়ার প্রভাবে সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। নিশ্চিন্ত বসুদেব ঘুমন্ত যশোদার শয্যাপাশে শিশুকৃষ্ণকে রেখে, তাঁর সদ্যোজাতা কন্যাকে নিয়ে কংস-কারাগারে ফিরে এলেন। যশোদা প্রসবের পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এই সন্তান-বদলের কথা তিনি জানতেও পারলেন না, যেমন কংস-কারাগারের কেউ জানতে পারল না এ কথা। কারণ, বসুদেব ফিরে আসার পরে আপনা থেকেই কারাগারের লৌহকপাট বন্ধ হয়ে গেল।

"কিছুক্ষণ বাদে শিশু যোগমায়া হঠাৎ ভীষণ জোরে কেঁদে উঠলেন। আর তাতেই প্রহরীদের ঘুম গেল ভেঙে। তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে কংসকে খবর দিল। কংস ছুটে এলেন কারাগারে। দেবকী বললেন, 'দাদা, এ তো ছেলে নয়, মেয়ে। এই শিশুকন্যার কাছ থেকে তো তোমার কোন ভয় নেই। তুমি একে মেরো না।'

"কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত কংস দেবকীর সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। তিনি দেবকীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিলেন শিশু কন্যাটিকে। তার কোমল ও পিচ্ছিল পা দুটি ধরে পাথরের ওপর ছুঁড়ে মারলেন।

"মুহূর্তে শিশুকন্যা যোগমায়ার রূপ ধারণ করে বলে উঠলেন—

'কিং ময়া হতয়া মন্দ, জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ,
যত্র ক্বচিৎ পূর্ব্বশত্রুর্মাহিংসীঃ কৃপাণান্ বৃথা॥'

—রে মূঢ় কংস, আমাকে বধ করতে পারলেই বা তোর কি লাভ হত? তোকে যে বিনাশ করবে, তোর সেই পূর্বজন্মের শত্রু জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব অসহায় বসুদেব ও দেবকীর প্রতি আর তোর অত্যাচার করা বৃথা।

"অনুতাপানলে দগ্ধ কংস তখন দেবকী ও বসুদেবকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বলা বাহুল্য, দেবকী ও বসুদেব তাঁর সেই প্রার্থনা অপূর্ণ রাখলেন না। তাঁরা যে প্রেমময় ভগবানের জনক-জননী।"

আজকের মতো ভাগবত পাঠ শেষ হল। কারণ দিনের আলো নিভে আসছে। এবারে সন্ধ্যারতি শুরু হবে। বেজে উঠল শাঁখ, খোল-করতাল ও কাঁসর-ঘণ্টা। আরতি আরম্ভ হল। আমরা কীর্তন শুরু করি—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত সন্ধ্যারতির কীর্তন—

'জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্ন-সিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে॥'

আরতির পরে মন্দির প্রদক্ষিণ, জয়ধ্বনি ও প্রণামের পালা শেষ হল।

না, বিশ্রাম নয়। বিশ্রাম বস্তুটির সঙ্গে সম্পর্ক নেই আশ্রমিক অনুষ্ঠানসূচীর। তাই প্রণামের পর আবার সবাই বসে পড়লাম নাট-মন্দিরে। কিছুক্ষণ কীর্তনের পরে পাঠের আসর বসবে—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

"কিন্তু আমার যে একবার বাজারে যাওয়া দরকার!" কানে কানে চক্রবর্তীকে বলি।

"আমারও!" সে উত্তর দেয়, "কিছু কেনাকাটা আছে।"

কিন্তু যাই কেমন করে? গুরুমহারাজ যেভাবে এদিকে

তাকিয়ে রয়েছেন, তাতে তো উঠতে গেলেই ধরা পড়ে যাব। এ যে কলেজ পালানোর চেয়েও কঠিন কাজ। কলেজে একজন প্রফেসার থাকেন, আর এখানে জন-ছয়েক মহারাজ রয়েছেন। না, অনুমতি না নিয়ে আসর ছেড়ে চলে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই চক্রবর্তীকে বলি, "আচ্ছা, বাজারে যেতে চাইলে কি গুরুমহারাজ নিষেধ করবেন?"

"ওরে বাবা!" আঁতকে ওঠে চক্রবর্তী। "ঘাড়ে ক'টা মাথা যে, তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে যাব? এরপরে পাঠ আছে না?"

"তা থাক্‌গে", আমার পাশ থেকে সেনবাবু বলে ওঠেন "আমরা তো ব্রতধারী নই, যে প্রত্যেকটি পাঠ-কীর্তনে উপস্থিত থাকতে হবে। কীর্তন শেষ হোক্, আমি মহারাজকে বলব'খন। বোসবাবুও যাবেন নাকি?"

"যেতে পারলে তো ভালই হয়। একটু দরকার ছিল।" বোসবাবু বলেন।

সকলেরই এক অবস্থা। পাঠ-কীর্তনের প্রতি আকর্ষণ না থাকলেও, আমাদের কোন বিকর্ষণ নেই। কর্মহীন জীবনে, এই পরিবেশে ভাল লাগবারই কথা। কিন্তু অতিরিক্ত কোন বস্তুই ভাল নয়। তাছাড়া আমরা ভক্ত নই. সাধারণ মানুষ। বহির্মুখী মনকে বশ করতে একটু সময় নেবে বৈকি!

সেনবাবু কিন্তু সত্যি সত্যি গুরুমহারাজের অনুমতি নিয়ে এলেন। আর সেই সুবাদে চক্রবর্তীও সঙ্গী হল আমাদের। তবে কি তারও ভাল লাগছে না? কিন্তু সে তো ভক্ত!

আরও একজন বাজারে চলেছেন আমাদের সঙ্গে। সেনবাবুর স্ত্রী। পরিচয়ের পর থেকেই আমরা তাঁকে বৌদি বলে ডাকছি। মাঝারি গড়নের সাধারণ বাঙালী বধূ। ছেলে-মেয়ের ওপর সংসার রেখে তীর্থে এসেছেন। তীর্থ-ধর্মের প্রতি একটা আন্তরিক আকর্ষণ আছে। গত বছর গঙ্গাসাগর গিয়েছিলেন, তার আগের বছর নবদ্বীপ-পরিক্রমায়। প্রতি বছর দোলের সময় বিভিন্ন চৈতন্য

মঠের তরফ থেকে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়। হাজার হাজার পুণ্যার্থী সেই সপ্তাহব্যাপী পরিক্রমায় অংশ নেন।

গল্প করতে করতে বাজারে চলেছি আমরা—আমরা পাঁচজন। সেনবাবু ও চক্রবর্তী চলেছে সামনে আর আমি, বোসবাবু ও বৌদি পেছনে। কথায় কথায় বৌদি মেয়ে-মহলের খবর বলতে শুরু করেছেন। বলছেন, "আর বলবেন না, আমাদের ওখানে জল নিয়ে ঝগড়া ছাড়াও আর একটা মজার ব্যাপার আছে।"

"কি?" কৌতূহলী হয়ে উঠি।

বৌদি বলেন, "এক বুড়ি এসেছে নবদ্বীপ থেকে। সে নাকি কোন না কোন দলের সঙ্গে প্রতিবার নবদ্বীপ-পরিক্রমায় যায়। এবারে এই আশ্রমের তরফ থেকে বন-পরিক্রমা হচ্ছে শুনে একেবারে হাওড়ায় এসে হাজির। মহারাজরা বললেন, 'আপনার তো টিকিট কাটা হয় নি।' বুড়ি উত্তর দিল, 'আমার টিকিট লাগে না, রেলের বাবুরা আমাকে চেনে।'

"যাই হোক্, আমাদের কামরায় আর একজন ভদ্রমহিলার জায়গায় ঘুমিয়ে সে বৃন্দাবন এসেছে।"

"যাঁর জায়গা, তিনি কি করেছেন?" প্রশ্ন করি।

"তিনি সারারাত তাঁর পায়ের কাছে বসে ঝিমিয়েছেন, কিন্তু বুড়িকে ঘাঁটাতে সাহস পান নি। এখন বুড়ি বলছে, বনযাত্রায় যাবে। বৃন্দাবন মহারাজ বলেছিলেন, টাকা-পয়সা না দিলে আপনাকে যাত্রায় নেওয়া হবে না।' বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, 'আমি টাকা দেব কেন? আপনাদের তো আমার জন্য কোন আলাদা খরচ লাগবে না। এই যে আমি আপনাদের রিজার্ভ বাসে মথুরা থেকে বৃন্দাবন এলাম, এজন্য কি আপনার বেশি ভাড়া দিতে হয়েছে? এই যে কাল বিকেলে আপনাদের সঙ্গে প্রসাদ পেলাম, তার জন্য কি আপনাদের বেশি রান্না করতে হয়েছে? কাজেই আমার জন্য যখন আপনারা কোন খরচ করছেন না, তখন আমি কেন খরচ দেব'?"

"অকাট্য যুক্তি!" আমি বলি, "তাহলে বুড়ি আমাদের সঙ্গে বিনা খরচে যাত্রায় যাচ্ছেন?"

"তা আর বলতে!" বৌদি উত্তর দেন।

আমরা বাজারে পৌঁছে গেছি। সরু গলির দু'পাশে মুদি, মনোহারী, পোশাক ও শয্যাদ্রব্যের দোকান। আমরা প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা করি। বৌদি বলেন, "আসুন, কিছু খাবার কিনে নেয়া যাক্। সকালে ও বিকেলে এঁরা কোন জলখাবার দেন না। ঐ চায়ের দোকানে দু'বেলা কচুরি খেলে অসুখ করবে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। বৃন্দাবনের মিষ্টি খুবই ভাল। কিছু মিষ্টি নিয়ে গেলে কাল সকালে খাওয়া যাবে।

মিষ্টির দোকানের সামনে আসতেই নজর পড়ে ভদ্রলোকের দিকে—আমাদের বণিকপ্রভু। না, তিনি আমাদের দেখতে পান নি। দেখবেন কেমন করে, তিনি একমনে রাবড়ি খাচ্ছেন যে। বৃন্দাবনের রাবড়ি ভারত-বিখ্যাত। তাহলেও বণিকপ্রভুর আচরণ বিস্ময়কর। একে তো ব্রতধারী শিষ্য, পাঠ-কীর্তন না শুনে এ সময়ে এখানে এসে রাবড়ির সদ্ব্যবহার করছেন, উপরন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে এ কাজটি করতে নিষেধ করেছেন। তাহলে কি তিনি জানতেন, বণিকপ্রভু তাঁর কথা শুনবেন না? আর তাই তিনি আমাদের নজর রাখতে বলে গেছেন? তবু এখন তাঁকে কিছু বলা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। আমরা মিষ্টি কিনে নিঃশব্দে সরে পড়ি দোকান থেকে। বণিকপ্রভু দেখতে পেলে লজ্জা পাবেন।

"এখন কি করবেন?" বৌদি জিজ্ঞেস করেন।

"কি আর করব, আশ্রমে ফিরব।" আমি উত্তর দিই।

বোসবাবু এবং চক্রবর্তীও মাথা নাড়ে। সেনবাবু চুপচাপ। সঙ্গে স্ত্রী রয়েছেন, তাঁর কোন সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার নেই।

বৌদি বলেন, "মোটে আটটা বাজে, সাড়ে ন'টায় প্রসাদ। আমি বলছিলাম কি, একবার বঙ্কুবিহারীকে দর্শন করে গেলে হত না? শুনেছি বৃন্দাবন এলেই তাঁকে দর্শন করতে হয়।"

"ভুল শুনেছেন।" আমরা কেউ কিছু বলার আগেই চক্রবর্তী বলে ওঠে।

বৌদি বিস্মিত, আমরা নির্বাক।

চক্রবর্তী বলে, "আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব, বৃন্দাবনে এসে আমাদের প্রথমে ষড়্‌গোস্বামীর মন্দির দর্শন করতে হয়। তারপরে সময় পেলে অন্য দর্শন, নইলে নয়।" একবার থামে চক্রবর্তী তারপরে দু'হাত ওপরে তুলে সুর করে বলতে শুরু করে—

"জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥"

পথচারীরা তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। হয়তো তারা কিছু মনে করছে না। কারণ, এটা কলকাতার রাজপথ নয়, বৃন্দাবনের বাজার। তবু চক্রবর্তীকে বলি, "রাত-দুপুরে কি শুরু করলে?"

ধমকে কাজ হয়। চক্রবর্তী কীর্তন থামায়। তাই বলে সে চুপ করে থাকে না। সে বৌদিকে আবার জ্ঞান দিতে শুরু করে, "বৃন্দাবনে এসে যে ষড়্‌গোস্বামীর মন্দির দর্শন করে, তার আর অন্য মন্দির দর্শন না করলেও দোষ নেই।"

চুপ করে থাকি। কি বলব? শত-সহস্র ধরনের সাম্প্রদায়িকতা যে এই হতভাগ্য দেশে নিত্যকালের সত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করেছিলেন বলেই আজ তিনি জগদ্বরেণ্য মহাপ্রভু। আর আশ্চর্য, তাঁরই প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য চক্রবর্তী আজ বৌদিকে বঙ্কুবিহারী মন্দির দর্শন করতে দিতে চাইছে না।

বৌদিও চুপ করে আছেন। তিনি নীরবে পথ চলেছেন। কিন্তু বুঝতে পারছি, চক্রবর্তীর জ্ঞানটুকু তিনি হজম করতে পারেন নি। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি সত্যিই বিহারীজীকে দর্শন করতে চান বৌদি?"

"থাক্।" বৌদি ম্লানস্বরে বলেন, "ওঁর যখন আপত্তি..." তিনি চক্রবর্তীকে দেখিয়ে দেন।

"ওর আপত্তিতে তো আমাদের কিছু এসে যাচ্ছে না! চক্রবর্তী হচ্ছে গিয়ে ভক্ত মানুষ। আমরা তো তা নই। চলুন, আমরা দর্শন করে আসি।"

"উনি কি একা একা ফিরে যাবেন?"

"তা যেতে পারে।"

চক্রবর্তী বোধহয় বুঝতে পেরেছে তার মত আমরা মেনে নিই নি। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "না না, ফিরে যাব কেন? তোমাদের ইচ্ছা হলে চলো। তোমরা ভেতরে যাবে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।"

হেসে বলি, "খুব ভিড় হয় কিন্তু বঙ্কুবিহারী মন্দিরে। রাস্তায় দাঁড়ালেও ধাক্কা খেতে হবে তোমাকে।"

"তা হোক্‌গে। চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও।" চক্রবর্তী পা চালায়।

আমরা বাজার ছাড়িয়ে বঙ্কুবিহারী মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে বৌদি প্রশ্ন করেন "আচ্ছা, বঙ্কুবিহারী মন্দিরের এত নাম কেন? শুনেছি, অনেকে: বিশেষ করে অবাঙালীরা বৃন্দাবন এসে নাকি কেবল বঙ্কুবিহারীজীকে দর্শন করেই ফিরে যান।"

বঙ্কুবিহারী সম্পর্কে কোন আলোচনা চক্রবর্তীর পছন্দ হবে না। তবু ভদ্রমহিলাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি না। বলি, "হাতে সময় না থাকলে অনেকে তেমন করেন বটে, তবে করাটা উচিত নয়। কারণ, প্রকৃতপক্ষেই ষড়্‌গোস্বামীর মন্দিরসমূহ অনেক বেশি ঐতিহ্যমণ্ডিত।"

"তাই বলো!" চক্রবর্তী আনন্দিত, "আরে তাই তো আমি বলছিলাম, কি হবে বঙ্কুবিহারীকে দর্শন করে?"

বৌদি কিন্তু তার কথাকে তেমন আমল না দিয়ে আবার বলেন, "আচ্ছা, কে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন?"

"স্বামী হরিদাসের শিষ্যগণ।"

আমার উত্তর শুনেও বৌদি চুপ করে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই আরও কিছু শুনবার আশায় রয়েছেন। তাই আবার বলি, "মহামতি আকবরের রাজত্বকালে বৃন্দাবনে স্বামী হরিদাস নামে এক সাধু বাস করতেন। তাঁর বাবার নাম ছিল আশাধীর, আদি-নিবাস ছিল কোলগ্রামের কাছে হরিদাসপুরে।

"এই সর্বত্যাগী সাধক নিধুবনে বাস করতেন। শোনা যায়, তাঁরই শিষ্যগণ সম্রাট আকবরকে নিধুবনে নিয়ে আসেন, আর তাঁদের মধ্যে সঙ্গীত-সম্রাট তানসেন অন্যতম। তিনি হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। এবং তাঁর কৃপাতেই নাকি তানসেন অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ হতে পেরেছিলেন।

"যাই হোক্, সম্রাট আকবর হরিদাস স্বামীর অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে দেব-সেবার জন্য তাঁকে কিছু সম্পত্তি দান করেছিলেন।

"কুঞ্জবিহারী হলেন হরিদাস স্বামীর উপাস্য দেবতা। তাই নিধুবনে কুঞ্জবিহারীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। সম্ভবত সেটি এ যুগে বৃন্দাবনের প্রথম মন্দির। অবশ্য আজ আর সে মন্দিরের কোন চিহ্ন নেই। তার জায়গায় নির্মিত হয়েছে নতুন মন্দির। আপনি সে মন্দির দর্শন করতে পারবেন।

"যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। পরবর্তীকালে হরিদাস স্বামীর শিষ্যগণ সত্তর হাজার টাকা খরচ করে নতুন মন্দির তৈরি করেন। সেই মন্দিরই এখন বঙ্কুবিহারী বা বিহারীজীর মন্দির নামে বিখ্যাত। এই মন্দির ব্রজমণ্ডলের সবচেয়ে জনপ্রিয় মন্দির। প্রতিদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থী বিহারীজীকে দর্শন করেন।"

আমরা পৌঁছে গিয়েছি মন্দিরের সামনে। এখনও বেশ ভিড় রয়েছে দেখছি। ভিড় মন্দির-দ্বারে ও সামনের উঁচু চত্বরে, পথে ও পথের পাশের—ফুল, ফল ও মিষ্টির দোকানে। পুণ্যার্থীরা বিহারীজীকে মালা চড়িয়ে থাকেন। মূল্য দিলে ভক্তের নামে বিহারীজীর কুসুম-শৃঙ্গার রচনা করা হয়। শুনেছি অক্ষয় তৃতীয়াতে

হাজার হাজার টাকার ফুল দিয়ে বিহারীজীর শৃঙ্গার হয়। আর সেই পুণ্যতিথিতেই পুণ্যার্থীরা কেবল বিহারীজীর শ্রীচরণ দর্শন করতে পারেন।

মন্দিরের সামনে পথের বাঁদিকে বাঁধানো প্রাঙ্গণ—রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা উঁচু। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আমরা সেখানে উঠে এলাম। একপাশে জুতো খুলে রাখি। চক্রবর্তীর হাতে জিনিসপত্র দিয়ে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি। চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে।

সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই নাট-মন্দির। বহু ভক্ত জোড়-হাত করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরাও এসে তাঁদের পাশে দাঁড়াই। গর্ভ-মন্দিরের দরজায় পর্দা ঝুলছে।

একটু বাদে পর্দা খুলে গেল। আমরা দর্শন করলাম। কয়েকজন ভক্ত ভক্তিসহকারে বিহারীজীকে ডাকলেন। অপূর্ব সুন্দর মূর্তি। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মন ভরে উঠল।

কিন্তু বেশিক্ষণ আর দেখতে পারলাম না সেই পরম-রমণীয়কে। আবার পর্দা পড়ে গেল। এই রকম পর্দা ফেলে দেওয়া ও পর্দা সরিয়ে দেওয়ার ভেতর দিয়ে দর্শন করতে হয় বিহারীজীকে। এই দর্শনকে বলে 'ঝাঁকি দর্শন'।

বিহারীজী যে বড়ই ভক্তপ্রিয়। ভক্তিভরে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে, তাঁকে মন দিয়ে ডাকলে তিনি ভক্তের সঙ্গে চলে যান। কয়েকবার নাকি চলেও গেছেন। তাই মন্দির কর্তৃপক্ষ এই ঝাঁকি দর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে কোন ভক্ত বেশিক্ষণ বিহারীজীর দিকে তাকিয়ে থাকতে না পারেন।

দর্শন শেষে আমরা বেরিয়ে আসি বাইরে। জুতো পরে চক্রবর্তীর হাত থেকে জিনিসপত্র নিই। একটি কিশোরী এগিয়ে আসে আমার কাছে। বলে, "আপনাকে ডাকছেন।"

"কে?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"ঐ যে, ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।" মেয়েটি উত্তর দেয়।

আমি সেদিকে তাকাই। কত লোকই তো রয়েছে দাঁড়িয়ে, কে ডাকছে আমাকে ?

"চলুন না একবার !" মেয়েটি বলে।

আর প্রশ্ন করা ভাল দেখায় না। বলছে যখন, গিয়েই দেখা যাক্ না! হাতের জিনিসপত্র আবার চক্রবর্তীকে দিই। বলি, "একটু ধরো তো ! দেখে আসি, কে ডাকছেন ?"

মেয়েটির সঙ্গে চলতে শুরু করি। মন্দির-প্রাঙ্গণের অপরপ্রান্তে আসি—এদিকটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। তাই ভিড় কম। তাহলেও নারী, পুরুষ ও শিশুরা দলে দলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা এক মহিলাকে দেখিয়ে দেয় কিশোরীটি। বলে, "ঐ যে, উনি ডাকছেন আপনাকে।"

কে ? ভদ্রমহিলা এদিকে তাকিয়ে রয়েছেন, তবু চিনতে পারছি না। আশ্রমের কেউ কি ? কিন্তু এই কিশোরীটিকে তো আশ্রমে দেখি নি! বৃন্দাবনে আমার কয়েকটি পরিচিত পরিবার আছেন। তবে তাঁদের তো জানাই নি এই আগমনের কথা ! কেবল শাস্ত্রীজী জানেন। কিন্তু তাঁর বাড়ির মহিলারা তো চেনেন না আমাকে !

"চিনতে পারছ ?" ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন।

"কে ?" আমি প্রায় চিৎকার করে উঠি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসি কাছে—আরও কাছে। না, ভুল হয় নি আমার। গত দু'বছর ধরে প্রায় প্রতিদিন যার কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজছে, চোখ বুজলেই যার মুখখানি আমার মানস-নয়নে ভেসে উঠছে, সেই হারিয়ে-যাওয়া মানসী দাঁড়িয়ে রয়েছে আমারই সামনে। বিহারীজী, সত্যিই তুমি করুণাময় !*

"কি ? চুপ করে রইলে কেন ? চিনতে পারছো ? না, চিনতে চাইছো না ?"

---

*লেখকের 'উত্তরস্যাং দিশি' দ্রষ্টব্য।

"ছি, ছি! এ তুমি কি বলছো মানসী! আজ আমার কত বড় আনন্দের দিন, তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

মানসী একটু চুপ করে থাকে। তারপরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, "আমারও যে আজ বড় আনন্দের দিন সখা!"

সেই সম্ভাষণ। কতদিন বাদে দেখা, অথচ ঠিক সেই একই-ভাবে, একই ভাষায় মানসী ডাকছে আমাকে। সে-ও কি সেই একই রয়ে গেছে? কিন্তু তাহলে তার বেশ-ভূষা এমন কেন?

পরনে একখানি লাল পাড়ের সাদা শাড়ি, গায়ে একটি অতি সাধারণ জামা, গলায় তুলসীর মালা। চেহারাটা রোগা হয়ে গেছে। গায়ের রঙটাও যেন আগের চেয়ে কালো হয়েছে।

"অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছো কেন? কি দেখছো?"

তবু তাকিয়ে থাকি তার দিকে। কত ভেবেছি তার কথা। কত খুঁজেছি তাকে। আমার হারিয়ে-যাওয়া মানসীকে আমি আজ ফিরে পেলাম। বৃন্দাবন, তুমি সত্যিই মধুময়!

কিন্তু এই বেশে আর এই পরিবেশে তার সঙ্গে দেখা হবে বলে তো ভাবি নি কখনও! এ যেন মানালীর পথে স্ল্যাক্স পরে ঘুরে-বেড়ানো মানসী নয়, নয় সেই মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি-পরা যোগিন্দরনগরের মানসী। কিন্তু কেন? কেন তার এই বৈষ্ণবীর বেশ? সে কি তাহলে বাবা মারা যাবার পরে সব ফেলে, সবাইকে ছেড়ে চলে এসেছে বৃন্দাবনে—বৈষ্ণবী হয়েছে?

কেন? তার দাদারা রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা ভাল, তাঁরা ভালোবাসেন তাকে। মানসী তাঁদের অতি আদরের বোন। তাঁরা তাকে আবার বিয়ে করতে বলেছিলেন। মানসী কেন তাঁদের কথা শুনল না, কেন সে সুখী হল না, আর কেনই বা এখানে এসে কৃচ্ছ্র সাধনের পথ বেছে নিল?

"কি, দেখা হয়েছে ?" মানসী আবার জিজ্ঞেস করে।

এবারে উত্তর দিই আমি। বলি, "না।"

"না হলেও আজ আর দেখতে হবে না। সবটুকু একবারে দেখে নিলে পরে কি দেখবে ? বৃন্দাবনে যখন এসেছো, তখন আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই। তার চেয়ে তোমার খবর বলো।"

"আমিও তো তোমাকে এই একই কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম।"

মানসী একটু হাসে। ঠিক তেমনি করুণ হাসি, যেমনটি সে হেসেছিল দু'বছর আগে, এমনি এক হেমন্তের শিশির-ঝরা রাতে—মানালীর জনবিরল পথে। মানসীর সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়-লগ্নেও আমি শুনতে চেয়েছিলাম তার কথা। সে হেসে বলেছিল, 'কি হবে আমার কথা শুনে ? তার চেয়ে আপনার কথা বলুন। হিমাচলের কথা বলুন।'

সেদিন আমার কথার মাঝে সে শুনতে চেয়েছিল হিমাচলের কথা। আর আজ ? আজ কি সে শুধুই আমার কথা শুনতে চাইছে ?

"কেমন আছো ?" আবার জিজ্ঞেস করে মানসী।

"ভালই। তুমি ?"

"ভাল।" মানসী উত্তর দেয়।

"আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।"

"মানে ?"

"মনে হচ্ছে মোটেই ভাল নেই তুমি।"

"মিথ্যে মনে হচ্ছে তোমার।" মানসী আবার হাসে। বলে, "সত্যি বলছি, খুব ভাল আছি আমি।"

এবারে আমাকে হাসতে হয় একটু। বলি, "যারা সত্যি ভাল থাকে, তারা সেকথা এমন সোচ্চার স্বরে প্রচার করে না।"

"কারণ তারা ভীতু। ভাবে—সেকথা বললে লোকে তাদের ক্ষতি করবে।"

"তোমার বুঝি সে ভয় নেই?"

"না।" মানসী নির্ভয়ে জবাব দেয়।

আমি নীরবে তাকিয়ে থাকি তার দিকে।

সে আবার বলে, "আবার ঐ রকম হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছো। ঐ মেয়েটা কি ভাবছে বলো তো?" সে ইশারায় কিশোরীটিকে দেখিয়ে দেয়।

হাসি পায় আমার। তাই সহাস্যে জবাব দিই, "জগতের কারও ভাবনায় যখন তোমার কোনদিন কিছু এসে যায় নি, তখন আজ ওর ভাবনায় কিছু এসে যাবে কি?"

"তাই বলে তুমি আমার কথার জবাব না দিয়ে শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে?" মানসীর স্বরে উষ্মা।

না, বাইরে তার যত পরিবর্তনই হোক্, স্বভাবের দিক থেকে সে একই রয়ে গেছে। তাই বলি, "তাহলে তোমার খবর কিছু বলবে না?"

মানসী সন্ধি করে, "আমার আবার খবর! তোমার কথা বলো। কেন বৃন্দাবন এসেছো, কোথায় উঠেছো?"

একবার যখন ঠিক করেছে নিজের কথা কিছু বলবে না, তখন ওকে অনুরোধ করা বৃথা। মানসী চিরকাল নিজের মতে চলে এসেছে, আর তারই জন্য আজ সে বৃন্দাবনে। অতএব তার কথা থাক্। আমি তাকে আমার বৃন্দাবন আসার কারণ বলি, বলি বন-পরিক্রমার কথা।

সব শুনে মানসী বলে, "তাহলে বৃন্দাবনচন্দ্র তোমাকেও কৃপা করেছেন!"

"তোমাকে করেছেন বুঝি?"

"নিশ্চয়ই।" মানসী বলে, "নইলে এত জায়গা থাকতে এখানে আসব কেন, আর এসেই বা এমন শান্তি পাব কেন?"

মনে মনে ভাবি, তোমার এ বিশ্বাস চিরস্থায়ী হোক্ মানসী। তোমার যে শান্তির বড়ই দরকার। তুমি শান্তিতে আছো জানলে

আমিও শান্তি পাব। মুখে বলি, "বৃন্দাবনচন্দ্র নিশ্চয়ই কৃপা করেছেন আমাকে, নইলে এমনভাবে আজ তোমার দেখা পেতাম না মানসী।"

"অত খুশি হয়ো না, বুঝলে! বৃন্দাবনচন্দ্রের মতলব বোঝা বড়ই কঠিন।" সহাস্যে আমাকে সাবধান করে মানসী। তারপরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, "মুকুন্দ মহারাজের আশ্রমে আমি গিয়েছি। ওঁদের পরিক্রমাও খুব ভাল। যত্ন করে যাত্রীদের সব বুঝিয়ে দেন। কিন্তু শুনেছি, থাকা-খাওয়াটা সুবিধের নয়। তোমার কষ্ট হবে যে!"

"কে একথা বললে তোমাকে?" তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করি।

"সেকথা শুনে তোমার লাভ? কথাটা সত্যি কিনা বলো!"

"না।"

"দেখো!" মানসী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "আমার কাছে বাজে কথা বলে কোন লাভ নেই। আমি সব জানি। কিন্তু কি করব? সব জেনেও চুপ করে থাকতে হবে আমাকে। আমি যে নিরুপায়!" শেষদিকে মানসীর কণ্ঠস্বরটা সহসা আর্দ্র হয়ে ওঠে।

শান্ত স্বরে বলি, "আমার জন্য তুমি অযথা চিন্তা করো না মানসী। আমি শরীরের দিকে নজর রাখব।"

"তাই রেখো!" মানসী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

"যাক্ গে। এবারে তোমার কথা বলো! কেমন আছো?"

"বলেছি তো ভাল, খুউব ভাল আছি আমি। সুখে আছি, শান্তিতে আছি।"

"কতদিন এখানে এসেছো?"

"প্রায় দু'বছর।"

"তার মানে তোমার বাবা মারা যাবার পরেই?"

মানসী আবার হাসে। তেমনি করুণ হাসি। তারপরে বলে, "কায়দা করে জেনে নিতে চাইছো সব কথা?"

"না।" আমি বলি, "এতদিন বাদে দেখা। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।"

"জানি।" মানসী উত্তর দেয়, "তবু আজ আমার কোন কথাই তোমাকে বলব না সখা। পরে দেখা যাবে।" একবার থামে সে। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠে, "আজ আসি তাহলে?"

চমকে উঠি। মানসী বিদায় চাইছে! কিন্তু কেন? এত তাড়াতাড়ি যদি বিদায় নেবে, তাহলে সে কেন কাছে ডাকল আমাকে? কেনই বা এত কথা বলল?

তবু সে প্রশ্ন করতে পারি না। শুধু জিজ্ঞেস করি, "কোথায় আছো?"

"এই তো, কাছেই······আচ্ছা, এখন আসি!" মানসী আর কিছু বলার সুযোগ দেয় না আমাকে। সে এগিয়ে যায় দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা কিশোরীটির কাছে। তারপরে তার একখানি হাত ধরে হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করে। ক্ষিপ্রবেগে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় পথে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পথচারীদের মাঝে মিশে যায় মানসী—মানসী হারিয়ে যায়। এমনিভাবেই সেদিন পাঠানকোটে সে গিয়েছিল হারিয়ে। আর আজও সেদিনের মতো সে তার ঠিকানাটা দিয়ে যায় নি আমাকে।

॥ সাত ॥

"যোগমায়া আপন প্রভাব সংহরণ করা মাত্র নন্দালয়ের সবাই জেগে উঠল। যশোদার পুত্রলাভের সংবাদ গোকুলের দিকে দিকে প্রচারিত হল। গোপ-গোপীগণ বালকরূপী আনন্দময় ভগবানের প্রেমমূর্তি দর্শন করে আত্মহারা হলেন। মহাসমারোহে পালিত হল শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব।"

প্রভাতী পাঠের আসর বসেছে—ভাগবত পাঠ। পাঠ করছেন মথুরা মহারাজ।

"পরদিন সকালে মথুরায় মহারাজ কংস মন্ত্রীদের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন—বললেন যোগমায়ার কথা। সব শুনে প্রথমে মন্ত্রীরা ভগবানকে ভীরু বলে গালাগাল করলেন। তারপরে তাঁরা কংসকে পরামর্শ দিলেন, 'দশদিন পর্যন্ত বয়সের সমস্ত শিশুকে বধ করে, আপনাকে নিষ্কণ্টক হতে হবে।'

"কয়েকদিন পরে মহারাজ নন্দ কংসকে বার্ষিক রাজকর দেবার জন্য মথুরায় এলেন। বসুদেব তাঁর সঙ্গে দেখা করে গোকুলের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করলেন তাঁকে। তিনি নন্দরাজকে তাড়াতাড়ি গোকুলে ফিরে যেতে বললেন।

"মহারাজ নন্দের কাছে তাঁর পুত্রলাভের কথা শুনে কংসের কেমন একটা সন্দেহ হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বকী নামে পূতনা জাতীয় এক রাক্ষসীকে পাঠিয়ে দিলেন গোকুলে।

"বকী নন্দের আগেই গোকুলে উপস্থিত হল। তখন গভীর রাত্রি। কিন্তু মা যশোদা ও রোহিণী শিশুকৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে জেগে রয়েছেন। পূতনা পরমাসুন্দরীর রূপ ধারণ করে সেখানে হাজির হল। যশোদা ও রোহিণী সবিস্ময়ে দেখতে থাকলেন সেই সুন্দরীকে। সুন্দরী এগিয়ে এলো শ্রীকৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে। শিশুকৃষ্ণের মুখের ওপরে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কারও মুখে কোন কথা নেই।

"সহসা শিশুকৃষ্ণ চোখ খুলে বকীর দিকে তাকালেন। বকী তাড়াতাড়ি তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে তাঁর মুখে নিজের স্তন প্রদান করল। শিশুকৃষ্ণ হঠাৎ দু'হাতে স্তনটিকে ধরে সজোরে দুগ্ধ পান করতে থাকলেন। ছয় দিনের শিশু, কিন্তু কি প্রচণ্ড শক্তি! কোথায় পূতনার স্তন থেকে বিষধারা ক্ষরিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হবে—আর এখন কিনা দুগ্ধদানের যন্ত্রণায় বকী অধীর হয়ে উঠেছে! 'ছাড়, ছাড়' বলে সে চীৎকার করে উঠল। সে হাত-পা ছুঁড়তে থাকল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও সে শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়াতে পারল না। তখন সে নিজের রূপ ধারণ করল। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েই উঠল আকাশে।

"কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। একটু বাদেই কংসের বিলাস উদ্যানের ওপর গেল পড়ে। শ্রীহরিকে বুকে জড়িয়ে ধরে পূতনা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। শ্রীকৃষ্ণের নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেল তার নিঃশ্বাস। মৃত্যুকালে ভগবানের স্পর্শলাভ করায় পূতনার সাধুজনোচিত সদ্গতি হল।

"গোপ-গোপীগণ খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, 'বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্'—একটি সুন্দর থেকে সুন্দরতর শিশু নির্ভয়ে সেই ভীষণা রাক্ষসীর বিশাল বক্ষস্থলের ওপরে খেলা করছে। তাঁর ঘনশ্যামবর্ণে চারিদিক স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। কুঞ্চিত কেশদাম বায়ুসঞ্চারে ইতস্ততঃ কম্পিত হচ্ছে। পায়ের নূপুর বেজে উঠছে—অতি সুন্দর ও অতি কুৎসিতের সে এক আশ্চর্য সমন্বয়।

"শিশুকৃষ্ণকে নিরাপদ দেখে তাঁরা আনন্দিত হলেন। মহারাজ নন্দ তাড়াতাড়ি শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন।

"এইখানে শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ হল।" একবার থামলেন মথুরা মহারাজ। তিনি ঘড়ি দেখলেন। তারপরে বললেন, "আরও কিছুক্ষণ সময় আছে। কাজেই আমি এখন সপ্তম অধ্যায়টিও পাঠ করব।"

আমরা নড়ে-চড়ে আবার ঠিক হয়ে বসি।

মথুরা মহারাজ শুরু করলেন, "শুভদিন দেখে মা যশোদা পুত্র শ্রীকৃষ্ণের ঔত্থানিক সংস্কার উৎসবের আয়োজন করে ব্রাহ্মণ ও গোপ-গোপীদের আহ্বান করলেন। সেকালে শিশুদের তিনমাসের সময় এই উৎসব করা হত। সেদিন উৎসবের সময় শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন। যশোদা তখন সুবিরাট একটি শকটের নিচে একটি দোলায় শুইয়ে দিলেন তাঁকে। সেখানেই কয়েকটি কাঠের পাত্রে কিছু দুগ্ধ ও দধি ছিল। সেকালে শকটের নিচে এইভাবে দুগ্ধ প্রভৃতি রাখা হত।

"কিছুক্ষণ বাদে শ্রীকৃষ্ণের ঘুম গেল ভেঙে। তিনি খিদেয় কাঁদতে থাকলেন। মা তখন নিমন্ত্রিতদের নিয়ে ব্যস্ত, তাঁর আসতে দেরি হল। অভিমানী শিশু তাঁর একটি পা দিয়ে শকটটাকে লাথি মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে শকট উল্টে পড়ল। সমস্ত দুগ্ধ ও দধি গেল নষ্ট হয়ে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কিছুই হল না। তাড়াতাড়ি সবাই ছুটে এলেন সেখানে। শ্রীকৃষ্ণকে নিরাপদ দেখে নিশ্চিন্ত হলেন তাঁরা। মা তাড়াতাড়ি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পরে জানতে পারলেন, শিশু-কৃষ্ণই শকট ভঞ্জন করেছেন।

"মা ভাবলেন, ছেলে দুষ্টগ্রহে আক্রান্ত হয়ে এই অসাধারণ কাজটি করে ফেলেছে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আসল কথাটি শিশু-ভগবান ছাড়া আর কেউই জানতে পারলেন না। শকটাসুর গুপ্তভাবে ঐ শকটকে অবলম্বন করে শিশুকৃষ্ণকে চেপে মারার মতলব করেছিল। শকট ভঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শকটাসুরও নিহত হল।"

একবার থামলেন মথুরা মহারাজ। তারপরে তিনি কণ্ঠস্বরকে আরও গম্ভীর করে বললেন, "স্বাভাবিকভাবেই আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, শকটাসুরকে বধ করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নন্দরাজের দুগ্ধ ও দধি নষ্ট করে ফেললেন কেন? সে প্রশ্নের উত্তরে আমি

বলব যে, ভগবান এই লীলার ভেতর দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের ভোগশক্তি ও সঞ্চয়জনিত বাসনা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।"

আবার থামলেন মথুরা মহারাজ। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তাহলে কি এখনকার মতো পাঠ শেষ হল?

না। মথুরা মহারাজ বলে চলেছেন, "এই সপ্তম অধ্যায়েই ভাগবতকার আমাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের আর একটি লীলাকাহিনী বর্ণনা করেছেন, সেটি হল তৃণাবর্ত্ত-বধ। আমি এখন আপনাদের কাছে সেই লীলার কথাই বলছি।"

আমরা আবার ঠিক হয়ে বসি। মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করেন—

"শকট ভঞ্জনের কিছুকাল পরে একদিন মহারাজ কংস শ্রীকৃষ্ণকে মেরে ফেলবার জন্য তাঁর অনুচর তৃণাবর্ত্তকে গোকুলে পাঠিয়ে দিলেন। তৃণাবর্ত্ত প্রথমে ঘুর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করল। তারপরে ধূলি ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে গোকুলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলল। গোকুল-বাসীদের দৃষ্টিহীন করে সে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আকাশে উঠে পালিয়ে গেল।

"কিন্তু বেশিক্ষণ উড়তে পারল না। একটু বাদেই শ্রীকৃষ্ণকে তার অত্যন্ত ভারী বলে মনে হতে থাকল। তার গতিবেগ এলো কমে। এদিকে ব্রহ্মাণ্ডের আধার-রূপী শিশুকৃষ্ণ তার গলা জড়িয়ে ধরে আছেন। তৃণাবর্ত্ত কিছুতেই সেই বন্ধন-মুক্ত হতে পারল না। তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো। অবশেষে সে শ্রীকৃষ্ণসহ পড়ে গেল নিচে। আর পড়ল একটা বড় পাথরের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল।

"শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু কিছুই হল না। সবাই ছুটে এসে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ খেলা করছেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি তাঁকে এনে মাতা যশোদার কাছে দিলেন। মা স্নেহাপ্লুত হৃদয়ে পুত্রকে কোলে নিয়ে বাৎসল্যরসে ক্ষরিত স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে থাকলেন।

"এই লীলার মধ্য দিয়ে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে গোকুলবাসীদের

কাছে ভগবৎ-বীর্য প্রদর্শন করলেন। ফলে তাঁদের ভগবৎ-বিশ্বাস প্রবলতর হল। আশা করি, শিশু শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব লীলা-মাধুরী শ্রবণ করে আপনাদের ভগবৎ-বিশ্বাসও প্রবল থেকে প্রবলতর হবে।"

থামলেন মথুরা মহারাজ। তিনি প্রণাম করে শ্রীমদ্‌ভাগবতখানি বন্ধ করলেন। আমরাও প্রণাম জানাই সেই পুণ্যগ্রন্থের উদ্দেশে।

পাঠ শেষ হল। এখন কিছুক্ষণ ধরে কীর্তন চলবে। এই অবসরে মহারাজরা তৈরি হয়ে নেবেন, আর আমাদের চা-পর্ব শেষ করে নিতে হবে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি নাট-নন্দির থেকে। একরকম ছুটেই চলি চা-য়ের দোকানের উদ্দেশে।

সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা লুকিয়ে চা খাচ্ছেন, তাঁরা প্রায় সবাই এসে গেছেন ইতিমধ্যে। চক্রবর্তীও রয়েছে এখানে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, "এই যে, এসে গেছো!"

আমি তার পাশে এসে বসি। চক্রবর্তী আবার বলে, "আহা! মথুরা মহারাজ কি অপূর্ব লীলা-মাহাত্ম্য শোনালেন আমাদের!"

আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়ি। চক্রবর্তী প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, এই পূতনা-বধের ব্যাপারটা বুঝতে পারলে?"

"না।"

হো-হো করে হেসে উঠল চক্রবর্তী। তার আকস্মিক উচ্চ-হাসিতে সবাই সচকিত হয়ে ওঠেন। একসময় হাসি থামিয়ে সে আমাকে বলে, "বুঝতে পারলে না তো! আমি জানতাম, পারবে না! আরে বাবা, ভাগবতের অর্থ বোঝা কি অতই সহজ? শোন তাহলে!" একবার থামে সে। তারপরে গম্ভীর স্বরে বলে, "এই লীলার মধ্য দিয়ে ভাগবতকার আমাদের বলছেন, যার কৃপায় জীবের সদ্গতি হয়, প্রতিকুল আচরণ সত্ত্বেও কত সহজে সেই দয়াময় ভগবানের কৃপালাভ করা যায়।"

দোকানীর হাত থেকে চা-য়ের গ্লাশ নিয়ে নিঃশব্দে চুমুক দিতে থাকি। চক্রবর্তী আর কোন কথা বলে না। সে হয়তো ভাবছে, আমি তার কথাই রোমন্থন করছি মনে মনে। ভেবে নিশ্চয়ই সে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে।

আমার কিন্তু মনে পড়ছে পূতনা-বধ সম্পর্কে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য। কিন্তু কথাটি বলা যাবে না চক্রবর্তীকে। কারণ, তাহলে সে নাস্তিক বলবে আমাকে।

"কি ভাবছো?"

চক্রবর্তীর প্রশ্নে চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি উত্তর দিই, "কিছু না। চলো। এবারে যাওয়া যাক্। কীর্তন শেষ হয়ে গেছে। এতক্ষণে বোধহয় শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়ল।"

"হ্যাঁ, চলো।" চক্রবর্তীও উঠে দাঁড়ায়।

কালকের মতোই শোভাযাত্রা হয়েছে আজ। আর কালকের মতোই কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছি আমরা। চলেছি কালীয়দমন স্থানে। পথের দু'ধারেই একই দৃশ্য—দলে দলে নর-নারী ও শিশু হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

কীর্তনের যেমন বিরাম নেই, তেমনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক সেবকদের দুষ্টুমিরও শেষ নেই। যে বয়সের যা ধর্ম। আশ্রমবাসী হলেই কি বয়সের দাবীকে অমান্য করা যায়? তাই আজ তাঁরা জনৈকা পাঞ্জাবী প্রবীণার পেছনে লেগেছে। ভদ্রমহিলা কাল এসেছেন অমৃতসর থেকে। জল ঘাঁটা ও অতিরিক্ত দণ্ডবৎ করা প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন, তিনি ঠিক সুস্থ-মস্তিষ্কা নন। আর তারই পুরোপুরি সুযোগ নিচ্ছে সেবকরা। বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট প্রভৃতি দেখিয়ে তাঁকে বলছে, "দণ্ডবৎ করুন।"

সরলা পুণ্যার্থী সঙ্গে সঙ্গে সে নির্দেশ পালন করছেন। এ যুগে সারল্য পাগলামো বলে পরিচিত।

কিন্তু এঁরা দেখছি পাঞ্জাবী মহিলার চাইতে বেশি পাগল। নইলে এঁরাই বা কীর্তন ছেড়ে হঠাৎ ঐ গোরুটার দিকে ছুটে

যাবেন কেন? আর গিয়ে যা কাণ্ড করলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। গোরুটা পথের ধারে দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করছিল। ওঁরা অঞ্জলি ভরে গোমূত্র গ্রহণ করলেন। তারপরে পরম শ্রদ্ধায় সেই প্রিয় পানীয় পান করলেন। তাঁদের দেখাদেখি পাঞ্জাবী মহিলাও ছুটে গিয়েছিলেন গোরুটার কাছে। কিন্তু দুঃখের কথা, ততক্ষণে গোরুটার মূত্রত্যাগ শেষ হয়ে গেছে। তাই তিনি আর ভাগে পেলেন না সেই পরম প্রার্থিত পানীয়। ক্লান্ত পদক্ষেপে ফিরে এলেন শোভাযাত্রার মাঝে।

অবশেষে আমবা কালীয়দমন স্থানে অর্থাৎ কালিদহে উপস্থিত হলাম। জলহীন পরিখার মতো একফালি নিচু জায়গার পাশে এসে থামল আমাদের শোভাযাত্রা। এককালে যমুনা এই পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। পরিখারূপ জায়গাটি সেই যমুনারই অংশ, অর্থাৎ জলহীন যমুনা। এখন যমুনা অনেকটা সরে গেছে, বহুদূব দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বেশ বড় একটা ঘাট, তিনটি মন্দির আর একটি সুপ্রাচীন কেলিকদম্ব গাছ নিয়ে কালীয়দমন স্থান। জায়গাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। পরিখার ওপারে একজোড়া ময়ুব-ময়ূরী দেখতে পাচ্ছি। তারাও তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখছে, হয়তো বা কীর্তন শুনছে।

এক সারি ঘাট নেমে গেছে পরিখার ভেতরে, আর সেই ঘাটের ওপরেই মন্দির এবং একটি সুপ্রাচীন কেলিকদম্ব গাছ। গাছের গোড়া সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু ওঁরা বলেন, গাছটি দ্বাপর যুগের—শ্রীকৃষ্ণ এই গাছের ওপর থেকেই নাকি লাফ দিয়ে যমুনায় পড়েছিলেন, কালীয় নাগকে দমন করেছিলেন। তাই এই গাছটি 'কালিকদম্ব' নামে পরিচিত। মন্দির অবশ্য পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে। মন্দিরে রাধামাধবের বিগ্রহ। এখানেই শ্রীদুর্গ গোস্বামীর বংশধর শ্রীবিনোদবিহারী গোস্বামীর ভজনস্থলী। আরও কয়েকজন ভজনকারী বৈষ্ণব মহাত্মা বাস করেন এখানে।

দর্শন ও পরিক্রমার পরে গুরুমহারাজের আদেশে আমরা ঘাটের ওপর বসে পড়লাম। মৃদু-মন্দ বাতাস বইছে। এই বোধহয় মধু-বৃন্দাবনের মধুর ব্যজন। এ অঞ্চলটি শহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। কাজেই বসতি নেই বললেই চলে। চারদিকে সবুজ গাছপালা। দূরে যমুনার বালুকাময় বেলাভূমি। পরিখার ওপারে কাঁটাগাছে বোঝাই একখণ্ড পতিত জমি। খুবই শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ। বেশ ভাল লাগছে। ভাল লাগছে সমবেত কণ্ঠের কীর্তন—শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্তন।

কীর্তন্ চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তারপরে গুরুমহারাজ উদাত্ত ও মধুর স্বরে বলতে থাকলেন, "এই সেই পরম পবিত্র স্থান—যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করেছিলেন। ভাগবতকার শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে সেই অপূর্ব কৃষ্ণলীলার কথা বলেছেন। এইখানে ছিল সেই হ্রদ, যে হ্রদে কালীয় নামক মহাসর্প বাস করত। তার বিষাগ্নিতে হ্রদের জল, আকাশ ও তীরভূমি বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল।

"একদা গ্রীষ্মকালে শ্রীকৃষ্ণের কয়েকজন তৃষ্ণার্ত সখা সেই হ্রদের জল পান করলেন এবং গো-বৎসদের পান করালেন। সঙ্গে সঙ্গে গোধনসহ তাঁরা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

"সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ জানতে পারলেন সেই দুর্ঘটনার কথা। সখা-সহায় শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এলেন এই পুণ্যময় স্থানে। ঐ কেলিকদম্ব গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লেন হ্রদের জলে। ভীষণ শব্দে মত্ত-মাতঙ্গের মতো জল-ক্রীড়া করতে থাকলেন তিনি। কালীয় তার গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সহস্র ফণা তুলে আক্রমণ করল শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ কোন-রকম আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে কালীয় কবলিত দেখে ব্রজবালকগণ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। নন্দ, যশোদা ও রোহিণীসহ বহু ব্রজবাসী এসে উপস্থিত হলেন এখানে। প্রাণাধিক শ্রীকৃষ্ণের দুরবস্থা দেখে তাঁরা কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে উদ্ধার

করবার জন্য নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ জলে ঝাঁপ দিতে চাইলেন। কিন্তু বলরাম বাধা দিলেন তাঁদের।

"আর তার পরেই তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন, অনন্ত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ কালীয়র ফণা-বন্ধন থেকে সতেজে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন। তিনি হ্রদের জলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর কালীয় তাঁকে ধরবার বৃথা চেষ্টা করে শ্রান্ত হয়ে পড়ছে। একসময়ে কালীয় একেবারে হতবল হয়ে পড়ল, আর তখুনি শ্রীকৃষ্ণ তার মণিময় ফণার ওপরে আরোহণ করলেন। কালীয়র উজ্জ্বল মস্তকে ভগবানের রক্তিম শ্রীপাদপদ্ম বিরাজিত হয়ে এক অপূর্ব শোভার সঞ্চার হল।

"সর্বকলান্বিত শ্রীকৃষ্ণ তখন কালীয়র ফণার ওপরে নানা রকম নৃত্য করতে লাগলেন। এই অপূর্ব লীলা দর্শনের জন্য দেবতা ও গন্ধর্বগণ স্বর্গ থেকে এসে উপস্থিত হলেন এখানে। দর্পহারী শ্রীহরি তখন নৃত্যের তালে তালে কালীয়র মাথায় আঘাত করতে থাকলেন। কালীয়র রক্তবমি শুরু হয়ে গেল, সে শক্তিহীন হয়ে পড়ল।

"কালীয়র অবস্থা দেখে তার স্ত্রীরা ছুটে এলো। তারা সাষ্টাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে বলল, 'হে দেবাদিদেব! বহু তপস্যা করেও মানুষ যে চরণ দর্শন করতে পারে না, যে চরণ দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ, সেই চরণ আজ আমাদের স্বামী মাথায় ধারণ করেছেন—তিনি ধন্য, আমরাও ধন্য। নাগরাজ আপনার পুত্রস্বরূপ। আপনি কুপথগামী পুত্রকে শাসন করেছেন, এখন তাঁকে ক্ষমা করুন। কৃপা করে আমাদের পতির প্রাণভিক্ষা দিন—কারণ, পতিই নারীজাতির প্রাণস্বরূপ।'

"আশ্রিত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ কালীয়কে মুক্তি দিলেন; কালীয় তখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে বলল, 'আমরা এখন কি করব, আদেশ করুন প্রভু!'

"করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে বললেন, 'তুমি এই মুহূর্তে তোমার পূর্ব-নিবাস রমণক দ্বীপে গমন কর। কারণ, এখন থেকে

আমার ক্রীড়াপূর্ণ এই হ্রদের জল অতি পবিত্র বলে গণ্য হবে। আর যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার এই কালীয়দমন লীলা শ্রবণ করবে, তাদের সর্প-ভয় থাকবে না।'

"কালীয় তখন সপরিবারে রমণক দ্বীপে চলে গেল। আর সেই পুণ্যতিথি থেকেই কালীয় হ্রদের জল বিষশূন্য হয়ে ভগবৎ কৃপায় অমৃতধারায় পরিণত হয়েছে।"

কালীয়দমন স্থান থেকে আমরা মদনমোহন মন্দির দর্শন করতে চলেছি। কাছেই মন্দির। একটু হেঁটে আমরা যমুনার তীরে এলাম। অনেকটা উঁচুতে মন্দির—তীরভূমি থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে। জায়গাটির নাম আদিত্যটিলা। কথিত আছে কালীয়কে দমন করার পরে শ্রীকৃষ্ণ এখানে এসে রোদে বসে বিশ্রাম করেছিলেন।

সিঁড়ি ভেঙে আমরা মন্দির-চত্বরে উঠে এলাম। উত্তর দিকে নাট-মন্দিরের দ্বারে লেখা রয়েছে—'সম্বৎ ১৬৮৪ বর্ষ, শ্রাবণ।'

চত্বর পেরিয়ে প্রাচীন মন্দির। পাথরের সুবিশাল মন্দির —দু'দিকে সিঁড়ি। লতাপাতা আঁকা সাত সারি গম্বুজ। লাল পাথরের দেওয়ালে সুন্দর কারুকার্য। সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। তাহলেও মন্দির-তোরণ ও চূড়াটি দেখবার মতো।

পাশেই নতুন মন্দির। প্রথমে ছয় ধাপ সিঁড়ি ভেঙে মন্দির-চত্বর। তারপরে ছোট নাট-মন্দির ও গর্ভ-মন্দির। সিংহাসনে শ্রীরাধামদনমোহনের বিগ্রহ—প্রতিনিধি বিগ্রহ। আদি বিগ্রহ রয়েছেন করৌলীতে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৺নন্দকুমার বসু এই নতুন মন্দির নির্মাণ করে দেন। তখনই এই প্রতিনিধি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আওরঙ্গজেব বৃন্দাবন আক্রমণ করেছেন শুনে জয়পুরের মহারাজা অন্যান্য বিগ্রহের সঙ্গে রাধামদনমোহনজীকেও জয়পুরে নিয়ে যান। পরে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শ্যালক করৌলীর মহারাজা গোপাল সিংজী সেই বিগ্রহ নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছেন। সেই থেকে মদনমোহন রয়েছেন করৌলীতে।

দর্শন, পরিক্রমা ও কীর্তনের পরে গুরুমহারাজ আমাদের প্রাচীন মন্দির দর্শনের অনুমতি দান করলেন। আমরা সেই সুবিরাট ভগ্ন মন্দিরে প্রবেশ করি। শ্রীনিতাই-গৌরের বিগ্রহ রয়েছে মন্দিরে। কয়েকজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব এখানে থেকে সাধন-ভজন করেন।

নাট-মন্দিরটি ৫৭ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া ও ২২ ফুট উঁচু। মন্দিরের উচ্চতা ৪৪ ফুট। নাট-মন্দিরে ছাদ নেই।

কারুকার্য সমন্বিত দেওয়াল, গম্বুজ ও চূড়া। মোগল আক্রমণ সত্ত্বেও সেকালের অপূর্ব স্থাপত্যকলার অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। অবশ্য এজন্য বোধকরি সমস্ত কৃতিত্বই দাবী করতে পারেন বৃন্দাবন-বন্ধু মিঃ গ্রাউস। তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ-মন্দিরের মতো এই মন্দিরটিরও যথাসাধ্য সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ জানাই মূলতানের ক্ষত্রিয় সওদাগর পুণ্যাত্মা রামদাস কাপুরকে। তিনিই শ্রীসনাতন গোস্বামীর আদেশে নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দির—সনাতনের পরমারাধ্য শ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির।

প্রবাদ আছে যে, কোন এক মাঘী শুক্লা-দ্বিতীয়াতে শ্রীসনাতন মথুরার জনৈক চৌবের বাড়ি থেকে মদনমোহনজীকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরমারাধ্যকে নিয়ে সনাতন এলেন এখানে—যমুনাতীরের এই দুঃশাসন-টিলার ওপরে। পশ্চিম দিকে সেই টিলার খানিকটা ভগ্ন অংশ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। শুনেছি সনাতন নাকি ওখানে দাঁড়িয়েই মহামতি আকবরকে ব্রজের অতুল সম্পদ প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন।

বিগ্রহপ্রাপ্তির পরে প্রভু সনাতন সেই টিলার ওপরে একটি পর্ণকুটিরে বাস করতে থাকলেন। তখন এদিকটা তো বটেই, বলতে গেলে সারা বৃন্দাবনই বনময়। মানুষই নেই, ভিক্ষা দেবে কে? কাজেই তাঁর খুব সামান্য মাধুকরী সংগ্রহ হত। দিনান্তে যে ময়দাটুকু পেতেন, সনাতন তা-ই আগুনে পুড়িয়ে রুটি বানিয়ে ভোগ দিতেন তাঁর মদনমোহনকে।

খাবারটা কিন্তু মোটেই পছন্দ হত না মদনমোহনের। তাই তিনি একদিন রাতে সনাতনকে স্বপ্ন দেখালেন, 'তুমি রোজ পোড়ারুটি খেতে দাও আমাকে। একটু নুন পর্যন্ত দাও না সঙ্গে। খেতে বড়ই বিস্বাদ লাগে। কাল থেকে রুটিতে অন্তত একটু নুন মিশিয়ে দিও।'

সনাতন কিন্তু এতে মোটেই লজ্জা পেলেন না। বরং রেগে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, আজ তুমি নুন চাইছো, কাল কাপড় ও গয়না চাইবে, পরশু হয়তো আরও কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কিন্তু আমি দরিদ্র বৈষ্ণব। আমি সে-সব পাব কোথায়? তবে একান্ত যদি তোমার 'রাজ-সেবা' পাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তুমি নিজেই তার ব্যবস্থা করে নাও না। তুমি তো সর্বশক্তিমান।'

এই ঘটনার কয়েকদিন বাদে একদিন সওদাগর রামদাস নৌকা-বোঝাই পণ্য নিয়ে দিল্লী থেকে আগ্রা যাচ্ছিলেন। দুঃশাসন-টিলার ঠিক সামনে এসে সহসা তাঁর নৌকা যমুনা চরায় আটকে গেল। তিনদিন ও তিনরাত ধরে শত চেষ্টা করেও নৌকা মুক্ত হল না। তখন স্থানীয় লোকদের পরামর্শে রামদাস এলেন এখানে—শ্রীসনাতনের কাছে। বললেন, 'ঠাকুর, আমাকে রক্ষা করুন।'

সব শুনে সনাতন বললেন, 'আমি রক্ষা করবার কে? আমি তো সেবকমাত্র। তার চেয়ে তুমি কুটিরের ভেতরে যাও, সেখানে মদনমোহন রয়েছে। তাকে গিয়ে সব বলো। সে ইচ্ছে করলে একটা উপায় করতে পারে।'

রামদাস তখন মদনমোহনকে তাঁর বিপদের কথা বললেন। তিনি তাঁর কৃপাভিক্ষা করলেন।

কিছুক্ষণ বাদে রামদাস দুঃশাসন-টিলা থেকে নেমে এলেন ঘাটে। আর এসেই সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর নৌকা চরা-মুক্ত হয়ে জলে ভাসছে। মদনমোহনের কৃপাধন্য রামদাস মহানন্দে আগ্রার পথে রওনা হলেন।

তার পরেও আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল—এগারো গুণ লাভে তিনি সেবার তাঁর সেই পণ্য বিক্রি করতে সক্ষম হলেন।

রামদাস ফিরে এলেন বৃন্দাবনে। হাজির হলেন শ্রীসনাতনের সামনে। তাঁকে প্রণাম করে মুনাফার সমস্ত টাকা একটি থলিতে করে সামনে রাখলেন। সনাতন গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমি অর্থ স্পর্শ করি না। তুমি এ থলি নিয়ে চলে যাও।'

রামদাস কিন্তু শুনলেন না সেকথা। প্রণামী গ্রহণের জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকলেন সনাতনকে। অবশেষে সনাতন বললেন, 'বেশ, তোমার যদি একান্তই মদনমোহনকে সেবা করার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে এখানে একটি মন্দির তৈরি করে দাও।'

এই সেই মন্দির—শ্রীরাধামদনমোহন জীউর মন্দির। পরধর্মদ্বেষী সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিধ্বস্ত মন্দির। রামদাস ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কেবল মন্দির নয়, নিচের ঐ বাঁধানো ঘাটটিও তাঁরই নির্মিত। শ্রীসনাতন গোস্বামীর পদরেণু-রঞ্জিত ঐ ঘাটটির নাম প্রস্কন্দন ঘাট।

প্রাচীন মন্দিরের পাশে আর একটি প্রাচীনতর ভগ্নমন্দির পড়ে আছে। রাজা বসন্ত রায়ের পিতা রাজা গুণানন্দ এই মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হয়ে যাবার পরে মদনমোহন কিছুকাল ঐ মন্দিরে সেবিত হয়েছেন।

প্রাচীন মন্দিরের পেছনেই প্রভু সনাতনের সমাধি। আমরা কীর্তন করতে করতে সেখানে এলাম। তমালবনাবৃত একটি পরম রমণীয় স্থান। আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে উৎসব হয় এখানে।

সহযাত্রীরা কীর্তন করছেন। কিন্তু আমি নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছি সমাধির দিকে। তাকিয়ে রয়েছি অপলক নয়নে। সেই সুমহান বৈষ্ণবাচার্যের নশ্বর দেহ এখানে পঞ্চভূতে মিশে গেছে বহুকাল। কিন্তু অমরের অমর আত্মা তো আজও বেঁচে আছে এখানকার আকাশে আর বাতাসে—শত সহস্র ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে।

অমর? হ্যাঁ, শ্রীসনাতন গোস্বামীর সংসারাশ্রমের নাম ছিল অমরদেব। তিনি ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। হুসেন শাহের দাবিরখাস বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অমর। তিনি কেবল মহাভাগবত ছিলেন না, ছিলেন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও বিদ্যায় সরস্বতী। আপন প্রতিভাবলে তিনি সুলতানের প্রধান অমাত্যপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ছোটভাই সন্তোষকে নিয়ে রামকেলিতে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করেন। আর তার পরেই তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তিনি রাজকার্য থেকে অবসর নিতে চান। কিন্তু হুসেন শাহ রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাঁকে অব্যাহতি দিতে রাজি হন না। পাছে অমর পালিয়ে যান, তাই তিনি তাঁকে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু পারেন না। অমর শেখ হবু নামে একজন কারাধ্যক্ষকে সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ দিয়ে কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই কাশীতে উপস্থিত হলেন তিনি। সাক্ষাৎ হল মহাপ্রভুর সঙ্গে। তিনি তখন বৃন্দাবন থেকে ফিরে চলেছেন। দরবেশ বেশধারী কপর্দকহীন অমরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি ভক্ত চন্দ্রশেখরকে বললেন, 'নাপিত ডেকে অমরের দাঁড়ি কামিয়ে দাও। গঙ্গাস্নান করিয়ে ওকে একখানি নতুন কাপড় পরতে দাও।'

সনাতন চন্দ্রশেখরকে বললেন, 'আমাকে আপনার একখানি পুরনো কাপড় দিন।'

তপন মিশ্র তাঁকে একখানি পুরনো কাপড় দিলেন। অমর তা দিয়ে দু'খানি বহির্বাস ও ডোর-কৌপিন তৈরি করে নিয়ে একখানি পরে নিলেন। অমরের মুক্ত বৈরাগ্য দর্শনে মহাপ্রভুর আনন্দ হল। কিন্তু তিনি তাঁর গায়ের ভোট কম্বলটির দিকে একবার তাকালেন। অমর বুঝতে পারলেন কম্বল গায়ে দেওয়া বিলাসিতা। তাই তিনি গঙ্গাস্নান করতে এসে একজন গৌড়ীয়াকে সেই ভোট কম্বলটি দিয়ে তাঁর কাঁথাটি নিজে নিলেন।

স্নান করে ফিরে আসার পরে প্রভু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ভোট কম্বল কোথায় ?'

অমর বললেন, 'যিনি আমার কুবিষয়-ভোগ খণ্ডন করেছেন, তাঁর ইচ্ছায় ও কৃপায় আমার শেষ বিষয়-রোগ দূর হল।'

প্রভু প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। নতুন নাম রাখলেন শ্রীসনাতন। তারপর তিনি সনাতনকে ধর্মশিক্ষা দিলেন। বললেন—

'জীবের স্বরূপ হয়, কৃষ্ণের নৃত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥'

দশাশ্বমেধঘাটে বসে ছু'মাস ধরে মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে শ্রীকৃষ্ণচরণকমল প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে উপদেশ দান করেন। এই উপদেশামৃত 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' নামে পরিচিত।

সবশেষে মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বললেন, 'তোমার ভাই শ্রীরূপকে (সন্তোষ) আমি প্রয়াগে বসে যে শ্রীকৃষ্ণরসের কথা বলেছি, তোমাকেও তাই বললাম। এখন তোমাকে আমি চারটি কাজের ভার দিচ্ছি—জগতে শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপন, মথুরামণ্ডলে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রকটন ও বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থ সঙ্কলন করে বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্তন ও প্রচার।'

বলা বাহুল্য সনাতন সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে-ছিলেন। আর তা করেছিলেন বলেই আমরা আজ এখানে—এই মধু-বৃন্দাবনে।

সনাতন কাশী থেকে বৃন্দাবনে রওনা হলেন। সন্তোষ এবং বল্লভ কিন্তু সনাতনের খোঁজে আগেই বৃন্দাবনে রওনা হয়ে-ছিলেন। প্রয়াগে তাঁদের সঙ্গে মহাপ্রভুর দেখা হয়েছিল। তিনি তখন বৃন্দাবন থেকে কাশী ফিরে যাচ্ছেন। মহাপ্রভু সেখানেই ছু'ভাইকে দীক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দান করলেন। নতুন নাম দিলেন —শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম। তারপরে ছু'ভাই দাদার খোঁজে বৃন্দাবনে এলেন। কিন্তু পেলেন না তাঁকে। পাবেন কেমন করে ? সনাতন তো তখন কাশীতে—মহাপ্রভুর কাছে ধর্মশিক্ষা করছেন।

যাই হোক্, দাদাকে বৃন্দাবনে না পেয়ে দু'ভাই রওনা হলেন নীলাচলের পথে। সনাতনও তখন বৃন্দাবন পথযাত্রী। কিন্তু পথে দেখা হল না তাঁদের।

সনাতন বৃন্দাবনে এলেন। মহাপ্রভুর আদেশ পালন করবার জন্য তিনি ব্রজমণ্ডলের বনে বনে, আর বৃন্দাবনের পথে পথে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

তারপরে সনাতন গিয়েছিলেন নীলাচলে। মিলিত হয়েছিলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে। কিন্তু সেকথা এখন নয়। প্রভুর নির্দেশে সনাতন অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে কাটিয়েছেন। তিনি লুপ্ত বৃন্দাবন প্রকট করেছেন। বলা বাহুল্য সেই কর্তব্য সম্পাদনে শ্রীরূপ এবং অন্যান্য গুরুভাইরা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথা পরে ভাবা যাবে, এখন সনাতনের কথা হোক্।

তিনি বৃন্দাবনে এসে মাধুকরী করে জীবনধারণ করেছেন। ব্রজবাসীরা তাঁকে বাবা বলে ডাকতেন। কথিত আছে, সম্রাট আকবর বৃন্দাবনে এসে তাঁর চরণ বন্দনা করেছিলেন। বলেছিলেন—'আমরা ধন্য, আমাদের ভাগ্যে এদেশে এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।'

সনাতন চারখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন—'ভাগবতামৃত', 'হরিভক্তিবিলাস', 'বৈষ্ণবতোষিণী' ও 'লীলাস্তবক'।

১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসনাতন দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর মহাপ্রয়াণ তিথি আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে ব্রজবাসীরা মুড়িয়া পূর্ণিমা বলেন। আজও তাঁরা এই তিথিতে মস্তক মুণ্ডন করে তাঁদের প্রিয় 'বাবা'র প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন।

সনাতন গোস্বামীর সমাধিস্থল থেকে আমরা এলাম শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দিরে। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীমধু পণ্ডিত এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে বংশীবটের তলে প্রকট হয়েছিলেন গোপীনাথ। শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী সেই বিগ্রহ পেয়ে মধু পণ্ডিতকে

নেন। মধু পণ্ডিত তখন বৃন্দাবনে স্থায়িভাবে বাস করতেন। তিনিই গোপীনাথের প্রথম সেবক। ভক্ত ভবানন্দ তাঁকে সেবাকার্যে সাহায্য করতেন।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বিরচিত 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে গোপীনাথ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'যস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথো দয়াম্বুধিঃ।
বংশীবটতটে শ্রীমদ্‌যমুনোপতটে শুভে॥'

—যমুনার তীরে মনোহর বংশীতটের তলে দয়ার সাগর গোপীনাথ প্রকট হয়েছিলেন।

রাজপুতনার শেখাওয়াত নিবাসী রায় শাগনজী ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথের প্রাচীন মন্দির নির্মাণ করে দেন। আমরা সেই ভগ্ন-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কীর্তন করছি। এটি সে-যুগে নির্মিত বৃন্দাবনের প্রাচীনতম মন্দির। গড়ন অনেকটা মদনমোহন মন্দিরের মতো। তবে তুলনায় অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রাউস সাহেব এ মন্দিরটিরও সংস্কার করেছিলেন। আর তাই হয়তো ভগ্ন দেবালয়টি এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

কীর্তন করতে করতে আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। প্রাচীন গোবিন্দ ও মদনমোহন মন্দিরের মতো এ মন্দিরেও শ্রীগৌরাঙ্গ পূজিত হচ্ছেন। রাধাগোপীনাথ রয়েছেন নতুন মন্দিরে। তবে সে মূর্তি মূল-বিগ্রহ নয়। বংশীবটের তলে যে বিগ্রহ প্রকট হয়েছিলেন, তাঁকে আওরঙ্গজেবের ভয়ে জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গোবিন্দ, মদনমোহন, রাধামাধব, রাধাদামোদর ও রাধাবিনোদের মতো সে বিগ্রহও আর বৃন্দাবনে ফিরিয়ে আনা হয় নি।

এবারে একটু মধু পণ্ডিতের কথা ভাবা যাক্। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্র যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখন অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মধু পণ্ডিতও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য যখন বৃন্দাবন থেকে ব্রজগোস্বামিগণের

রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ গাড়ি বোঝাই করে বাংলায় রওনা হচ্ছিলেন, তখন মধু পণ্ডিত তাঁর গলায় শ্রীগোপীনাথের প্রসাদী মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের ভাষায়—

'গিয়া গোপীনাথের করিলা সন্দর্শন।
কিবা সে অদ্ভুত ভঙ্গি ভুবনমোহন।...
শ্রীজীব শ্রীমধুপণ্ডিতাদি প্রতি কয়।
—শ্রীনিবাস-গমন নির্বিঘ্নে যেন হয়॥
শ্রীমধুমণ্ডিত গোপীনাথে জানাইল।
শ্রীনিবাসে প্রভু আজ্ঞা-মালা আনি দিল॥'

প্রাচীন মন্দিরের উত্তর দিকে নতুন গোপীনাথ মন্দির। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার বসু এই মন্দির নির্মাণ করে দেন। অন্যান্য মন্দিরে দেখেছি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। কিন্তু এখানে দেখছি শ্রীকৃষ্ণের ডাঁনদিকে শ্রীরাধিকা, বাঁয়ে জাহ্নবাদেবী। কথিত আছে, শ্রীগৌরদাস পণ্ডিতের দাদা শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যা ও শ্রীবীরভদ্রের স্ত্রী জাহ্নবাদেবী গোবর্ধন থেকে বৃন্দাবনে এসে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন মন্দির দর্শন করেন। তখন কোন মন্দিরেই রাধারাণীর মূর্তি ছিল না। দুঃখিত হয়ে তিনি কথাটা বললেন মধু পণ্ডিতকে।

এর কিছুদিন পরে মধু পণ্ডিত গেলেন বনবিষ্ণুপুরে। একদিন তিনি কথাটা বললেন বীর হাম্বীরকে। বীর হাম্বীর তখন তিনটি রাধারাণীর মূর্তি তৈরি করিয়ে দিলেন। মূর্তি তিনটি নিয়ে জাহ্নবাদেবী এলেন বৃন্দাবনে। তিনি গোবিন্দ ও মদনমোহনের বাঁদিকে রাধারাণীকে স্থাপন করে, এলেন এখানে—এই গোপীনাথ মন্দিরে। এখানে এসে তিনি শ্রীরাধিকাকে গোপীনাথের ডানদিকে স্থাপন করে নিজে তাঁর বাঁদিকে দাঁড়ালেন। সেই থেকে জাহ্নবাদেবী রয়েছেন এখানে—এই গোপীনাথ মন্দিরে।

গোপীনাথ মন্দির দর্শন করে আমরা চলেছি ইম্‌লিতলায়। সংকীর্তন চলছে একইভাবে। একইভাবে ব্রজবাসীরা অভিনন্দিত

করছেন আমাদের। কেউ বা সঙ্গী হচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইছেন—

'শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঁইর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥'

কিংবা—

'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥'

অথবা—

'শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সভার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করি মস্তক ভূষণ॥'

কীর্তন করতে করতে ইম্‌লিতলা মন্দিরের সামনে পৌঁছন গেল। পথের পাশে ছোট দরজা। ওপরে বাংলায় লেখা—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

ব্রজমণ্ডলের প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই এই নাম-কীর্তন বাংলায় লেখা আছে। বাঙালী সাধু ও ভক্ত ছড়িয়ে রয়েছেন সর্বত্র। অধিকাংশ ব্রজবাসীরা বাংলা বলতে ও বুঝতে পারেন। বাংলা যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাষা।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই ছোট একটি বাঁধানো আঙ্গিনা—মাঝখানে কুয়া, আর তিনদিকে ঘর। আঙ্গিনার ওপরটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা—বানরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যবস্থা।

আঙ্গিনা থেকে প্রসারিত হয়েছে একটি সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথ দিয়ে আমরা যমুনার তীরে ইম্‌লিতলায় পৌঁছলাম। 'ইম্‌লি' মানে তেঁতুল। যমুনার তীরে পাথর বাঁধানো একফালি প্রান্তরের

মধ্যস্থলে তেঁতুলগাছ। গাছের গোড়াটি শ্বেত-পাথর দিয়ে বাঁধানো একটি বেদীর মতো। তার ওপরে একজোড়া পায়ের ছাপ— মহাপ্রভুর চরণ-চিহ্ন। নিচে বাংলায় লেখা—

'প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলী-তলাতে আসি করিলা বিশ্রাম॥'

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁর মহাজীবনের মধ্যপর্বে নীলাচল থেকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে এসেছিলেন। নীলাচলে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, পুণ্ডরীক, হরিদাস, সার্বভৌম, রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল। তিনি তখন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সম্পূর্ণ করে পুরীর রথযাত্রা দর্শন করেছেন। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুকে দর্শন করে দেশে ফিরে গেছেন।

শ্রীচৈতন্য একদিন রামানন্দ ও সার্বভৌমের কাছে বৃন্দাবনে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রভুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে বলে তাঁরা নানা অজুহাতে তাঁর দেরি করিয়ে দিতে লাগলেন। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অবশেষে মহাপ্রভু দৃঢ়ভাবে তাঁর সংকল্পের কথা বললেন। তিনি বিজয়া দশমীর পরদিন পুরী থেকে বৃন্দাবনের পথে রওনা হলেন।

রামানন্দ, স্বরূপ ও গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁর সঙ্গে কটক পর্যন্ত এলেন। তিনি সেখান থেকে নৌকায় রওনা হলেন। পিছলদা, পানিহাটি, কুমারহট্ট ও ফুলিয়া হয়ে তিনি শান্তিপুর পৌঁছলেন। পথে প্রতিদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থী তাঁকে দর্শন করতেন। এবং শত শত ভক্ত তাঁর সঙ্গী হতেন। পুত্রবিচ্ছেদ-বিধুরা শচীমাতা শান্তিপুরে এসে গৌরের সঙ্গে দেখা করলেন।

অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হলেন। রামকেলি রাজধানী গৌড়নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। বাদশাহ হুসেন শাহ্ তাঁর আগমন-সংবাদ শুনে কাজী ও কোটালদের আদেশ দিলেন যে, কেউ যেন তাঁর ওপর কোন অত্যাচার না করে। তবে বাদশাহের হিন্দু সভাসদগণ অস্থিরমতি হুসেন শাহের আদেশকে

তেমন কোন মূল্য দিলেন না। তাঁরা গৌরকে রামকেলি ছেড়ে চলে যাবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু গৌর তাঁদের পরামর্শ অবহেলা করে সেখানেই এক তমালতলে আসন পাতলেন। তিনি যেন কারো প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। একদিন রাতে বাদশাহের সমর-সচিব ও প্রধান অমাত্য অমরদেব এবং তাঁর ছোট ভাই রাজস্ব-সচিব সন্তোষ এসে লুটিয়ে পড়লেন মহাপ্রভুর পায়ে। তৎকালীন বাংলার দু'জন শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি এসে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাভিক্ষা করলেন।

মহাপ্রভু তাঁদের আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আমি এখানে এসেছি। নইলে আমার গৌড়ে আসার কোন দরকার ছিল না। তোমরা বহু জন্ম যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছো। কৃষ্ণ খুব শীঘ্র তোমাদের উদ্ধার করবেন। এখন তোমরা ঘরে ফিরে যাও।'

ভবিষ্যতের শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ মহাপ্রভুকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। বিদায় বেলায় অমর শ্রীগৌরাঙ্গকে বললেন, 'প্রভু! তোমার সঙ্গে দেখছি বহুলোক জুটে গেছে। এত লোক সঙ্গে নিয়ে তীর্থযাত্রা ভাল হয় না। তাই নিবেদন করি, এবারে তুমি বৃন্দাবন না গিয়ে এখান থেকেই ফিরে যাও।'

মহাপ্রভু ভাবী-শিষ্যের সে অনুরোধ উপেক্ষা করেন নি। তিনি ফিরে গিয়েছিলেন শান্তিপুর এবং সেখান থেকে নীলাচলে।

পরের বছর শরৎকালে শ্রীগৌরাঙ্গ আবার রওনা হলেন বৃন্দাবনের পথে। শিষ্য ও ভক্তদের অনুরোধে তিনি বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে একজন ভক্তকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন। পাছে দর্শনার্থীদের ভিড়ে গতবারের মতো এবারেও যাত্রা নষ্ট হয়ে যায়, তাই তিনি রাজপথ ছেড়ে বনপথ ধরলেন। আশ্চর্য! বন্যজন্তুরা তাঁদের কিছুই বলল না। ঝাড়খণ্ড জঙ্গলের অশিক্ষিত আদিবাসীরা পর্যন্ত গৌরের কাছ থেকে কৃষ্ণনাম নিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হলেন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গৌর কাশী পৌঁছলেন। সেখানে

শ্রীতপন মিশ্রের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় তপন মিশ্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মহাপ্রভুর। তিনিই তখন তাঁকে কাশীতে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।

কাশীর পণ্ডিতগণ কিন্তু তাঁর সম্পর্কে নানা রকম কটূক্তি করলেন। তাঁদের কথা শুনে মহাপ্রভু শুধু হাসলেন, বললেন না কিছুই। কয়েকদিন বারাণসীধামে কাটিয়ে তিনি মথুরার পথে রওনা হলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মথুরা পৌঁছে বিশ্রামঘাটে বসে বিশ্রাম করলেন। কংসবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করেছিলেন যমুনার ঐ ঘাটে। তারপরে গৌর শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি দর্শন করলেন। মথুরার আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাঁর নৃত্য ও সংকীর্তনে মুগ্ধ হলেন।

মহাপ্রভু মথুরার সমস্ত তীর্থ দর্শন করলেন। স্নান করলেন চব্বিশ ঘাটে। তারপরে তিনি বের হলেন বনভ্রমণে। একে একে দর্শন করলেন—মধুবন, তালবন, কুমুদবন ও বহুলাবন। তিনি পথের গাছ-পালা ও লতা-পাতাকে আলিঙ্গন করে চলতে থাকলেন। পৌঁছলেন আরিটগ্রামে।

গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস করলেন রাধাকুণ্ডের কথা। কেউ তাঁর সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। কেমন করে পারবেন? তাঁরা যে কেউই লুপ্ত রাধাকুণ্ডের কথা জানতেন না। কিন্তু তাঁদের অজ্ঞতা মহাপ্রভুকে মোটেই বিচলিত করে তুলতে পারল না। তিনি ধানক্ষেতের মাঝে রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করে সেখানেই স্নান করলেন।

তারপরে গৌরাঙ্গ গেলেন গোবর্ধন শহরে। দর্শন করলেন হরিদেবের মন্দির। ইচ্ছে হল যতিপুরার গোপাল বিগ্রহ দর্শন করেন। কিন্তু যতিপুরা গিরিরাজ গোবর্ধনের ওপরে অবস্থিত। তিনি পুণ্যক্ষেত্র গোবর্ধন-গিরিতে আরোহণ করতে চাইলেন না। তাই গোবর্ধন শহরেই রয়ে গেলেন। পর্বত মহম্মদের কাছে গিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু গোপালদেব সত্যিই মহাপ্রভুর কাছে নেমে এসেছিলেন। সেদিন রাতেই যতিপুরায় খবর এলো,

মুসলমানরা গ্রাম আক্রমণ করবে। খবর পেয়ে সেবাইত গোপাল বিগ্রহ নিয়ে নেমে এলেন গাঁঠুলি গ্রামে—গোবর্ধন শহর থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে। মহাপ্রভু পরদিন সকালে গাঁঠুলি গিয়ে গোপাল-দেবকে দর্শন করলেন।

গোবর্ধন থেকে গৌর কাম্যবন দর্শন করে নন্দগ্রামে গেলেন। সেখান থেকে খদিরবন, শেষশায়ী, খেলনবন, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, শ্রীবন ও লৌহবন দর্শন করে তিনি গোকুল-মহাবনে পৌঁছলেন। তারপরে আবার মথুরায়।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তাঁকে দর্শন করতে হাজার হাজার লোক আসতে থাকলেন। অতিষ্ঠ হয়ে গৌর চলে গেলেন অক্রূরঘাটে। কিন্তু সেখানেও দর্শনার্থীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন না। অবশেষে একদিন সকালে গৌর পালিয়ে এলেন বনময় বৃন্দাবনে। চীরঘাটে স্নান করে তিনি এসে বসলেন এই ইম্‌লিতলায়। চারদিকে জনরব উঠল—'বৃন্দাবনে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হয়েছেন।'

আজ সেই পরমতীর্থে উপস্থিত হয়েছি আমি। কলির ভগবান এসে বসেছিলেন এই পুণ্যবৃক্ষতলে। সেদিনও এখানে দলে দলে মানুষ এসেছিলেন ছুটে। তাঁরা মহাপ্রভুর উপদেশ শুনতে চেয়েছিলেন। প্রভু তাঁদের নিরাশ করেন নি। প্রেমধর্মের অমৃতধারায় তিনি তাঁদের তৃষিত অন্তরকে সিঞ্চিত করেছিলেন।

এই সেই পুণ্যস্থান। এই তেঁতুলতলাতেই সেদিন প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব কৃষ্ণদাসের মিলন হয়েছিল। সমবেত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তিনি সেদিন এখানে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত নাম-সংকীর্তন করেছিলেন। তারপর ভক্তগণ প্রভুর চরণ-বন্দনা করলেন।

আমরাও সংকীর্তন শেষে মহাপ্রভুর চরণ-চিহ্নকে প্রণাম করি। মনে পড়ছে 'শ্রীবৃন্দাবন-লীলামৃতে'র সেই বাণী—

'কলিযুগে আসি কৃষ্ণ, চৈতন্য-রূপেতে।
অবতীর্ণ হৈলা রাধাভাব আস্বাদিতে॥

যেই কালে আইলা বৃন্দাবন-দরশনে।
বসিলেন তাঁহা পূর্ব রসাস্বাদ মনে॥'

মহাপ্রভুর মতে এটি একটি রাসস্থলী। তাই এই আম্‌লি বা ইম্‌লিতলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে 'শ্রীবৃন্দাবন-লীলামৃতে' বলা হয়েছে—

'একদিন কৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণ সঙ্গে।
বৃন্দাবন মাঝে রাসলীলা করে রঙ্গে॥ ··
চঞ্চল হইয়া কারে করে আলিঙ্গন।
কারো মুখে মুখ দিয়া করেন চুম্বন॥
ঐছে নৃত্যরসে কোন গোপিকার স্তনে।
ধরয়ে অত্যন্ত সুখে কর-পদ্মার্পণে॥
অতি রসকথা কহে কারো কর্ণমূলে।
কারো সনে নৃত্য করে অতি কুতূহলে॥
কারো কারো বস্ত্র সুখে করে আকর্ষণ।
যমুনা-পুলিনে কারে করয় রমণ॥'

শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক ব্রজবধূর সঙ্গে একইভাবে বিহার করছেন দেখে শ্রীরাধার অভিমান হল। অভিমানী রাধারাণী রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছেড়ে দূরে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন।

রাধাকে দেখতে না পেয়ে কৃষ্ণ ব্যাকুল হলেন। তিনি অন্য গোপীদের ফেলে রাধাকে খুঁজতে বেরুলেন। বার বার ডাকতে লাগলেন তাঁকে। বলতে থাকলেন, 'প্রাণপ্রিয়ে, দেখা দাও! তোমাকে ছাড়া যে আমার প্রাণধারণ অসম্ভব!'

কামশরে পীড়িত কৃষ্ণ রাধাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছলেন এখানে। আর্ত কৃষ্ণ—

'আম্‌লির তলে বসি কুঞ্জের ভিতরে।
রাধানাম-মন্ত্র জপে বিহ্বল অন্তরে॥
বিষাদ করিয়া পুনঃ কহিতে লাগিলা।
হা-হা প্রাণেশ্বরী! আমা ছাড়ি কাঁহা গেলা॥'

বিরহ-ব্যাকুল কৃষ্ণের সে ডাক শুনে রাধা আর লুকিয়ে থাকতে

পারলেন না। অভিমান ভুলে তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন এখানে—রাধা এলেন রাধারমণের কাছে। যমুনার তীরে এই ইম্‌লিতলায় রাধা-কৃষ্ণের মিলন হল।

এই সেই মিলনভূমি, আর ঐ সেই পুণ্যবৃক্ষ। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র ভাষায়—

'কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন শোভা দেখি নয়নে বহে নীর॥'

সেই কথাই লেখা আছে বেদীর ওপরে। মহাপ্রভুর মতো আমাদের চোখে জল ঝরছে না। তবে আমরাও পরম বিস্ময়ে বৃন্দাবনের শোভা দেখছি। আজও বৃন্দাবন তেমনি শোভাযুক্ত।

আর অপরিবর্তিত এই তেঁতুলগাছটি। কৃষ্ণলীলাকালের গাছ কিনা জানি না, কিন্তু মহাপ্রভু যে এই গাছের ছায়ায় এসে বসেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সেইটুকুই যথেষ্ট। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার, কি স্বয়ং ভগবান, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। কারণ, অবতার বা ভগবানকে আমি কখনও দেখি নি। জানি না তাঁরা কেমন? আমি মানুষ, দেখেছি মানুষকে। আমি জানি—যিনি মানুষের মাঝে পশুত্বের অবসান ঘটিয়ে তাকে প্রকৃত মানুষে উন্নীত করেন, তিনিই কৃষ্ণ—সর্বজীবের পরমগুরু। সেই নরনারায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত পবিত্রতীর্থ ইম্‌লিতলাকে প্রণাম করি।

॥ আট ॥

প্রসাদের পরে তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়েছিলাম। সেই শেষরাতে উঠেছি। তারপর থেকে একটানা পাঠ, কীর্তন, দর্শন ও পরিক্রমা চলেছে—প্রভূত পরিশ্রম হয়েছে। ঘণ্টাখানেক বাদেই আবার পাঠ শুরু হবে। আশা ছিল এই অবসরে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নেব।

কিন্তু সে আশা বুঝি-বা পূর্ণ হল না আর। বণিকপ্রভুর অবস্থা ভাল নয়। বার বার বাথরুমে যাচ্ছেন। বুঝতে পারছি, কাল রাতের সেই রাবড়ি খাওয়ার পরিণাম। তিনি কেবল যে স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন তাই নয়, সস্তায় সুস্বাদু বস্তু পেয়ে পরিমাণ-বোধটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু কথাটা বলতে পারলাম না তাঁর স্ত্রীকে। ভদ্রমহিলা স্বামীর শয্যাপ্রান্তে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়ানো ঠিক নয়।

বণিকপ্রভু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বাধ্য হয়ে উঠে বসতে হয় আমাকে।

বাক্স খুলে ওষুধ বের করি। বলি, “এটা খেয়ে নিন তো!”

স্ত্রী তাড়াতাড়ি বড়িগুলো নিয়ে স্বামীকে খাইয়ে দেন।

আমি তাঁকে বলি, “ভয় পাবেন না, উনি ভাল হয়ে যাবেন। তবে খাওয়া-দাওয়াটার দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। মানে এই দোকানের খাবার-টাবারগুলো… ..”

“খাই নি তো!” কথাটা শেষ করার আগেই বণিকপ্রভু প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন।

“না খেলে আপনার এ অবস্থা হল কেন?” চক্রবর্তী নীরবতা ভঙ্গ করে। সর্বনাশ করেছে! সে বোধহয় কুথাটা না বলে আর থাকতে পারে না। তাকে ইসারায় চুপ করতে বলি।

বণিকপ্রভু অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, "বিশ্বাস করুন প্রভুগণ, আমি রাবড়ি-টাবড়ি কিছুই খাই নি।"

চক্রবর্তী হাসে। আমাদেরও হাসি পাচ্ছে। তবু আমরা চুপ করে থাকি।

তেমনি ক্ষীণকণ্ঠে বণিকপ্রভু আবার বলেন, "কেন আজ আমার এ অবস্থা, জানেন?"

"কেন?" চক্রবর্তী সহাস্যে জিজ্ঞেস করে।

"আতপচাল। আতপচালের ভাত খাওয়ার জন্যই আমার এ অবস্থা।"

"কিন্তু বাড়িতে তো আমরা প্রায়ই আতপচাল খাই। আর এখানকার চাল যে তার চেয়ে অনেক ভাল।" তাঁর স্ত্রী প্রতিবাদ করেন।

"তুমি সব কথার মধ্যে কথা বলতে এসো না তো। আমি বলছি, আতপচালের জন্যই হয়েছে।" স্বামী রীতিমত ক্ষেপে গেছেন।

তাড়াতাড়ি সেনবাবু বলে ওঠেন, "আর শুধু আতপচালই বা বলছেন কেন? সঙ্গে যে-সব উপকরণ থাকে, তার প্রত্যেকটাই পেটের অসুখের পক্ষে যথেষ্ট।" সেনবাবু সবই জানেন, কেবল বণিকপ্রভুকে শান্ত করবার জন্যই বোধহয় তিনি বললেন কথাটা।

কিন্তু আশ্রমের অন্যতম শ্রেষ্ঠশিষ্য চেকারপ্রভু কথাটা হজম করতে পারেন না। সোচ্চার স্বরে বলে উঠলেন, "হোয়াট ডু ইউ মিন্?"

"আই মিন, হোয়াট আই সে।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন সেনবাবু।

"হোল্ড্ ইয়োর টাং!" চেকারপ্রভু রীতিমত ক্ষেপে গেছেন।

কিন্তু সেনবাবুও ভয় পাবার পাত্র নন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "ইফ্ আই ডু নট্?"

"আই শ্যাল রিপোর্ট দ্য ম্যাটার টু গুরুমহারাজ।"

"আই ওয়াণ্ট ছাট্। হি শুড্ বি ইনফরম্‌ড এ্যাবাউট দিজ মিসম্যানেজমেণ্ট্ এ্যাণ্ড ব্যাড্ বিহেবিয়ার।"

একে তো সেনবাবু সমানে ইংরেজীতে তর্ক করে চলেছেন, এটা চেকারপ্রভু মোটেই আশা করেন নি। তার ওপর তিনি একেবারে বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। আমাদেরও বিশ্বাস, নরেনপ্রভু ও তাঁর সহকারীদের দুর্ব্যবহার ও কার্পণ্যের কথা গুরুমহারাজ কিছুই জানেন না। এবং কোনভাবে কথাটা তাঁর কানে গেলে আমাদের ভালই হবে।

তাই বিপাকে পড়ে চেকারপ্রভু সেনবাবুকে ব্যক্তিগত আঘাত করেন, 'ইউ শুড্ নো, হাউ টু বিহেব উইথ এ জেণ্টে্লম্যান্!"

"ইয়েস, ইফ্ হি ইজ্?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন সেনবাবু।

"ডু ইউ নো, আই ওয়াজ অ্যান আর্মি অফ্সার?"

"নো। আই নিড্ নট্।"

আর বোধহয় ইংরেজী চালানো সমীচীন মনে করলেন না চেকারপ্রভু। তাই তিনি অতর্কিতে বাংলায় বলে ওঠেন, "আপনি জানেন, আপনার মতো কয়েক ডজন ক্লার্ক আমার আণ্ডারে কাজ করত?"

"না।" সেনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতে জবাব দেন, "আমি জানি, আপনি পয়সা নিয়ে বিনা টিকিটের যাত্রীদের ছেড়ে দিতেন।"

"আপনি আমাকে অপমান করছেন?"

সেনবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। বাইরের বারান্দায় কাউকে দেখে স্বাভাবিক স্বরে বলে উঠলেন, "আসুন, ভেতরে আসুন। এ ঘরেই আছেন।" তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন. "ঘোষবাবু, আপনাকে ডাকছেন!"

আমার বিছানা থেকে দরজার ওপাশটা দেখা যায় না। তাই তাড়াতাড়ি উঠে আসি। আর এসেই বিস্মিত হই—মানসী!

সে কি, মানসী একেবারে আশ্রমে চলে এসেছে। কোন দরকার থাকলে তো আমাকে ডেকে পাঠালেই পারত। ছিঃ ছিঃ! এরা সবাই কি ভাবছেন?

কিন্তু এখন আমার সে-সব ভাববার সময় নেই। চুপ করে থাকলে ব্যাপারটা আরও বিশ্রী হয়ে দাঁড়াবে। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "আরে, এসো এসো! ভেতরে এসো!"

"আসব বলেই তো এসেছি।" মানসী ভেতরে আসে। সঙ্গে সেই মেয়েটি। ওরা আমার বিছানার ওপরে বসে এসে।

কি বলব বুঝতে পারছি না। মানসী চারদিক চেয়ে কি যেন দেখছে। ঘরেব মাঝে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। কেবল চক্রবর্তী উসখুস করছে। চেকারপ্রভু কিন্তু নীরব। কে বলবে একটু আগেও তিনি অত চেঁচামেচি করছিলেন?

আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। তাই ঢোক গিলে প্রশ্ন করি, "কি ব্যাপার?"

"ব্যাপার একটা নিশ্চয়ই কিছু আছে!" মানসী নির্বিকার স্বরে উত্তর দেয়।

না, তার কথা বলার ঢং সেই একই রয়ে গেছে। কিন্তু ওর এই ঢংটা আমার কম-মেটদের কারো পছন্দ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তাঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। এমন কি কেউ কেউ আমার দিকেও তাকাচ্ছেন। তাই একটু হেসে ঘরের আবহাওয়াটা হাল্‌কা করতে চাই। হাল্‌কা স্বরেই মানসীকে বলি, "আমি সেই ব্যাপারটাই শুনতে চাইছি।"

"শুনলাম তোমাদের এখানে নিয়মিত ভাগবত পাঠ হচ্ছে। সকাল-সন্ধ্যায় তো সময় পাইনে, তাই এখন এলাম। তাছাড়া পাঠের পরে তোমাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।" মানসী উত্তর দেয়।

"কোথায়?' প্রশ্ন করি।

"আমার বাসায়।"

চক্রবর্তী হঠাৎ কেশে উঠল। মানসী কটমট করে তার দিকে তাকায়। চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়। মানসী আবার কিছু বলবে নাকি তাকে? বললে যে সেটা মোটেই সুখশ্রুত হবে না।

না, কিছু বলতে পারে না সে। ইতিমধ্যে নাট-মন্দিরে ঘণ্টা বেজে ওঠে। আমরা উঠে দাঁড়াই। মানসীকে সঙ্গে নিয়ে নেমে আসি নিচে। মন্দিরে প্রণাম করে উঠে আসি নাট-মন্দিরে।

মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করেন—

"এখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করব। এই চারটি অধ্যায়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন, যমলার্জুন ভঞ্জন, বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুর-বধ লীলার সঙ্গে পরিচিত হব।"

একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলতে আরম্ভ করেন, "মা যশোদা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালেব জননী। তাঁর কাছে তো তিনি চির-বাঁধা। সেই কথাই ভাগবতকার শ্রীশুকদেব নবম অধ্যায়ে বলেছেন মহারাজ পরীক্ষিৎকে।"

আবার থামেন মথুরা মহারাজ। একবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে থাকেন, "সেদিনটা ছিল কার্তিক মাসের এক সুন্দর সকাল। নন্দরাজ ইন্দ্রপূজা করতে গোবর্ধনে চলে গেছেন। দাস-দাসীরাও গেছে তাঁর সঙ্গে। তাই মা যশোদা নিজহাতে দধিমন্থন করছেন।

"শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। মা ছুটে এলেন তাঁর কাছে। পুত্রকে স্নেহক্ষরিত স্তনক্ষীর পান করাতে থাকলেন। একটু বাদে হঠাৎ দেখতে পেলেন, উনুনের ওপর দুগ্ধ উথ্‌লে পড়ছে। তিনি তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে কোল থেকে নামিয়ে ছুটে গেলেন সেখানে।

"অভিমানী গোপাল গেলেন রেগে। তিনি একখানি পাথর তুলে ঘরের এককোণে রাখা দধির হাঁড়ির ওপর ছুঁড়ে মারলেন।

হাঁড়ি ভেঙে গেল। ঘরময় দধি ছড়িয়ে পড়ল। খানিকটা ননি হাতে নিয়ে কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"মা ফিরে এলেন ঘরে। কৃষ্ণের কীর্তি দেখে তো তাঁর চক্ষু-স্থির। তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ একটা উদ্‌খলের উপর বসে বানরদের ননি খাওয়াচ্ছেন। তিনি লাঠি হাতে এগিয়ে চললেন। কৃষ্ণ তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে পালালেন। যশোদাও ছেলের পেছনে ছুটে চললেন। একসময়ে কৃষ্ণ ধরা দিলেন তাঁকে।

"লাঠি দেখে গোপাল ভয় পেয়েছেন ভেবে, নন্দরাণী লাঠিটা ফেলে দিলেন। মা ভাবলেন, দুষ্ট ছেলেকে বেঁধে রাখবেন। চিরকাল মায়েরা তাই চায়। মা যশোদা দড়ি দিয়ে অপরাধী পুত্রের কটিবন্ধন করতে চাইলেন। কিন্তু দেখলেন, দড়ি দু'আঙুল ছোট হচ্ছে। মা তখন সেই দড়ির সঙ্গে নিজের চুলের ফিতে জুড়ে আবার তাঁকে বাঁধতে চাইলেন। এবারেও দড়ি দু'আঙুল ছোট হল।

"ইতিমধ্যে গোপালকে দেখবার জন্য প্রতিবেশী কয়েকজন জননী সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। যশোদার অনুরোধে তাঁরা বাড়ির ভেতর থেকে আরও দড়ি নিয়ে এলেন। তবু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। দড়ি সেই দু'আঙুল ছোট রয়ে গেল। ঘরের সব দাড় দিয়েও মা যশোদা দু'আঙুলের জন্য গোপালকে বাঁধতে পারলেন না।

'কেমন করে বাঁধবেন? কেবল তো বাৎসল্য রস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধা যায় না? মায়ের ভালোবাসায় দু'আঙুল ফাঁক রয়ে গেছে যে! শুধু রাধার কাছে বাঁধা পড়বেন কৃষ্ণ। তাঁর ভালোবাসায় কোন ফাঁক থাকবে না। কিন্তু রাধার কথা এখন থাক্, এখন মা-যশোদার কথাই হোক্। হোক্ শিশু কৃষ্ণরূপী শ্রীভগবানের কথা।

"ভগবান আনন্দঘন বস্তু। সবাই আনন্দকে বাঁধতে চায়। ভক্ত আর ভগবানে দু'আঙুলের ব্যবধান। ভক্ত সাধনায় এক

আঙুল অগ্রসর হবেন, আর ভগবান করুণা করে এক আঙুলের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবেন। তাহলেই ভগবানের সঙ্গে ভক্তের হবে মিলন।

"যাই হোক্, মা যখন কিছুতেই গোপালকে বাঁধতে পারছেন না, তখন কৃষ্ণ নিজেই বাঁধা পড়লেন। তিনি ভক্ত-বাৎসল্য প্রদর্শনের জন্য বন্ধনদশা স্বীকার করে নিলেন।

"ভক্ত-বন্ধনে আবদ্ধ দামোদর মানবের মুক্তিদাতা। তাই ভক্ত-বৈষ্ণবের দামোদর ব্রত পালন।

"গোপালকে বেঁধে রেখে মা ঘরের কাজে চলে গেলেন। উদ্‌খলে বাঁধা কৃষ্ণ দেখলেন, আঙ্গিনায় একজোড়া অর্জুনবৃক্ষ। পূর্বজন্মে এঁরা কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত ছিলেন। প্রকাশ্য স্থানে উলঙ্গ হয়ে মাতলামি ও রমণী-রমণ করার জন্য নারদের অভিশাপে তাঁরা বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"ঘটনাটা বলুন না মহারাজ!" আসরের মাঝখান থেকে চক্রবর্তী হঠাৎ বলে ওঠে।

মথুরা মহারাজ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, "না, আজ নয়। বন-পরিক্রমার সময় আমরা দর্শন করব সেই পুণ্য লীলাভূমি। তখন বলব তাঁদের কথা। আজ কেবল মূল-কাহিনীটুকু বলছি।"

চক্রবর্তী মাথা নুইয়ে সম্মতি জানায়।

মথুরা মহারাজ আবার শুরু করলেন, "তারপরে উদ্‌খলে বাঁধা কৃষ্ণ ধীরে ধীরে সেই জোড়া-অর্জুনবৃক্ষের দিকে এগোতে থাকলেন। তিনি বৃক্ষদুটির ভেতর দিয়ে চলে গেলেন। উদ্‌খলটি বৃক্ষে বাধাপ্রাপ্ত হল। কৃষ্ণ তবু চললেন এগিয়ে। বৃক্ষদুটি উঠল কেঁপে—কেঁপে উঠল তাদের শাখা-প্রশাখা ও পত্রসকল। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে অর্জুনবৃক্ষ দুটি মাটিতে পড়ে গেল।

"দুটি বৃক্ষ থেকে দু'জন অগ্নিময় উজ্জ্বল পুরুষ বেরিয়ে এলেন। তাঁরা কৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করলেন। প্রার্থনা জানালেন, 'আমাদের মন যেন আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণেই সর্বদা ডুবে থাকে।'

"কৃষ্ণ তাঁদের বললেন, 'আজ তোমরা অভিশাপ-মুক্ত হলে। এখন তোমরা ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের আর সংসার-বন্ধনের জ্বালা সইতে হবে না।'

"নলকুবর ও মণিগ্রীব তখন শ্রীভগবানকে পরিক্রমা ও প্রণাম করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

থামলেন মথুরা মহারাজ। সামনে রাখা গ্লাশটি তুলে এক ঢোক জল পান করে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "এবারে আমরা একাদশ অধ্যায় পাঠ করব। এ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কংস কর্তৃক প্রেরিত বৎসাসুর ও বকাসুরকে বধ করেছেন।

"এই অধ্যায় থেকেই শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরকাল। তিনি বলরাম ও সখাদের সঙ্গে গোচারণ আরম্ভ করেন। আর এই অধ্যায়েই মহারাজ নন্দ গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে আসেন।

"নন্দরাজ তখন গোবর্ধনে ইন্দ্রপূজায় ব্যস্ত। এই সময় তিনি সেই অর্জুন বৃক্ষদুটি পড়ে যাবার শব্দ শুনলেন। ভাবলেন, গোকুলে বজ্রপাত হল। তাড়াতাড়ি তিনি ফিরে এলেন গোকুলে। এসে দেখেন অর্জুনবৃক্ষ দুটি মাটিতে পড়ে আছে। আর গোপাল উদ্‌খলে আবদ্ধ হয়ে বন্ধন-মুক্ত হবার চেষ্টা করছে। নন্দরাজ কৃষ্ণকে বন্ধন-মুক্ত করলেন, তাড়াতাড়ি তাঁকে কোলে তুলে নিলেন।

"এইভাবে দামবন্ধনলীলা শেষ হল। এই লীলায় ভগবানের প্রেম-অধীনতা আস্বাদন করার মতো। কেবল নন্দ-যশোদার নয়, পিতৃ ও মাতৃস্থানীয়া সমস্ত গোপ-গোপীরই তিনি প্রেমাধীন ছিলেন।

"এই ঘটনায় কিন্তু নন্দরাজ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি একদিন তাঁর বড় ভাই উপনন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, তাঁরা গোকুল ছেড়ে নন্দগ্রামে চলে যাবেন। নিকটেই বৃন্দাবন। সেখানে সুখসেব্য পর্বত আছে, সুন্দর সুন্দর তপোবন আছে। গোপ-গোপী ও গো-বৎসদের আদর্শ বাসভূমি বৃন্দাবন। উপরন্তু কংস সেখানে এমনভাবে তাঁর ঘাতকদের

পাঠাতে পারবেন না। গোপগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। নিজ নিজ শকটে করে তাঁরা বৃন্দাবনে রওনা হলেন।

"শ্রীবৃন্দাবন সর্বকালেই সুখাবহ। বৃন্দাবন চির-মধুময়। তাই গোপ-গোপীগণ গোকুল ছেড়ে নন্দগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করলেন।

"কিছুদিনের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণ বৎসপালক হয়ে উঠলেন। বাল্যলীলা শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ কৌমারলীলা আরম্ভ করলেন। একদিন তাঁরা যখন যমুনার তীরে বৎসচারণ করছেন, তখন গো-বৎসের চেহারা ধরে বৎসাসুর তাঁদের বধ করতে এলো। বলরাম ও সখাগণ তাকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু সে কৃষ্ণকে ফাঁকি দিতে পারল না।

"কৃষ্ণ ইশারায় বলরামকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। তারপরে যেন কিছুই জানেন না, এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি অসুরটার কাছে এসে অতর্কিতে তার লেজসহ পা দুটো ধরে ফেললেন। তাকে মাথার ওপর তুলে ঘোরাতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে কৃষ্ণ তাকে ছুঁড়ে মারলেন একটা কপিথ বৃক্ষের ওপরে। বৃক্ষটা পড়ল ভেঙে, আর তার তলায় চাপা পড়ে বৎসাসুর গেল মরে। মরবার সময় তার মায়ার আবরণ খুলে গেল।

"এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন গো-বৎসদের জল পান করাবার জন্য সখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ একটি জলাশয়ের ধারে এলেন। গো-বৎসদের জল পান করিয়ে, তাঁরা নিজেরাও জল পান করলেন। কিন্তু তারপরেই দেখলেন বিরাট একটা বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করতে আসছে। কোনপ্রকার বাধা দেবার আগেই সে তাঁকে গ্রাস করে ফেলল। সখাগণ অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

"কিন্তু বকাসুরের গলার কাছে পৌঁছে কৃষ্ণ অগ্নিময় রূপ ধারণ করলেন। সহ্য করতে না পেরে বকাসুর তাঁকে উদ্গার করে বাইরে ফেলে দিল।

"ক্রুদ্ধ বকাসুর কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে আবার

কৃষ্ণকে গিলতে এলো। এবারে কৃষ্ণ প্রস্তুত ছিলেন। বকাসুর তাঁর কাছে আসতেই তিনি তার সুবিরাট ঠোঁট দুটি দু'হাতে ধরে তাকে বিদীর্ণ করে ফেললেন। কাজটি তিনি এত সহজভাবে করলেন যেন, মনে হল তিনি একটি গ্রন্থিহীন তৃণকে দু'ভাগ করে ফেলছেন।

"গোপ বালকগণের জ্ঞান ফিরে এলো। তাঁরা কৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তাঁকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। তারপর কৃষ্ণকে নিয়ে সগৌরবে ফিরে এলেন বৃন্দাবনে। সকলের কাছে শ্রীকৃষ্ণের অসুর-নিধন কাহিনী বলতে লাগলেন।

"এখানেই দশম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় শেষ হল। এবারে আমি দ্বাদশ অধ্যায়ের কাহিনী বলে আজকের মতো পাঠ শেষ করব।" থামলেন মথুবা মহারাজ। আবার এক ঢোক জল পান করে বলতে শুরু করলেন—

"এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পূতনা ও বকাসুরের ভাই অঘাসুরকে বধ করেছেন।

"একদিন শ্রীকৃষ্ণ মহানন্দে ব্রজবালকদের সঙ্গে খেলা করছেন। এমন সময় অঘাসুর সেখানে এসে এক অতিকায় অজগরের রূপ ধারণ কবল। তার দেহ হল যোজন সমান দীর্ঘ, আব পাহাড়ের মতো উঁচু ও প্রশস্ত। সে হাঁ কবে পথের ওপর বসে রইল।

"গোপ বালকগণ ভাবলেন, এটা বৃন্দাবনেবই একটি অপূর্ব সুন্দর কন্দর। কৃষ্ণ সবই বুঝতে পাবলেন, কিন্তু তিনি সখাদের সাবধান করার অবকাশ পেলেন না। সখাগণ ততক্ষণে বৎসসহ সেই মহাসর্পের উদরে প্রবেশ করেছেন।

"অঘাসুর কিন্তু তাঁদের গ্রাস করল না। ভগ্নী ও ভ্রাতৃহন্তা কৃষ্ণকে তার চাই-ই! তাছাড়া কৃষ্ণকে মেরে ফেলার জন্যই কংস তাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছেন। তাই সে কৃষ্ণের অপেক্ষায় হাঁ করেই রইল।

"শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, বৎস ও সখাগণ তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছেন। একটু বাদেই তাঁরা সবাই মরে যাবেন। এখন

কি করা যায়? যেভাবেই হোক্, তাঁদের বাঁচাতে হবে। তিনি তাই নিজেও অঘাসুরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আর তার পরেই তিনি তাঁর দেহকে বিরাট থেকে বিরাটতর করে তুলতে লাগলেন।

"অঘাসুরের দম বন্ধ হয়ে এলো। তার চোখদুটি বেরিয়ে পড়ল বাইরে। সে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি শুরু করে দিল এবং একসময়ে সে মরে গেল।

"কিন্তু সেই সঙ্গে বৎসসহ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণও প্রাণত্যাগ করলেন। তখন তিনি নিজের অমৃতবর্ষী দৃষ্টি দ্বারা তাঁদের জীবন দান করলেন। তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়ালেন। সবাইকে নিয়ে ভগবান মুকুন্দ অঘাসুরের উদর থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন অঘাসুরের দেহ থেকে এক অপূর্ব জ্যোতি বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করল। অঘাসুরের আত্মা শ্রীকৃষ্ণে মিশে গেল। মুক্তিদাতা শ্রীহরি তাঁর হত্যাকারীকেও মুক্তিদান করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুকুন্দ বা মুক্তিদাতা নাম সার্থক হল।"

পাঠ শেষ হল। সবার সঙ্গে বেরিয়ে আসি বাইরে। একটু বাদে মানসী এসে আমার পাশে দাঁড়ায়। অনেকেই তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। আমি তাড়াতাড়ি বলি, "সত্যিই কি যেতে হবে আমাকে?"

"হ্যাঁ।" মানসী উত্তর দেয়।

"কখন?"

"কখন আবার, এখুনি!"

"কিন্তু একটু বাদেই যে সন্ধ্যারতি শুরু হবে, তারপরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ?"

"শোনা হবে না তোমার। শুধু তাই নয়, ফিরে আসতেও রাত হবে।"

"কেন?"

"একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ফিরবে।" মুক্তকণ্ঠে মানসী

বলে। চারপাশে পরিচিতদের ভিড়। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই তার।

প্রতিবাদ করা অর্থহীন। সে যা ঠিক করে এসেছে, তা সে করেই ছাড়বে। কাজেই বৃথা বাক্যব্যয় করে সহযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, গুরুমহারাজের কাছে আসি। প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে মানসীর সঙ্গে বেরিয়ে আসি আশ্রম থেকে। একটা টাঙ্গায় উঠি। টাঙ্গা ছুটে চলে মধু-বৃন্দাবনের পথে।

একটু বাদে কথা বলে মানসী, "চুপ করে আছো কেন? রাগ করেছো নাকি?"

হেসে বলি, "না, রাগ করব কেন? তবে নিজে না গিয়ে কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠালেই পারতে!"

"তাহলে যে তোমার মেস-লাইফটা দেখতে পেতাম না।" মানসী বলে।

"কেমন দেখলে?"

"ওখানে তোমার থাকা চলবে না। আমি কালই কৃপানন্দজীকে বলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের গেস্ট-হাউসে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দেব। যে ক'দিন বৃন্দাবনে আছো, সেখানেই থাকবে।"

"তা হয় না মানসী!"

"কেন?"

"কৃপানন্দজী আমাকে জানেন। তাঁর ওখানে গেলে আমার পবিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে, যেটা আমি এত কষ্টে গোপন রেখেছি।"

"গোপন রাখার কারণ?"

"আমি এঁদের মধ্যে থেকে এঁদের ভাল করে জানতে চাই। আমার লেখক-পরিচয়টা প্রকাশ হয়ে পড়লে এঁরা আমার সঙ্গে এমন মেপে ব্যবহার করবেন যে, আমি আর এঁদের জানতে পারব না।"

মানসী আমাব দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি এই পরিক্রমা নিয়ে বই লিখতে চাও?"

"ইচ্ছে আছে।"

কি যেন একটু ভাবে মানসী। তারপরে বলে, "বেশ, তাহলে এ ক'দিন আমার ওখানে থাকো।"

"আমি তো বলেছি তোমাকে, আমি এঁদের মধ্যে থেকে এঁদের ভালভাবে জানতে চাই!"

"তাই বলে তুমি এইভাবে এতগুলো লোকের সঙ্গে একটা ঘরে থাকবে?" একবার থামে সে। কিন্তু আমাকে নিরুত্তর দেখে আবার বলে, "বন-পরিক্রমার সময় সবাইকে কষ্ট করতে হয়। কিন্তু বৃন্দাবনের মতো জায়গা, যেখানে থাকা-খাওয়ার এত সুবিধে, সেখানে কে এমন কষ্ট করে?"

সহাস্যে বলি, "আমি জানি, কেন তুমি আজ আশ্রমে এসেছিলে?"

"কেন বলো তো?"

"আমি কেমনভাবে আছি, তা দেখার জন্যই তুমি আজ দুর্নামের ভয় ভুলে আমার ওখানে গিয়েছিলে।"

মানসী চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

কিশোরীটি কিন্তু মুচকি হাসছে। আমিও হেসে ফেলি। তাকে বলি, "ঠিক কিনা বলো?"

সে মাথা নাড়ে। মানসীও হেসে ফেলে এবারে।

আমি আবার বলি, "কিন্তু তুমি তো জানো মানসী, এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট সইবার অভ্যেস আমার আছে।"

"অভ্যেস থাকলেই যে অযথা কষ্ট করতে হবে, তার কি অর্থ আছে?"

"অর্থহীন কষ্ট কিন্তু আরও অনেকে করছে।"

মানসী নিরুত্তর।

আমি বলি, "পরমার্থকে পাবার জন্য তোমরা যদি এত কষ্ট করতে পারো, আমি কেন তোমাদের জন্য এটুকু করতে পারব না?"

মানসী তবু নিরুত্তর। আমিও আর কিছু বলি না, নীরবে তাকিয়ে থাকি পথের দিকে—বৃন্দাবনের পথ।

একটা গলির মুখে এসে থেমে যায় টাঙ্গা। গলিটা সরু—টাঙ্গা ভেতরে ঢুকবে না। ওদের সঙ্গে আমিও নেমে পড়ি। আমি টাকা বের করার আগেই মানসী ভাড়া মিটিয়ে দেয়।

সঙ্কীর্ণ গলির ভেতরে আসি। কয়েক পা এগিয়েই একটি কাঠের দরজা। ভেতরে ঢুকি—একফালি স্যাঁতসেঁতে উঠান। উঠান পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে আসি। মানসী দরজা খোলে। মাঝারী আকারের আধো-অন্ধকার ঘর। আসবাবপত্র বলতে একখানি খাট, একটি আলনা ও একখানা আয়না। ঘরের এককোণে রাখা গুটিতিনেক বাক্স। বাক্সের ওপরে স্তূপীকৃত বই। আর এককোণে ঠাকুরের আসন। বসে আছেন রাধা-কৃষ্ণ। ভারী সুন্দর মূর্তি। আমি প্রণাম করি।

মানসী মেয়েটিকে বলে, "খুকু, হাত-পা ধুয়ে পাঁড়ের দোকান থেকে একটু চা নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণে কাপড় ছেড়ে আসি।"

খুকু চলে যায়। মানসী আমাকে বলে, "এই বিছানার ভেতর থেকে কম্বলটা বের করে একটু পেতে নাও না! খালি চৌকির ওপর বসলে ঠাণ্ডা লাগবে তোমার। আমি বাইরের কাপড় না ছেড়ে বিছানা ধরব না।"

হাসি পায় আমার। বলি, "আমারও তো বাইরের জামা-কাপড়!"

"নাঃ, তোমার এই সবকিছু নিয়ে তর্ক করার অভ্যেসটা আজও যায় নি দেখছি! যা বললাম, তাই করো তো! আমি আসছি।"

চলে যায় মানসী। যেতে যেতে বলে, "ছেলেদের কাপড় ছাড়তে হয় না, ওগুলো মেয়েদের ব্যাপার। কাজেই তুমি নিশ্চিন্তে আমার বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করো।"

একটু বাদে মানসী ফিরে এলো। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুকু চা নিয়ে আসে। সে চা-য়ের গ্লাশটা আমার সামনে রেখে

আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মানসীকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি চা খাবে না ?"

"না।"

"কেন ?"

"আমি চা ছেড়ে দিয়েছি।"

"কারণ ?"

"জানি না যাও।" মানসী ধমক লাগায়।

নীরবে চা-য়ের গ্লাশটা হাতে নিই। মানসী তার ঠাকুর-আসনের সামনে গিয়ে বসে। প্রদীপ ধরিয়ে কয়েকটি ধূপকাঠি জ্বালায়। ধূপের স্নিগ্ধ সুবাসে ভরে যায় ঘর। তারপরে মানসী উঠে আসে কাছে। আমার পাশে এসে বসে। আমি নীরবে চা-যে চুমুক দিয়ে চলেছি। মানসী নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। আমি চা-য়ে শেষ চুমুক দিই। মানসী হাত বাড়িয়ে গ্লাশটা নেয়। নিঃশব্দে বাইরে চলে যায়।

একা আমি। ভেবে চলি সেই পুরনো কথা।

এই সেই মানসী। আমার হিমাচল-পরিক্রমার সাথী। শিক্ষিতা ধনীর দুলালী। দরিদ্র বিমলেন্দুকে ভালোবেসেছিল সে, বাবার অমতে বিয়ে করেছিল তাকে। কিন্তু স্নেহপরায়ণ পিতা মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে জামাইকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। মানসীর বাবার টাকায় বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে ফিরে এল বিমলেন্দু। কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে এল তার শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী মারিয়াকে।

মানসীর দাদারা বিমলেন্দুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। তাকে প্রতারণা করার অকাট্য প্রমাণ ছিল মানসীর কাছে। কিন্তু সেদিন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সবাইকে বিস্মিত করে মানসী বলেছিল, 'বিমলেন্দু শাস্তি পেলে তো আমার সমস্যার সমাধান হবে না হুজুর! মাঝখান থেকে মারিয়ার জীবনটা নষ্ট

হয়ে যাবে। তার জীবন নষ্ট করে দেবার কোন অধিকার নেই আমার। আর বিমলেন্দু আমার যত ক্ষতিই করে থাক্, তার কোন ক্ষতি হোক্ এ তো আমি চাইতে পারি না। তাকে যে আমি ভালোবেসেছিলাম, স্বামীরূপে বরণ করেছিলাম।'

বলা বাহুল্য, জজসাহেব তার সে আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। মানসী ফিবে পেয়েছিল বাবার পদবী। ফিরে এসেছিল বাবার বাড়িতে। দাদারা তার বিয়ের চেষ্টা কবেছিলেন, কিন্তু সে রাজী হয় নি। মানুষের প্রতারণা তাকে হিমালয়ের প্রতি আসক্ত করে তুলেছিল। সে প্রতি বছর একা একা হিমালয়ের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো। সেই সূত্রেই সে ছিল আমার অনুগত পাঠিকা।

সেবারে লাহুল-পরিক্রমা শেষ করে যখন মানালীতে ফিরে এলাম, তখন সেখানেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। নাগর, কুলু, মণিকরণ ও যোগিন্দরনগর হয়ে পাঠানকোটে ফিরে এলাম আমরা। সহসা মানসীর পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ এলো। দুঃসংবাদটা না জানিয়েই তাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলাম। তাড়াতাড়িতে, কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই মানসী সেদিন তার ঠিকানাটা দেয় নি আমাকে। স্বেচ্ছায় সে হারিয়ে গিয়েছিল আমার জীবন থেকে। সে চায় নি যে, কলকাতায় ফিরে আমাদের আবার দেখা হয়! কারণ, 'কলকাতা নাকি বড়ই কঠিন। আর, পথের পরিচয়কে পথে শেষ করে দেওয়াই ভাল।'

জানি না দু'বছর বাদে সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে মানসী কেন কাল আত্মপ্রকাশ করল? কেনই বা আজ এভাবে আমাকে তার ঘরে নিয়ে এলো?

মানসী ফিরে আসে। হাতে একখানি পাথরের থালা, তাতে কয়েক টুকরো ফল। ঘরের মেঝেতে থালাখানি রেখে আসন পেতে দেয় সে। তারপরে চেঁচিয়ে বলে, "খুকু, একগ্লাশ জল দিয়ে যা।"

মানসী এগিয়ে আসে আমার কাছে। বলে, "চট করে এই

ফলটুকু খেয়ে নাও। সেই কখন খেয়েছো, খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই ?"

হেসে বলি, "মোটেই না। কারণ, এত খিদে পেলে আশ্রমে থাকা যায় না। ওঁরা সকাল-বিকেল কিছুই খেতে দেন না।"

"জানি।" মানসী বলে, "তাই তো বলছিলাম, যে ক'টা দিন বৃন্দাবনে আছো, আমার এখানে এসে থাকো।"

আবার সেই অনুরোধ। নতুন করে বলার কিছুই নেই। আমি নীরবে খেয়ে যেতে থাকি। খুকু জল নিয়ে আসে।

খাওয়া শেষে আবার এসে চৌকিতে বসি। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। খুকু একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। মানসী বলে, "এই টাকাটা নিয়ে যা, একটু মিষ্টি নিয়ে আয়। তারপরে ময়দা মেখে উনুন ধরিয়ে ফেল্।"

আমি প্রতিবাদ করি, "আবার মিষ্টি কেন ?"

"আমি খাব।" মানসী উত্তর দেয়।

খুকু হেসে বাইরে চলে যায়। মানসী এসে আমার পাশে বসে। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তারপরে সে বলে, "শরীরটা তো একটুও ভাল হয় নি। সেই হাঁপানিটা কমেছে কি ?"

"ঠিক বলতে পারব না, তবে অনেকদিন থেকে টের পাচ্ছি না।"

"ঠাকুর আমাকে কৃপা করুন। বন-যাত্রার সময় যেন আবার দেখা না দেয়। সেবারে তবু আমি সঙ্গে ছিলাম।"

মানসী ঠিকই বলেছে। সেই রাতটির কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে আমার। মনে আছে, কারণ মানসীর কর্তব্যবোধ ও দুঃসাহসের কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

আমরা তখন কুলুর ট্যুরিস্ট-বাংলোয়। সেদিন রাতে শুয়ে পড়ার পর হঠাৎ আমার হাঁপানির টান উঠল। সঙ্গে কোন ওষুধ ছিল না। ছিল না অন্য কোন বন্ধু। মানসী সেই শীতের রাতে, অচেনা শহরের প্রায় মাইলখানেক নির্জন পথ পেরিয়ে একা আমার জন্য ওষুধ নিয়ে এসেছিল। সারারাত সে আমার শিয়রে বসে ছিল।

কিন্তু এখন সেকথা বলে কোন লাভ নেই। বরং তাতে সমূহ লোকসান। তাই বলি, "তারপরেও আমি দু'বার পর্বতাভিযানে গিয়েছি মানসী!"

"জানি।"

"কেমন করে?"

"আমি তোমার 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' পড়েছি।" একবার থামে সে। তারপরে বলে, "কিন্তু তখন তো তোমার সঙ্গে ডাক্তার স্বপন রায়চৌধুরী ছিলেন। ছিলেন অমূল্য সেনের মতো অভিজ্ঞ নেতা। এবারের বন-পরিক্রমায় যে তুমি একা!"

"তাই তো বলছিলাম," আমি হেসে বলি, "তুমিও চলো না আমার সঙ্গে, আমাকে তাহলে আর একা একা বন-পরিক্রমা করতে হবে না!"

"আমি গতবছর ব্রজবাসীদের সঙ্গে পরিক্রমা করে এসেছি।"

"দু'বার পবিক্রমা করায় কি কোন দোষ আছে?"

"আছে বৈকি, তাতে লেখকের সুনাম নষ্ট হতে পারে।"

"না। আমার সহযাত্রীরা কেউ আমার 'পেন নেম' জানেন না।"

"তাহলেও অসুবিধে আছে সখা। তুমি বন-পরিক্রমা করতে এসেছো একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি সঙ্গে থাকলে তোমার ক্ষতি হবে।"

হেসে বলি, "মানসী, আমার হিমাচল-পরিক্রমার সময় তুমি সঙ্গে ছিলে, কিন্তু তোমার উপস্থিতি আমার 'উত্তরস্যাং দিশি' রচনায় বাধা হয় নি। বরং তোমার কথা লিখেছি বলে পাঠক-পাঠিকারা আমাকে অভিনন্দিত করেছেন।"

"আমি কিন্তু তাঁদের মত মেনে নিতে পারলাম না সখা। আমার কি মনে হয়েছে জানো?"

"কি?"

মানসী উত্তর দেয়, "আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে তুমি হিমাচলের প্রতি অবিচার করেছো।"

"আমার কিন্তু ধারণা 'উত্তরস্যাং দিশি' আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।"

"আর আমি বোধকরি সর্বশ্রেষ্ঠ নায়িকা?"

"প্রিয়তমা তো বটেই।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই আমি।

মানসী নীরব।

একটু বাদে আবার বলি, "তাহলে তুমি আমার সঙ্গে পরিক্রমায় যাচ্ছো না?"

"আমি তো বলেছি সখা, তাতে তোমার অসুবিধে হবে।" উঠে দাঁড়ায় সে। আমি কিছু বলার আগেই বলে ওঠে, "এই রে! কথায় কথায় কত দেরি করে ফেললাম, তোমাকে আবার ফিরতে হবে। অনেক দেরি হয়ে যাবে যে! তুমি একটু বসো, আমি লুচি ক'খানা ভেজে নিয়ে আসি।" ব্যস্তভাবে মানসী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

আমি তাকিয়ে থাকি তার চলে-যাওয়া পথের দিকে। দু'বছরে মানসীর কিছু পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আজও সে তেমনি রহস্যময়ী রয়ে গেছে। নইলে যে মেয়ে আশ্রমে গিয়ে আমাকে এইভাবে ধরে নিয়ে আসতে পারে, সে কিনা আমার দুর্নাম হবে বলে বন-যাত্রায় যেতে চাইছে না! শুধু তাই নয়, আমাকে এখানে এনে রাখতেও তার অমত নেই, কেবল আমার সঙ্গে যাত্রায় যেতেই যত আপত্তি!

"কি পড়ছো, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত?" মানসীর প্রশ্নে চমকে উঠি। বই থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকাই। দু'হাতে খাবার নিয়ে মানসী ঘরে ঢুকেছে। পেছনে খুকু, তার হাতেও দুটি বাটি।

মানসী সেই যে রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল, আর এই ফিরে এলো। একা একা বসে থাকতে ভাল লাগছিল না বলে বইয়ের স্তূপ থেকে একখানি বই নিয়ে চোখ বোলাচ্ছিলাম। কয়েকখানি ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়া সবই ধর্মগ্রন্থ। 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'গীতা' ও 'ভাগবত' থেকে 'জৈবধর্ম' পর্যন্ত বহু বই রয়েছে মানসীর ঘরে। আর তার মধ্যে

আমার কয়েকখানি বইও স্থান পেয়েছে—এমন কি, আমার সর্বশেষ গ্রন্থ 'লীলাভূমি-লাহুল'ও আছে। এই বইখানি আমার তাকে উদ্দেশ করেই লেখা। লিখেছি—'মানসী, জানি না তুমি কোথায়? ...তোমার কাছে লেখা এই পত্রাবলী আমি তাই পাঠিয়ে দিলাম প্রকাশকের কাছে। জানি, এই পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হবার পরে তোমার হাতে পড়বেই।'

আমার সে আশা বিফল হয় নি। মানসী আজও আমার তেমনি অনুগত পাঠিকা। 'লীলাভূমি-লাহুল' সত্যিই ঠাঁই পেয়েছে মানসীর পুস্তক-সংগ্রহের মাঝে।

মানসী আবার বলে, "এবারে বই রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি বসে পড় তো! শীতকাল, সব জুড়িয়ে যাবে।"

নিঃশব্দে তার নির্দেশ পালন করি। মানসী খাবার দেয়। পদ ও পরিমাণ দেখে আঁতকে উঠি। বলি, "করেছো কি, তুমি কি চাও না যে, আমি বন-যাত্রায় অংশ নিই?"

"আমি না চাইলেই কি তুমি যাত্রা স্থগিত রাখবে? একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "তাছাড়া চাইব না-ই বা কেন? কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করবে তুমি। বিস্মৃতপ্রায় ব্রজমণ্ডলের কথা বাঙালীদের কাছে নতুনভাবে বলবে। এ আমার কত বড় গৌরব সখা!" আবার থামে মানসী। কি যেন একটু ভাবে। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠে, "আর কথা না বাড়িয়ে এবারে খেতে আরম্ভ করে দাও তো, সব জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

"যাক্। আমি এত খেতে পারব না।"

"খুব পারবে। আরম্ভ করেই দেখো না!"

"বেশ, করছি। কিন্তু তোমারটা কোথায়?"

"রাতে আমি দুধ ছাড়া আর কিছু খাই না।

আমি মুখ তুলে মানসীর মুখের দিকে তাকাই। সে মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করি, "এই কৃচ্ছ্রসাধনের কারণ কি? কৃষ্ণভক্তি?"

"না।" মানসী আমার চোখে চোখ রাখে। বলে, "আমার জীবন-দেবতার নির্দেশ।"

এর পরে আর কিছু বলার থাকতে পারে না। তাই নীরবে খাওয়ায় মনোনিবেশ করি। খাঁটি ঘিয়ের লুচি, আলু-কপির তরকারী, ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, টক, দুধ ও মিষ্টি। অনেকদিন এমন ভাল খাবার খাই নি। বিশেষ করে নরেনপ্রভুর খাদ্য-তালিকায় এ খাবার অমৃত সমান।

কিন্তু কেন? কেন আজ মানসী আমাকে এভাবে ধরে এনে এই সব রাজভোগ খাওয়াচ্ছে? সে-কথাই জিজ্ঞেস করি তাকে।

সে বলে, "বহুদিনের বাসনা, তোমাকে নিজ হাতে রেঁধে খাওয়াব। বৃন্দাবনচন্দ্র আজ আমাকে সেই সুযোগ দিলেন।"

চুপ করে থাকি, মানসীও নীরব। একটু বাদে আমি বলি, "তুমি কি রাতে কিছুই খাও না?"

"না। কেবল একাদশীর দিন ফল ও মিষ্টি খাই।"

"সেদিন তো আবার দিনে খাওয়া নেই?"

মানসী মাথা নাড়ে।

"অন্যদিন দিনে কি খাও?"

"সাধারণতঃ ভাত। খুকুটা যে আবার একদম রুটি খেতে পারে না। বাঙালের মেয়ে কিনা!"

"খুকুকে পেলে কোথায়, এখানে?"

"হ্যাঁ। পূর্ব-পাকিস্তানের গত দাঙ্গার সময় ওর বাবা-মা ভারতে পালিয়ে আসেন। অনেক জায়গায় ঘুরে অবশেষে তাঁরা বৃন্দাবনে এসে স্থায়ী হন। ওর বাবা একটা মন্দিরে কাজ পান। কয়েক বছর ভালই ছিলেন। তারপরে একদিন হঠাৎ সাতদিনের জ্বরে ওর বাবা মারা গেলেন। খুকুর তখন দশ বছর বয়স। অনেক চেষ্টা করে ওর মাকে সেই মন্দিরেই একটা কাজ যোগাড় করে দিয়েছি। আর খুকুকে নিয়ে এসেছি আমার কাছে।" মানসী থামে।

বলি, "ভালই হয়েছে।"

"তা হয়েছে বৈকি!" মানসী হাসে, "এখানে তো আমার কোন অভিভাবক নেই, খুকুই আমার সে অভাব পূরণ করেছে। তুমি রয়েছো বলে, নইলে এতক্ষণে কতবার যে সে আমাকে শাসন করত, তার ঠিক নেই।" কথা শেষ করে হাসতে থাকে মানসী।

খুকু ঘরে আসে। তার হাতে একগ্লাশ দুধ ও দুটি মিষ্টি। মিষ্টির প্লেটটা সে মানসীর দিকে এগিয়ে ধরে।

মানসী জিজ্ঞেস করে, "কি?"

"মিষ্টি।"

"তুই কি জানিস না আমি রাতে কিছু খাই না!"

"জানি। নাও তো, শিগ্‌গীর ধরো। চট করে খেয়ে নাও!"

আশ্চর্য, মানসী আর প্রতিবাদ করে না। সে হাত বাড়িয়ে প্লেটটা নেয়। তারপরে একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটি মিষ্টি মুখে দেয়।

প্লেটটা ফিরিয়ে দিয়ে খুকুকে বলে, "তোর পাল্লায় পড়েই আমার সর্বনাশ হবে।"

"হয় তো হবে!" খুকু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। তারপরে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে "আচ্ছা, আপনিই বলুন তো মামা, দুটো মিষ্টিকে কি কোন খাবার বলে? আর আমি তো তখুনি বলেছিলাম, হয় আমাকে রান্না করতে দাও, নইলে রাতে তোমাকে কিছু খেতে হবে।"

খুকু গ্লাশ ও প্লেট নিয়ে বাইরে চলে যায়।

ভাবি বৃন্দাবনচন্দ্রের কথা—সত্যিই তিনি করুণাময়। নইলে মানসীর ভাগ্যে এমন মেয়ে জুটবে কেন? যাক্, মানসী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কিন্তু খুকু মেয়ে। সে তো চিরকাল থাকতে পারবে না মানসীর কাছে, একদিন তার বিয়ে হয়ে যাবে। তখন?

সেই কথাই বলি তাকে। সে বলে, "ও চলে গেলে যে আমার কি উপায় হবে, আমি তা ভাবতেই পারি না সখা! তবু তোমাকে বলি, স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করলেই আমি ওর বিয়ে দেব। তখন আমাকে কিন্তু একটি ভাল ছেলে জোগাড় করে দিতে হবে। আমি ওর বিয়েতে হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করব।"

"পাঁচ হাজার!"

"হ্যাঁ, গয়না বাদ দিয়ে। তবে খুব ভাল ছেলে পেলে আর একটু বেশি খরচ করতেও রাজি আছি।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "বাবা আমাকে কিছু টাকা দিয়ে গেছেন। দাদাদের জন্য তো তার থেকে একটি পয়সাও খরচ করার উপায় নেই। আমার বৃন্দাবনের খরচ মাসিক একশো টাকা তারাই জুগিয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবছি, ওর ভাল বিয়ে দিতে পারলে, তবু বাবার টাকাটার একটা সদ্‌গতি হবে।"

"কিন্তু তোমার কি একশো টাকায় চলে যায়?"

"কেন চলবে না? দাদারা অবশ্য প্রত্যেক মাসেই মনি-অর্ডার কুপনের মধ্যে লেখে—'আরও টাকার প্রয়োজন হইলে জানাইও।' কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার তেমন প্রয়োজন হয় নি। কেন হবে বলো? একশো টাকা যে বৃন্দাবনে অনেক। বারো টাকা ঘর-ভাড়া দিই, দু'জনের খেতে গোটা সত্তর টাকা লাগে। বাকি টাকায় পুজো-পার্বণ ও মাধুকরী দেওয়া হয়ে যায়।"

"কাপড়-চোপড়?" প্রশ্ন করি।

"বৌদিরা নববর্ষ ও পুজোর সময় নিয়মিত পার্শেল পাঠিয়ে যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে খুকুর জামা-জুতো কিনতে হয়। তাহলেও মোটামুটি আমার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, অন্ততঃ বৃন্দাবনবাসীদের তুলনায়। খুবই শান্তিতে আছি। আর তোমাকে তো বলেছি সখা, এই শান্তির আশাতেই আমি বৃন্দাবনে এসেছি!" মানসীর স্বরে প্রশান্তি ঝরে পড়ছে।

॥ নয় ॥

"গতকাল আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-বধ লীলা শ্রবণ করেছি। তার পরের তিনটি অধ্যায়ে ভাগবতকার ব্রহ্মা কর্তৃক বৎস ও বৎসপালক হরণ এবং ধেনুকাসুর-বধের কথা বলেছেন। ধেনুকাসুরকে বধ করেছিলেন বলরাম। সেই লীলা হয়েছিল ভোজন-থালি ও তালবনে। বন-পরিক্রমার সময় আমরা লীলাস্থল দুটি দর্শন করব, তখন শ্রবণ করব সেই লীলাকাহিনী।"

একবার থামলেন মথুরা মহারাজ। যথারীতি প্রভাতী পাঠের আসর বসেছে। মথুরা মহারাজ আবাব বলতে থাকেন, "ষোড়শ অধ্যায়ে ভাগবতকার আমাদের কালীয়দমন লীলার কথা বলেছেন। গতকাল আমরা সেকথা শুনেছি।

"পবের অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দাবাগ্নি মোচন করে ব্রজবাসীদেব বক্ষা করেছেন। এই লীলা হয়েছিল দাবানলকুণ্ডে। পঞ্চক্রোশী, অর্থাৎ বৃন্দাবন-পরিক্রমাব সময় আমরা সেই কুণ্ড দর্শন করব।

"অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলবাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেন। তার পরের তিনটি অধ্যায়ে, অর্থাৎ উনবিংশ, বিংশ ও একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দাবাগ্নিপান, বৃন্দাবনের বর্ষা ও শরৎ ঋতু এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণু-গীতিব কথা বলেছেন। যে বাঁশরীর আকুল আহ্বানে ব্রজবালারা নিরন্তর উন্মনা ও উতলা হয়ে থাকতেন, যে তান-তরঙ্গিণী জড় প্রকৃতিকেও সজীব করে তুলত, যে মুরলী-রবে পদ্মবন হেসে উঠত, হরিণ-হরিণী চেয়ে রইত আর ময়ূর-ময়ূরী নাচতে থাকত—যে বংশীধ্বনি আজও ব্রজমণ্ডলের বনে-উপবনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে, ভাগবতকার সেই বেণু-গীতির কথাই বলেছেন।

"শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী লীলা বস্ত্রহরণ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণিত হয়েছে। সেই লীলা হয়েছিল চীরঘাটে। গোবিন্দঘাটের উত্তরে ও ভ্রমরঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত এই ঘাট। আপনারা জানেন, মহাপ্রভু বৃন্দাবনে এসে চীরঘাটে প্রথম স্নান করেছিলেন। কথিত আছে, কেশীদৈত্যকে বধ করার পরে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বিশ্রাম করেছিলেন। তাই চীরঘাটের আরেক নাম চয়ন বা চেইনঘাট

"কিন্তু চীরঘাটের প্রধান পরিচয়, সে শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলাস্থল। তাই আজও ঘাটের ওপরের কদম গাছটির নাম চীরকদম্ব। পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমার সময় আমরা সেই পুণ্য ঘাট দর্শন করব। এখন শুধু সেই পুণ্যলীলার কথা আলোচনা করা যাক্।"

একটু থেমে মথুরা মহারাজ আবার বলতে শুরু করেন—

"কৃষ্ণকে পাবার জন্য ব্রজকুমারীরা কাত্যায়নী পূজা আরম্ভ করলেন। একমাস ধরে কৃচ্ছ্রব্রত পালন করে তাঁরা প্রতিদিন ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নীর কাছে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার প্রার্থনা জানালেন। বললেন—'নন্দ-গোপসুতং দেবি, পতিং মে কুরু তে নমঃ।'

—নন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি করে দাও।

"একমাস পরে যেদিন তাঁদের কাত্যায়নী পূজা সাঙ্গ হল, সেদিন সর্বজীবের কর্মফলদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রতচারিণীদের ফলদানের জন্য চীরঘাটে উপস্থিত হলেন। আপনারা জানেন, চিত্ত বিশুদ্ধ হলেই ভগবান আবির্ভূত হন। কৃষ্ণভক্ত গোপীরা বিশুদ্ধ-চিত্তা হয়েছিলেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন।

"ব্রজবালাবা তখন যমুনায় স্নান করছিলেন। তাঁরা পরিধেয় তীরে রেখে বিবস্ত্রা হয়ে জলে নেমেছেন।

"কৃষ্ণ দেখলেন, ব্রজবালারা বিবসনা হয়ে জলকেলি করছেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁদের জামা-কাপড় নিয়ে সামনের কদম্বগাছে চড়ে বসলেন। তারপরে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তোমরা একসঙ্গে

কিংবা একজন একজন করে জল থেকে উঠে এসে আমার কাছ থেকে নিজ নিজ বস্ত্র নিয়ে যাও।'

"গোপীরা কৃষ্ণকে দেখে প্রেমে পরিপ্লুতা হলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ জল থেকে উঠতে পারলেন না।

"শ্রীকৃষ্ণ তখন গাছে বসে তাঁদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিলেন। এদিকে গোপীদের ততক্ষণে শীত করতে শুরু হয়েছে। তাঁরা শীতে কাঁপতে কাঁপতে কৃষ্ণকে বললেন 'হে প্রিয়তম, তুমি কেন এই অপ্রিয় কাজ করে নিন্দনীয় হচ্ছো? আমাদের শীত লাগছে, তুমি দয়া করে জামা-কাপড় দিয়ে দাও! না দিলে কিন্তু আমরা মহারাজ নন্দের কাছে তোমার এই কুকীর্তির কথা বলে দেব।'

"কৃষ্ণ হেসে বললেন, 'তিনি আমাকে এত ভালোবাসেন যে, কিছুই বলতে পারবেন না। আব তাছাড়া তোমরা যদি সত্যিই আমাকে পতিরূপে পেতে চাও, তাহলে তো আমার কাছে তোমাদের কোন লজ্জা থাকা উচিত নয়!'

"তখন গোপীগণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে উঠে এলেন। তাঁরা দু'হাতে নিজেদেব গোপন অঙ্গ আবৃত কবে কৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

"কৃষ্ণ বললেন, 'তোমবা ব্রতধারিণী হয়েও বিবস্ত্রা হয়ে স্নান করতে নেমে বরুণদেবকে অবহেলা করেছো। তাই তোমরা তাঁকে প্রণাম করে বস্ত্র গ্রহণ করো।'

"গোপীরা তাই করলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্তা গোপীদের বস্ত্রহরণ-লীলার রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে তোমরা আমাকে পতিরূপে কামনা কবেছো বলে আজ আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমার কাছে তোমাদের কোন লজ্জা থাকা উচিত নয়। কারণ, নিতান্ত আপনজনেব কাছে মানুষের কোন লজ্জা থাকে না।'

"গোপীগণ তখন মন থেকে লজ্জা ত্যাগ করে ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করলেন। কিন্তু চক্ষুলজ্জার জন্য প্রিয়তম

কৃষ্ণকে কাছে পেয়েও তাঁকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করতে পারলেন না।

"শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী। তিনি সবই জানতে পারলেন। তাই গোপীনাথ মৃদু হেসে বললেন, 'চক্ষুলজ্জাবশতঃ তোমরা মনো-বাসনা প্রকাশ না করলেও আমি তোমাদের মনের কথা জানতে পেরেছি। আগামী শারদ-পূর্ণিমায় আমি তোমাদের কামনা পূর্ণ করব। আজ তোমরা ঘরে ফিরে যাও।'

"কৃষ্ণানুগতা গোপীগণ তখন শ্রীকৃষ্ণের পদ-কমল ধ্যান করতে করতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরে ফিরে গেলেন।" থামলেন মথুরা মহারাজ।

তাহলে কি এখনকার মতো ভাগবত পাঠ শেষ হল? আমরা তাকাই মথুরা মহারাজের দিকে।

না। মথুরা মহারাজ আবার বলতে আরম্ভ করেছেন, "বস্ত্রহরণ-লীলার পরে শ্রীশুকদেব পরবর্তী ছয় অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎকে অন্নভিক্ষা, গোবর্ধন যজ্ঞ, ইন্দ্রের বারিবর্ষণ ও গোবর্ধন ধারণ, নন্দ-গোপ সংবাদ, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব এবং নন্দমোক্ষণ-লীলাকাহিনী বর্ণনা করেছেন। আগামীকাল ভাতরোল দর্শনের সময় আমরা অন্নভিক্ষা-লীলা শ্রবণ কবব। গোবর্ধন ধারণের কাহিনী শুনব গিরিরাজ গোবর্ধন-পরিক্রমার সময়ে।

"ভাগবতকার তারপরেই বলেছেন রাসলীলার কথা। রাস শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা। কিন্তু সেই লীলার কথা এখন নয়, এমন কি এখানেও নয়।"

"কোথায় মহারাজ?" সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে চক্রবর্তী।

"রাধা-কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসস্থলী বংশীবটের ছায়ায় বসে আমরা সেই অপূর্ব লীলাকাহিনী শ্রবণ করব।" উত্তর দেন মথুরা মহারাজ।

"আমরা তো আজই সেখানে যাচ্ছি?" চক্রবর্তী আবার প্রশ্ন করে।

মথুরা মহারাজ উত্তর দেন, "হ্যাঁ। আজই আমি আপনাদের বলব সেই অপরূপ লীলাকাহিনী।"

প্রণাম করে ভাগবতখানি বন্ধ করলেন মথুরা মহারাজ। বললেন, "এখন এই পর্যন্ত থাক্। এবারে দর্শনে যেতে হবে।" তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বেরিয়ে এলাম বাইরে। চললাম চা-য়ের দোকানে। সত্যিই শরীরের নাম মহাশয়। আজ মাত্র তিনদিন হল বৃন্দাবনে এসেছি। এরই মধ্যে খালি-পায়ে পাথুরে-পথ চলা অনেকটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে। জুতো নামক যে বস্তুটি আমাদের কলকাতার জীবনে অপরিহার্য, তার কথা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি।

দোকানের সামনে এসে দেখি অনেকেই এসে গেছেন আমার আগে। আর তাঁদেব মধ্যে জানকী এবং সস্ত্রীক শ্রীখাণ্ডাও রয়েছেন। আমি তাঁদেব পাশে বসি।

জানকী একটু হেসে চা-য়ে চুমুক দেয়। খাণ্ডাপ্রভু বলে ওঠেন, "ভালই হল, কাল থেকেই আপনার কথা ভাবছিলাম প্রভু।"

"কেন বলুন তো?" জিজ্ঞেস করি।

খাণ্ডা পাশে উপবিষ্টা স্ত্রীকে দেখিয়ে বলেন, "ইনি আপনাকে কি যেন একটা বলবেন।"

বিস্মিত হই। মিসেস খাণ্ডার সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয় নি। দর্শনের সময় অবশ্য রোজই তাঁকে দেখি। ভদ্রমহিলা বেশ ফিটফাট থাকেন। দেখতে-শুনতেও ভাল। তাঁকে খাণ্ডাপ্রভুর স্ত্রী বলে অনুমান করা কঠিন। স্বভাবতঃই কৌতূহল হয়েছে, তিনি কি শ্রীখাণ্ডার প্রথমা? কিন্তু কারও কাছে সেকথা জিজ্ঞেস করি নি।

মিসেস খাণ্ডা সোজাসুজি কথাটা পাড়লেন। আমাকে বললেন, "প্রভু, আমার একটা অনুবোধ রাখতে হবে আপনাকে।"

"কি বলুন তো?" আমার বিস্ময় বাড়ে।

"আপনার সঙ্গে ক্যামেরা আছে?"

অনুরোধটা অনুমান করতে পারছি। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে

একমাত্র আমিই ক্যামেরা এনেছি। অতএব অনুরোধ···। তবু না বোঝার ভান করতে হয়। বলি, "হ্যাঁ, আছে।"

মিসেস খাণ্ডা এবারে আসল কথাটি বলেন, "বন-পরিক্রমার সময়ে বড় কোন মন্দিরের সামনে আমাদের দু'জনের একখানি ছবি তুলে দিতে হবে।"

খুবই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব। ছেলে-পুলে ও ঘর-সংসার ছেড়ে পরিক্রমায় এসেছেন, একটা স্মৃতিচিহ্ন না নিয়ে গাঁয়ে ফিরবেন কেমন করে? কাজেই সহাস্যে বলি, "দেব।"

মিসেস খাণ্ডা খুশি হন।

আশ্রমে খোল-করতাল বেজে উঠেছে। কীর্তনের শব্দ ভেসে আসছে। তাড়াতাড়ি চা-য়ের দাম মিটিয়ে ছুটে চলি আশ্রমের দিকে।

শোভাযাত্রা সদর পেরিয়ে পথে নেমেছে। এসে যোগ দিই। গলা মেলাই সকলের সঙ্গে। জনৈক প্রাক্তন কর্ণেল কাল দিল্লী থেকে এসেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে বন-যাত্রায় যাবেন। ভদ্রলোক প্যান্ট-কোট পরেই শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছেন। ফলে সবারই নজর পড়ছে তাঁর দিকে।

গুরুমহারাজ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে থেমে গেল কীর্তন। যিনি যেখানে ছিলেন, সেখানেই শুয়ে পড়লেন। বৃন্দাবনের বাঁধানো পথ—ঘোড়ার মল-মূত্রে পরিপূর্ণ। তবু সহযাত্রীদের মতো সেই পথের ওপরেই লুটিয়ে পড়তে হয় আমাকে।

সবার সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়াই। গুরুমহারাজ ফিরে যাচ্ছেন আশ্রমে। তাঁর শরীরটা আজ ভাল নয়। কেবল নিয়মরক্ষার জন্য তিনি এইটুকু পথ আমাদের সঙ্গে এলেন। ফিরে যাবার সময় শিষ্যবর্গ ও ভক্তবৃন্দ প্রণাম করলেন তাঁকে।

প্রণাম, মানে দণ্ডবৎ। হ্যাঁ, এর আর শেষ নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তাকেই দণ্ডবৎ। যতবার দেখা হচ্ছে, ততবার দণ্ডবৎ। যেখানে দেখা হচ্ছে, সেখানেই দণ্ডবৎ। আর

গুরুমহারাজকে তো দেখতে না পেলেও দণ্ডবৎ করে। তিনি হয়তো দোর বন্ধ করে ঘরে বিশ্রাম করছেন, শিষ্য ও ভক্তরা বন্ধ-দুয়ারের সামনে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে দণ্ডবৎ করে যান।

প্রণাম এবং আশীর্বাদ সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু অন্যসব জিনিসের মতো সেটাও মাত্রাতিরিক্ত ভাল নয়। এঁদের এই দণ্ডবতের বহর দেখে আমার তাই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, এটা এখন একটা নেহাৎ লোক-দেখানো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে ভক্তি ও প্রীতির সম্পর্ক খুব বেশি নেই।

দণ্ডবৎ শেষে গুরুমহারাজ চলে গেলেন। আবার শুরু হল কীর্তন। আমরা এগিয়ে চলি। চলেছি বৃন্দাবনের পথে—শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে।

পথের ধারে ছোট মন্দির। গর্ভ-মন্দিরে শ্বেত-পাথরের রাধাদামোদর বিগ্রহ। পাশে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নযুক্ত গোবর্ধন-শিলা। কথিত আছে, শ্রীসনাতন এখানেই ঐ শিলাখণ্ড পেয়েছিলেন। প্রতি জন্মাষ্টমীতে পুণ্যার্থীদের দর্শনের জন্য এই গোবর্ধন-শিলা বাইরে বের করা হয়।

রাধাদামোদর শ্রীজীব গোস্বামীর সেবিত ঠাকুর। শ্রীরূপ গোস্বামী রাধাদামোদরের বিগ্রহ প্রকট করে শ্রীজীবকে দান করেছিলেন। কিন্তু সে বিগ্রহ এখন জয়পুরে। আওরঙ্গজেবের আক্রমণের সময়ে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আরও একটি কারণে এই পবিত্র স্থান বৃন্দাবনের ইতিহাসে সুচিহ্নিত। সেকালের অধিকাংশ গোস্বামী গ্রন্থসমূহ এখানে রচিত হয়েছে। কিন্তু আজ সেই মন্দিরের দুর্দশা দেখে চোখে জল আসছে। একেবারে জরাজীর্ণ। বৃন্দাবনের অধিকাংশ বাঙালী মন্দিরের এখন এই অবস্থা। এর প্রথম কারণ বঙ্গ-বিভাগ। এই সব মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল পূর্ববঙ্গে। সে আয় বন্ধ হয়ে গেছে দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু দেশের স্বাধীন সরকার মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা করেন

নি। দ্বিতীয় কারণ বাঙালী তীর্থযাত্রীদের উদাসীনতা। ভেট দিতে হবে বলে তাঁরা এ-সব মন্দির দর্শন না করেই চলে যান। অথচ ভেটের পরিমাণ খুবই কম। যেমন, রাধাদামোদর মন্দিরের ভেট মাত্র ছ' পয়সা। আর সে ভেট এই বাঙালী মন্দিরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। অবাঙালী তীর্থযাত্রীরা গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন রাধাবল্লভ ও রাধারমণ প্রভৃতি কয়েকটি ছাড়া আর কোন বাঙালী মন্দির বড় একটা দর্শন করেন না। কিন্তু তাতে তেমন কিছু এসে যায় না। কারণ, বৃন্দাবনে আজও বাঙালী তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা সমস্ত রাজ্যের সম্মিলিত তীর্থযাত্রীদের চেয়েও বেশি। কাজেই বাঙালীরা যদি একটু মুখ তুলে তাকান, তাহলেই বৃন্দাবনের বাঙালী মন্দিরগুলি বাঁচতে পারে। আর এই উদ্দেশ্যেই ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে আয়োজিত হয়েছিল নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ৪১তম অধিবেশন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, বাঙালী তীর্থযাত্রীরা আজও তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নন। আর তারই ফলে রাধাদামোদর মন্দিরের এই দুর্দশা।

অবহেলিত রাধাদামোদরকে প্রণাম করে আমরা বাইরে বেরিয়ে আসি। মন্দিরের সামনে কয়েকজন বৈষ্ণবাচার্যের সমাধিক্ষেত্র। শ্রীজীব গোস্বামীও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। আমরা সমাধিক্ষেত্র পরিক্রমা করি, আর মনে মনে বলি, 'হে মহাপুরুষগণ, তোমাদের শতকোটি প্রণাম। তোমরা লুপ্ত বৃন্দাবনকে প্রকট করেছো, প্রেমধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছো, বৈষ্ণব শাস্ত্রসমূহকে জগদ্বরেণ্য করে তুলেছো। তোমরা আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করো।'

সমাধিক্ষেত্র পরিক্রমা করে শ্রীজীব গোস্বামীর সমাধির সামনে এসে দাঁড়াই। শ্রীরূপ-সনাতনের ভাই অনুপমের ছেলে শ্রীজীব।

তিনি সম্ভবতঃ ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীজীব বিশ বছর বয়সে বৃন্দাবনে আসেন এবং বাকি জীবন এখানেই অতিবাহিত করেন। পঁচাশি বছর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেছেন।

এই তাঁর সমাধিক্ষেত্র। অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি সেই পুণ্যক্ষেত্রের দিকে। আর ভেবে চলি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রেমরত্ন-সাগর শ্রীজীব গোস্বামীর কথা।

শৈশব থেকেই শ্রীজীব শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। উচ্চশিক্ষার জন্য বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ থেকে নবদ্বীপে এলেন। তখন শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হয়েছেন। শ্রীজীব একদিন প্রভুর নাম কীর্তন করতে করতে অধীর হয়ে পড়লেন। সেদিন রাতেই তিনি স্বপ্নে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করলেন।

পরদিন তিনি ছুটে গেলেন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কাছে। তাঁর চরণে সমর্পণ করলেন নিজেকে। নিত্যানন্দ তাঁকে বৃন্দাবনে আসার আদেশ দিলেন। শ্রীজীব রওনা হলেন বৃন্দাবনের পথে। পৌঁছলেন কাশীতে। দেখা হল সর্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির সঙ্গে। তিনি কিছুকাল তাঁর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তারপরে এলেন বৃন্দাবনে—শ্রীরূপ-সনাতনের কাছে। তাঁদের কাছে তিনি ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন।

কিছুকালের মধ্যেই শ্রীজীব বৈষ্ণব-সমাজের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে সুপরিচিত হলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচার দেখে রূপ-সনাতন এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাকে দিয়ে তাঁদের গ্রন্থাদি শোধন করিয়ে নিতেন।

শ্রীজীব কেবল পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি একজন সুলেখক। পঁচিশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর 'গোপালচম্পূ' ও 'ষটসন্দর্ভ' প্রভৃতি গ্রন্থ ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। শ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য। তাঁরাই বৃন্দাবন থেকে গ্রন্থের গাড়ি নিয়ে নবদ্বীপে রওনা হন। পথে বীর হাম্বীর সেই গাড়ি লুঠ করেন। খবর পেয়ে রঘুনাথ দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীও অধীর হয়ে উঠলেন। পরে গ্রন্থ-প্রাপ্তির সংবাদ শুনে তিনি সুস্থ হলেন।

না, শ্রীজীব গোস্বামীর কথা চিন্তা করার আর অবকাশ নেই। এবারে তাঁর গুণকীর্তন করতে হবে। কেষ্টপ্রভু গলা ছেড়ে গান ধরেছেন—

'শ্রীজীব গোসাঞি মোর প্রেমরত্ন-সাগর
ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে।
মুঞি ত পামর জনে বড় সাধ করি মনে
তুয়া গুণ গাইবার তরে॥'

অতএব সবার সঙ্গে গলা মেলাতে হয় আমাকে। আমিও কীর্তন করতে করতে চলেছি এগিয়ে। চলেছি শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনকুটি ও সমাধিস্থল দর্শন করতে।

ছায়াঘেরা মনোরম পথ দিয়ে খানিকটা হেঁটে পৌঁছলাম শ্রীরূপের সমাধিস্থলে—তমাল গাছে ছাওয়া এক পরম রমণীয় কুঞ্জবনে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনকে উদাস করে তুলছে। আমি আমার অন্তরের অন্তস্তলে সেই সর্বত্যাগী সুমহান সাধকের অস্তিত্ব অনুভব করছি।

কে বলে তিনি নেই? তিনি আছেন। আছেন আমাতে আর তোমাতে। আছেন সর্বকালের প্রতিটি ভক্ত-প্রেমিকের হৃদয়ে। ব্রজপ্রেম-মহানিধির কুঠরিরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী। রাধা-কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য যার রূপ-মাধুরীতে বিলীন হয়ে যায়, তিনিই রূপ গোস্বামী। তাই কৃষ্ণ-প্রিয় তমাল গাছে ছাওয়া এই পুণ্যতীর্থের এককণা ধুলি প্রেমিককে কৃষ্ণে রূপান্তরিত করে।

আমি তাঁরই কথা ভেবে চলি। শ্রীকৃষ্ণ নয়, শ্রীরূপের কথা—

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতে রূপ গোস্বামী ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাইশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছেন। তিপ্পান্ন বছর ব্রজমণ্ডলে অতিবাহিত করার পরে পঁচাত্তর বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন। সেই মৃত্যুহীন মহামানবের মরদেহ শায়িত রয়েছে এখানে—আমার সামনে ঐ সমাধি-মন্দিরে। আমরা তাই তাঁর গুণ-কীর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁরই করুণা-ভিক্ষা করছি। বলছি—

'আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে যেন আর নাই॥

* * *

শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত, নিজ গ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি॥'

রামকেলি থেকে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে ফিরে গেলেন। কিন্তু রূপ, সনাতন ও অনুপম আর রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কাজে মনোনিবেশ করতে পারলেন না। কেমন করে করবেন? মহাপ্রভু যে তাঁদের মন তিনটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।

পড়ে রইল অতুল ঐশ্বর্য, বিপুল বৈভব আর রাজকীয় সম্মান। তাঁরা হলেন সর্বত্যাগী সাধক, সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।

কিন্তু সুলতান হুসেনশাহ তাঁদের সহজে ছাড়তে চাইলেন না। তাঁরা চলে গেলে যে তাঁর রাজ্য যাবে! তিনি সর্বশক্তি দিয়ে বাঁধতে চাইলেন তাঁদের। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ হয়েছে যাঁদের সকল সত্তা, যাঁদের মন-প্রাণ পার্থিব আকর্ষণ-মুক্ত, সুলতানের সাধ্য কি তাঁদের বেঁধে রাখেন?

রূপ ও অনুপম সুযোগ মতো পালিয়ে এলেন গৌড় থেকে। কিন্তু পালাতে পারলেন না সনাতন। সুলতান তাঁকে বন্দী করলেন। রূপ খবর পেলেন মহাপ্রভু বৃন্দাবনে চলে গেছেন। তিনি সনাতনকে চিঠি লিখে সেকথা জানালেন। লিখলেন, 'অনুপমকে নিয়ে আমি বৃন্দাবনের পথে রওনা হলাম। যেভাবেই হোক্ মুক্ত হয়ে আপনিও বৃন্দাবনে চলে আসুন।'

সনাতন কনিষ্ঠের পরামর্শ মতই কাজ করেছিলেন। কিন্তু সেকথা বলা হয়েছে আমার। এখন আমি শুধু রূপ গোস্বামীর কথা ভেবে চলি। অনুপমকে নিয়ে রূপ পৌঁছলেন প্রয়াগে। দেখা

হল মহাপ্রভুর সঙ্গে। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা পূর্ণ করে তিনি তখন ফিরে চলেছেন নীলাচলে।

প্রভু রূপের কাছে সনাতনের সংবাদ জানতে চাইলেন। সব শুনে তিনি রূপকে বললেন, 'সনাতনের বন্ধন মোচন হয়েছে। সে শীঘ্রই আমার সঙ্গে মিলিত হবে।'

বলা বাহুল্য, প্রভুর সে বাণী সত্য হয়েছিল। সনাতন তখন কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনিও পাড়ি জমিয়েছেন বৃন্দাবনের পথে। আর, প্রভু রূপকে শিক্ষাদান শেষ করে প্রয়াগ থেকে যখন কাশীতে পৌঁছেছিলেন, তখনই সনাতন মিলিত হয়েছিলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে। কিন্তু সনাতনের কথা থাক্, শ্রীরূপের কথা ভাবা যাক্। আমি যে তাঁরই সমাধির সামনে রয়েছি দাঁড়িয়ে।

প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাগবত-সিদ্ধান্তসমূহ শিক্ষাদান করলেন। বললেন, 'ভক্তিরস-সিন্ধু পারাপারশূন্য ও গভীর। আমি তোমাকে কেবল তার বিন্দুমাত্র বর্ণন করছি।'

সেই বিন্দুই পরবর্তীকালে সিন্ধুতে পরিণত হয়েছিল।

শিক্ষা শেষে রূপ অনুপমকে নিয়ে প্রয়োগ থেকে বৃন্দাবনে এলেন। একমাস বৃন্দাবনে বাস করেও যখন দেখলেন সনাতন পৌঁছলেন না, তখন দু'ভাই যমুনার তীর ধরে আবার প্রয়াগে চললেন। আর, সনাতন তখন রাজপথ দিয়ে বৃন্দাবনে আসছেন। কাজেই, ভাইদের সঙ্গে পথে দেখা হল না তাঁর।

রূপ ও অনুপম কাশীতে এসে তপন মিশ্রের কাছে সনাতনের খবর পেলেন। শুনলেন, মহাপ্রভুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সনাতন বৃন্দাবনে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তখন আর বৃন্দাবনে এলেন না। রওনা হলেন গৌড়দেশে। দুর্ভাগ্যের কথা, সেখানে পৌঁছে অনুপম শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অনুপম শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। তাঁর বালকপুত্র শ্রীজীব পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করলেন। শ্রীরূপ তাঁকে আশীর্বাদ করে চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগী হলেন।

অনুপমের শোকে কাতর রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুকে দর্শন করতে নীলাচলে চলে গেলেন। দেখা হল প্রভু ও তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে। নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য ও হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন শ্রীরূপ।

কিছুদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। একদিন তিনি তাই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যকে বললেন, 'তোমরা রূপকে আশীর্বাদ কর। তোমাদের কৃপায়, সে যেন জগতে কৃষ্ণরসভক্তি প্রচার করতে পারে।' বললেন, 'তোমরা কৃপা করে তাকে বর প্রদান কর, সে যেন নিরন্তর ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণন করতে পারে। এর বড় ভাই সনাতন বিশ্বের বিজ্ঞতম ব্যক্তি। আমি তাকেও লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করার জন্য বৃন্দাবনে পাঠিয়েছি।'

তারপরে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে এসে ভক্তিরসশাস্ত্র রচনা, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির স্থাপন এবং অপ্রাকৃত ভক্তিরস প্রচারের আদেশ করলেন।

বলা বাহুল্য, রূপ-সনাতন অক্ষরে অক্ষরে প্রভুর আদেশ পালন করেছিলেন। আর তা করেছিলেন বলেই আমি আজ এখানে— শ্রীধাম বৃন্দাবনে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

'দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈলা।
প্রভুর যে আজ্ঞা, দুঁহে সব নির্বাহিলা॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা॥'

"বসে পড় হে, বসে পড়।" চক্রবর্তী আমার কাঁধে হাত দেয়। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। আমার সহযাত্রীরা রূপ গোস্বামীর সমাধি-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কীর্তন করছিলেন, আর আমি ভাব-ছিলাম শ্রীরূপের কথা। এখন কীর্তন থেমে গেছে। মথুরা মহারাজ সবাইকে বসে পড়তে আদেশ করেছেন। চক্রবর্তী তাই আমাকে বসতে বলছে। আমি শ্রীরূপের ভাবনা ছেড়ে চক্রবর্তীর নির্দেশ পালন করি।

কিন্তু এঁরা কীর্তন থামালেম কেন? গত দু'দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা হয়েছে, পরিক্রমাকালে কখনও কীর্তন থামাতে নেই। তাই কানে কানে চক্রবর্তীকে কথাটা জিজ্ঞেস করি। সে ধমক লাগায়, "কথা বলো না, দেখছো না সবাই ধ্যান করছেন!"

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারি। এবারে শ্রীরূপের ধ্যান করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে তাঁর আশীর্বাদ। তাই কীর্তন বন্ধ করে সবাই চোখ বুজে চুপচাপ বসে আছেন।

কিন্তু আমি তো এতক্ষণ শ্রীরূপকে স্মরণ ও মনন করেছি। আমার এ পালা সাঙ্গ হয়েছে। অতএব আমি চোখ মেলে চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখি। সমাধি-মন্দিরটি লাল পাথরে নির্মিত। ভজনকুটি ইটের তৈরি, তবে মেঝেটা শ্বেত-পাথরে বাঁধানো। শ্রাবণী শুক্লা-দ্বাদশীতে উৎসব হয় এখানে। কুটিরের সামনে মাটির উঠান—তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। মাথার ওপরে তমালের ছায়া। তমালতলে বসে রয়েছি আমরা।

ধ্যান শেষ হল। আবার শুরু হল কীর্তন—

'হৃদয়-কন্দরে যার ঝরিয়াছে একবার
শ্রীরূপের কবিতার রসের নির্ঝর।
অমৃতের পারাবার তার কাছে কোন ছার
সুধাংশুর সুধাসার সুমধুর কর
সুধীর বসন্তবায়ু মকরন্দ-হর॥

সহসা নজর পড়ে ওঁদের দিকে। জনৈকা আধুনিকা একটি ছোট ছেলে ও একজন সুবেশ যুবকের সঙ্গে এসে দাঁড়ালেন আমাদের পেছনে। তাঁরা কীর্তন শুনতে থাকলেন। ওঁরা বাংলা জানেন কি? দেখে তো মনে হচ্ছে দক্ষিণ ভারতীয়। ওঁরা তাহলে কি শুনছেন অমন করে?

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে মা ছেলেটির কানে কানে কি যেন বললেন। ছেলেটি গুটি-গুটি এগিয়ে আসে আমাদের কাছে। ঠেলে-ঠুলে একেবারে গিয়ে উপস্থিত হয় সমাধিক্ষেত্রের সামনে।

ছোট্ট মাথাটি মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করে শ্রীরূপকে। তারপরে সমাধিক্ষেত্রের কাছ থেকে তার ছোট-ছোট হাত দুটি ভরে খানিকটা মাটি তুলে নেয়। অঞ্জলি ভরে রূপ গোস্বামীর সমাধিক্ষেত্রের ধূলি নিয়ে সে আবার তেমনি করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে বাইরে। বাবা রুমাল বের করে ছেলের সামনে ধরেন। ছেলে সেই রুমালের ওপরে ব্রজরজঃ ঢেলে দেয়।

গরবিনী মা সস্নেহে কোলে তুলে নেন ছেলেকে। ভদ্রলোক নিজে একটু রজঃ মুখে দিয়ে খানিকটা স্ত্রী ও ছেলেকে খাইয়ে দিলেন। বাকিটুকু পরম শ্রদ্ধাভরে রুমালে বেঁধে নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে সমাধিস্থল ত্যাগ করলেন। তাকিয়ে থাকি তাঁদের দিকে, আর ভাবি সেই পুরানো কথা—এই পুণ্যতীর্থের এককণা ধূলি প্রেমিককে কৃষ্ণে রূপান্তরিত করে। আমিও তাড়াতাড়ি খানিকটা ধূলি হাতে তুলে নিই।

শ্রীরূপ গোস্বামীর সমাধিস্থল থেকে আমরা এলাম শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সমাধিক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য এবং শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সতীর্থ। তাঁরা ছিলেন তৎকালীন গোস্বামী ও আচার্যগণের শ্রদ্ধার পাত্র। বয়সে বড় এবং ভজনেও প্রবীন ছিলেন। কিন্তু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' তাঁদের উল্লেখ নেই। কারণ, তাঁরা ছিলেন আত্মপ্রচারে বিমুখ। তাঁরা কবিরাজ গোস্বামীকে তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে নিষেধ করেছিলেন। তাই কবি কৃষ্ণদাস বার বার 'ছয় গোসাঞির' কথা বলেছেন। কিন্তু নরোত্তম দাস ঠাকুর নয়জন গোস্বামীর চরণ-বন্দনা করেছেন—

'স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইঁহা সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥'

ভূগর্ভ গোস্বামী শ্রীরূপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। রাধাদামোদর মন্দিরে তাঁর সেবিত

রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ রয়েছেন। কার্তিকী শুক্লা-চতুর্দশীতে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। সেদিন ভক্ত-বৈষ্ণবগণ তাঁর বিরহ-তিথি উদ্‌যাপন করেন।

তারপরে আমরা এলাম শ্রীরাধামাধব জীউর মন্দিরে। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেছেন এই মন্দির। কৃষ্ণদাসের পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম সুনন্দা। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁরা বৈদ্য এবং কৃষ্ণদাসের পিতা একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাসের বয়স যখন মাত্র ছ' বছর তখন তাঁর পিতা দেহরক্ষা করেন।

ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণদাসের মাঝে প্রবল বৈরাগ্য দেখা দেয়। তরুণ বয়সে তিনি একদিন তাঁর ভাইকে সম্পত্তির অংশ দান করে হরিনাম করতে করতে সংসার ত্যাগ করেন। এর কিছুকাল পরে তিনি স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পেলেন। নিত্যানন্দ তাঁকে বৃন্দাবনে আসতে বললেন। কৃষ্ণদাস চলে এলেন এখানে —এই শ্রীধাম বৃন্দাবনে। তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরঘুনাথ দাস গোঁস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল কৃষ্ণদাসের। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' রচনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। তিনি 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের' টীকাও রচনা করেন। ব্রজমণ্ডলেই সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি।

কবিরাজ গোস্বামীর জীবনের অন্তিম লগ্নটি বড়ই দুঃখের। নবদ্বীপের পথে গ্রন্থের গাড়ি লুঠ হয়েছে শুনে তিনি রাধাকুণ্ডের জলে লাফিয়ে পড়লেন। ভক্তগণ বহুকষ্টে তাঁকে তীরে তুললেন। তিনি কিন্তু মুমূর্ষুভাবেই বেঁচে রইলেন। বেঁচে রইলেন গ্রন্থ-প্রাপ্তির সুসংবাদ শোনার প্রতীক্ষায়। অবশেষে একদিন সেই সংবাদ এলো। কবিরাজ গোস্বামীর দুর্বল দেহ সে আনন্দ-সংবাদ সহ্য করতে পারল না। তিনি শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাধাকুণ্ডের তীরে তাঁর সমাধি আছে। আমরা বন-পরিক্রমার সময়ে সেই সমাধিক্ষেত্রকে প্রণাম করব।

শ্রীরাধামাধব শ্রীজয়দেব গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ। কবিরাজ গোস্বামী সেই বিগ্রহকে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সে বিগ্রহ এখন রয়েছেন জয়পুর শহর থেকে তিন মাইল দূরে ঘাটি নামে একটি জায়গায়। অন্যান্য মন্দিরের মতো এ মন্দিরেও তাঁর প্রতিনিধি বিগ্রহ বিরাজ করছেন। আমরা রাধামাধবকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসি বাইরে।

রাধামাধব মন্দির থেকে এলাম শ্যামসুন্দর মন্দিরে – বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরদেব জীউর মন্দির। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর বংশধরগণই মন্দিরের সেবাইত।

তোরণ পেরিয়ে মন্দির-চত্বর—পাথর দিয়ে বাঁধানো। তারপরে মন্দির—পাথরের মন্দির। চত্বরের মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ। পাশে দুটি তমাল তরু।

আমরা চত্বর ছাড়িয়ে মন্দিরে উঠে আসি। সশ্রদ্ধচিত্তে দর্শন করি রাধেশ্যামকে। তাঁকে প্রণাম করি।

আমার পাশ থেকে সহসা দিদিমা বলে ওঠেন, "আহা! কেমন সুন্দর!"

সত্যিই সুন্দর। আর তাই তিনি শ্যামসুন্দর।

তারপরে আসি রাধাবিনোদ মন্দিরে। কথিত আছে, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে রাধাবিনোদদেব উমরাও-য়ের কিশোরীকুণ্ডে প্রকট হয়েছিলেন। লোকনাথই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি রাধাবিনোদের প্রথম সেবক। সে বিগ্রহ অবশ্য এখন জয়পুরে।

শ্রীলোকনাথ জন্মেছিলেন ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর আদিনিবাস ছিল যশোরের তালখড়ি গ্রামে। তিনি মহাপ্রভুর চেয়ে দু'বছরের বড় ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গদাধর ও নিত্যানন্দের মতো তিনিও অদ্বৈতাচার্যের কাছে বিদ্যালাভ করেছেন। আর তাঁদেরই মতো তিনি ছিলেন প্রতিভাধর। কাজেই লোকনাথ ছাত্রজীবনেই শ্রীচৈতন্যের সঙ্গলাভ করেছিলেন। তিনি নৈষ্ঠিক ভজনানন্দ ব্রহ্মচারী অবস্থায়

গৃহত্যাগ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে ভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজমহল পূর্ণিয়া অযোধ্যা ও লখনউ হয়ে বৃন্দাবনে আসেন। ব্রজমণ্ডলে তাঁরাই প্রথম গৌড়ীয় গোস্বামী।

লোকনাথ গোস্বামী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ অনুসন্ধান লীলা করতেন। তিনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করতে শ্রীরূপকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তাঁর অনুরোধে কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' সে-কথার উল্লেখ করেন নি। তাই শ্রীলোকনাথের বৈরাগ্য-কাহিনী অপরূপ।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর ছিলেন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য। এই মন্দির-সংলগ্ন বাগানে গুরু-শিষ্যের সমাধি রয়েছে। আরও একটি সমাধি আছে সেখানে—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর। তাঁর সেবিত গোকুলানন্দদেবও রয়েছেন এই মন্দিবে। তাই এ মন্দিরের আর একটি নাম শ্রীগোকুলানন্দ মন্দির।

বাঁদিকে বাগান, ডানদিকে মন্দির - মাঝখানে মাটির পথ। পথের পাশে মন্দির-দ্বার। তারপরেই দেওয়ালে ঘেরা একফালি উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরের একপ্রান্তে মন্দির—ছোট ও জরাজীর্ণ মন্দির।

আমরা কীর্তন করতে করতে মন্দিরে উঠে আসি। দর্শন করি রাধাবিনোদের প্রতিনিধি বিগ্রহ এবং গোকুলানন্দকে।

আবও দুটি অমূল্য দর্শন আছে এখানে। বিগ্রহকে প্রণাম করে আমরা সেদিকে তাকাই—গোবর্ধন-শিলা (গিরিধারী) ও গুঞ্জামালা। রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে মহাপ্রভু এই দুটি বস্তু দান করেছিলেন।

গিরিধারীর সামনে দাঁড়িয়ে কীর্তন চলল কিছুক্ষণ। তারপরে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। এগিয়ে চলি বাগানের দিকে—সমাধিক্ষেত্রে। আষাঢ়ী কৃষ্ণাষ্টমীতে লোকনাথ গোস্বামীর এবং কার্তিকী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে নরোত্তম ঠাকুরের উৎসব হয় এখানে।

রাধাবিনোদ মন্দির থেকে আমরা এলাম রাধারমণ মন্দিরে। মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেছেন এই

মন্দির। দাক্ষিণাত্যের ভট্টমারী গ্রামের বেঙ্কট ভট্টজীর পুত্র শ্রীগোপাল। বেঙ্কট ভট্টও মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। তাই গোপালের বয়স যখন মাত্র এগারো বছর, তখন পিতা তাঁকে মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঁচাশি বছরের জীবনের শেষ পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি বৃন্দাবনে কাটিয়েছেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে তিনি রূপ-সনাতনকে সবিশেষ সাহায্য করেছেন।

কথিত আছে, ধর্মপ্রচার করে ফেরার পথে গোপাল গণ্ডকী নদী থেকে দ্বাদশটি শালগ্রাম শিলা নিয়ে বৃন্দাবনে আসেন। তিনি সেই শালগ্রামকেই কৃষ্ণরূপে পূজা করতে থাকেন। একদিন কয়েকজন শ্রেষ্ঠী তাঁকে বিগ্রহের উপযোগী কিছু বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে যান। গোপাল ভাবলেন—'আমার যদি একটি ছোট বিগ্রহ থাকত, আমি তাঁকে এগুলি পরাতে পারতাম।'

পরদিন সকালে উঠে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, দ্বাদশটি শালগ্রামের একটি 'ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম, দ্বিভুজ-মুরলীধর, মধুর ব্রজকিশোর শ্যামরূপে' প্রকটিত।

আনন্দিত গোপাল অন্যান্য গোস্বামীদের ডেকে আনলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে শ্রীবিগ্রহেব অভিষেক সুসম্পন্ন হল। সেদিনটি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমার (১৫৪২ খ্রীঃ) পুণ্যতিথি। গোস্বামিগণ বিগ্রহেব নাম রাখলেন রাধারমণ। আমরা এখন সেই মন্দিরের তোরণে উপস্থিত হয়েছি।

কিন্তু মন্দিরের কথা পরে হবে, আগে তার সেবকদের কথা বলে নিই। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য হলেন—শ্রীনিবাসাচার্য, হরিবংশ, গোপীনাথ, শম্ভুরাম ও মকরন্দ। হরিবংশ রাধাবল্লভ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু রাধাবল্লভের কথা এখন নয়, এখন রাধারমণের কথা হোক্।

গোপীনাথের শিষ্য দামোদর দাস। তাঁরই বংশধরগণ এখন রাধারমণ মন্দিরের সেবক। তাঁরা পুরুষানুক্রমে বৃন্দাবনের শিক্ষিত

ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। বর্তমান পুরুষের শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের (বৃন্দাবন) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি অতিশয় অমায়িক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। নিজে কলকাতায় গিয়ে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব ভেবেছি। মন্দিরের উল্টোদিকেই গোস্বামীজীদের বাড়ি। কিন্তু এখন ওখানে যাওয়া যাবে না। এখন গেলে সহযাত্রীরা আমার প্রকৃত পরিচয় জেনে যাবেন।

কাজেই সেদিকে না তাকিয়ে সহযাত্রীদের সঙ্গে কীর্তন করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করি।

পাথরের সুবিশাল মন্দির। শ্বেত ও রঙীন পাথরে বাঁধানো সুপ্রশস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণ। মন্দিরের স্তম্ভে ও দেওয়ালে সুন্দর খোদাই কাজ। মন্দির অনেকটা উঁচুতে—সামনে বারান্দা, তারপরে গর্ভমন্দির। মন্দিরে রাধারমণের বিগ্রহ—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেবিত আদি বিগ্রহ।

আওরঙ্গজেবের আক্রমণের সময় রাধারমণ, রাধাবল্লভ ও বঙ্কুবিহারী মন্দিরের সেবকগণ তাঁদের মন্দির-বিগ্রহকে বৃন্দাবনের বাইরে পাঠাতে সম্মত হন নি। সম্ভবতঃ সেবকগণ জানতেন—যাঁরা বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁরা আর ফিরে আসবেন না। তাই সেই দূরদর্শী সেবকগণ ঝুঁকি নিয়েও রাধারমণ, রাধাবল্লভ ও বঙ্কুবিহারীজীকে বৃন্দাবনেই লুকিয়ে রেখেছিলেন। আর তা রেখেছিলেন বলেই আমরা আজ সেই আনন্দ্যসুন্দর মূর্তি তিনটি দর্শন করতে পারছি।

পরিক্রমা শেষে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। এ মন্দির গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আমলের নয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লখনউ-য়ের ধনী শিষ্য সাহ বিহারীলালজী আশি হাজার টাকা ব্যয়ে এই সুবিশাল ও সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন।

আমরা মন্দিরের পেছনে আসি—আসি শ্রীগোপাল ভট্ট

গোস্বামীর সমাধিস্থলে। সমাধিক্ষেত্রটি নামাবলী দিয়ে ঢাকা। আষাঢ়ী শুক্লা-পঞ্চমীতে এখানে উৎসব হয়।

মন্দির ও সমাধিক্ষেত্রের মাঝখানে একটি শ্বেত-পাথরের ছোট মন্দির। এখানেই রাধারমণ প্রকট হয়েছিলেন।

নিধুবনকে ডাইনে রেখে আমরা বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি সামনে। ফেরার পথে নিধুবনে যাব। এখন চলেছি গোপেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করতে। তাঁকে দর্শন না করলে যে বৃন্দাবন-পরিক্রমা পূর্ণ হয় না।

দূরত্ব বেশি নয়। নিধুবন ছাড়িয়ে একটু এগিয়েই একটি তে-রাস্তার মোড়। মোড়ের মাথায় গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির—গোয়ালিয়রের মহারাজা নির্মিত নতুন মন্দির। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলের আরও বহু মন্দিরের মতো এ মন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বেশ ভিড় এখানে। হৈ-চৈ ও চেঁচামেচি চলেছে চারিদিকে। যাত্রীরা যাচ্ছেন, আসছেন—কেনা-কাটা করছেন। পথ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সদর দরজা। তারপরে অঙ্গন।

দরজার কাছে পাণ্ডারা পয়সা নিয়ে বসে আছেন। কয়েক পয়সা কম নিলে টাকার ভাঙ্গানি পাওয়া যায়। ভাঙ্গানি ছাড়া বৃন্দাবন দর্শন অসম্ভব। পথের দু'পাশে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশুর দল সর্বদা বসে রয়েছে। সাধ্যানুযায়ী তাদের দান করা ব্রজ-পরিক্রমার অন্যতম অঙ্গ। এ ছাড়া রয়েছে মন্দিরে মন্দিরে প্রণামীর পালা। কাজেই খুচরো পয়সার খুবই দরকার বৃন্দাবনে। আমার সহযাত্রীরা তাই কীর্তন ভুলে ভিড় জমিয়েছে পয়সার দোকানে। সুযোগ বুঝে আমিও কয়েকটা টাকা ভাঙ্গিয়ে নিলাম। পর্যটক হলেও তীর্থযাত্রী তো বটেই।

কথিত আছে, রাসলীলার রূপমাধুরী দর্শনের জন্য গোপীর বেশে মহাদেব এসে উপস্থিত হলেন রাসস্থলীতে। কিন্তু সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে চিনতে পারলেন। শিব একটু লজ্জিত হলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'আপনার শুভাগমনে আমরা কৃতার্থ হলাম। আজ থেকে আপনি চির-বিরাজ করবেন এখানে এবং গোপেশ্বররূপে পূজিত হবেন বৃন্দাবনে। আপনার পূজা না করলে, পুণ্যার্থীদের বৃন্দাবন দর্শন বৃথা হবে।'

সেই থেকেই মহাদেব গোপেশ্বররূপে রয়েছেন এখানে। রয়েছেন কারণ, প্রেম ও ভক্তির রাজ্য বৃন্দাবন। এ রাজ্যে আবাহন আছে, বিসর্জন নেই।

গোপেশ্বরের কৃপাতেই পুণ্যার্থীর ব্রজবাস হয়। আমরাও তাঁকে দর্শন করে তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা করি।

দর্শন শেষে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। ডানদিকের পথ ধরে চললাম এগিয়ে। পথের দু'ধারে দোকান-পাট। এ অঞ্চলটা খুব জম-জমাট।

খানিকটা এগিয়েই পথটি ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠে আসি ওপরে—পৌঁছই শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসস্থলী বংশীবটে।

আমরা বৃন্দাবনের পূর্বপ্রান্তে যমুনার তীরে উপস্থিত হয়েছি। দেওয়াল-ঘেরা অনেকখানি সমতল জায়গা। সামনেই সেই পুণ্যবৃক্ষ বংশীবট। গাছের গোড়ায় ছোট মন্দির। বড় মন্দির রয়েছে একটু দূরে।

বটের ছায়ায় সমস্ত জায়গাটা ছায়া-শীতল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকটি তীর্থযাত্রী পরিবার এখানে-ওখানে বিশ্রাম করছিলেন। আমাদের কীর্তনের শব্দে তাঁরা সচকিত হয়ে উঠে বসেন।

দর্শন শেষে কীর্তন করতে করতে মন্দির থেকে আমরা নেমে আসি নিচে—বংশীবটের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ একদিন রাতে এমনি-ভাবেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন বংশীবটতলে। বাঁশি বাজিয়ে গোপীদের আকর্ষণ করেছিলেন।

চণ্ডীদাসের গান গেয়ে সেদিনের কথাই বলছেন কেষ্টপ্রভু। তিনি গাইছেন—

'শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল-ডাল ফুল ভরি ভাল
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমন-লোভা
ভুলিল নাগর রায়॥'

কীর্তন শেষ হল। মথুরা মহারাজের ইসারায় আমরা মাটিতে বসে পড়ি। মথুরা মহারাজ কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি খুবই পরিশ্রান্ত কিংবা ক্ষুধার্ত?"

"না, না।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় চক্রবর্তী। সে সকালে চা-য়ের সঙ্গে যে পরিমাণ 'টা' খেয়েছে, তাতে তার খিদে লাগার কথা নয়। কিন্তু যাঁরা তা পেবে ওঠেন নি, তাঁদের তো খিদে না পাবার কোন কারণ নেই। তবে তাঁরা সবাই নির্বাক। স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, বুঝতে পারছি না।

মথুরা মহারাজ বলেন, "আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি এখন আপনাদের কাছে রাসলীলার পুণ্যকাহিনী কীর্তন করতাম। কারণ, এখানেই হয়েছিল সেই আনন্দময় প্রেম-বিলাস। এই পুণ্যক্ষেত্রে বসে সেই প্রেমামৃত পান করলে আপনারা ধন্য ও কৃতার্থ হবেন।"

"না, না। আমাদের কোন আপত্তি নেই। আপনি বলুন মহারাজ!" চক্রবর্তী আবার চেঁচিয়ে ওঠে।

মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করেন, "ইতিপূর্বে আমি আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা, বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলার কথা বলেছি।

সেই সব পুণ্যময় লীলাস্থল আমরা পরিক্রমাকালে দর্শন করব, তখন ঐসব লীলা সম্পর্কে আবার আলোচনা করা যাবে। আজ আমরা রাসলীলা নিয়ে আলোচনা করছি।" একবার থামলেন মথুরা মহারাজ। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "ভাগবতকার দশম স্কন্ধের উনত্রিংশ থেকে ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণনা করেছেন। এই পাঁচটি অধ্যায়কে একসঙ্গে রাসপঞ্চাধ্যায় বলে। এটি শ্রীমদ-ভাগবতের একটি প্রসিদ্ধ অংশ। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলেছেন—যে এই রাসলীলা শ্রবণ অথবা কীর্তন করতে পারবে, সে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করে কামব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে।

"রাসলীলা মধুর রসের চরম অভিব্যক্তি। বৈষ্ণব দর্শনাচার্যগণ বলেছেন, রস পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মুনি-ঋষিগণ নির্জন পর্বতে ও অরণ্যে তপস্যা করে শান্তভাবে ভগবানকে লাভ করেছেন। উদ্ধব ও প্রহ্লাদ দাস্যভাবে, শ্রীদাম ও সুদাম সখ্যভাবে এবং মা যশোদা বাৎসল্যভাবে ভগবানকে পেয়েছেন। আর গোপীগণ মধুর রসে আপ্লুত হয়ে তাঁদের দেহ, মন ও আত্মাকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে তাঁকে লাভ করেছেন। সেই মধুর রসের অভিব্যক্তি এই রাসলীলা। এই লীলাতে আমরা সর্বরসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড ঘন রসমূর্তি দর্শন করে থাকি। এই লীলা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার লীলা।

"এবারে আসল কথায় আসা যাক্। সেদিন শারদ পূর্ণিমা। বর্ষাবিধৌত বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ শ্যাম শোভা ধারণ করেছে। একটু আগে আপনারা চণ্ডীদাসের ভাষায় সেই অপরূপ বৃন্দাবনের বর্ণনা শুনেছেন। এবারে ভাগবতকারের কথা শুনুন—

'ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥'

"এটি রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। ভাগবতকার এই শ্লোকে বলেছেন, ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরতের মল্লিকায় সুশোভিত

বৃন্দাবনে রাত্রি সমাগত দেখে যোগমায়াকে আশ্রয় করে গোপীগণের সঙ্গে রাসক্রীড়া করতে চাইলেন।

"গোপীদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ল তাঁর। তিনি তাঁদের বলেছিলেন—'শারদ পূর্ণিমায় তোমাদের ক্যাত্যায়নী পূজার উদ্দেশ্য সফল হবে। তোমরা আমাকে পতিরূপে পাবে।'

"তাই কৃষ্ণ তাঁর বাঁশি বাজালেন। সেই মনোহারী বাঁশির শব্দ ব্রজপল্লীর কুটিরে কুটিরে প্রবেশ করে ব্রজবালাদের হৃদয়ের রন্ধ্রে গিয়ে আঘাত করল। তাঁরা হাতের কাজ ফেলে, বেশ-ভূষার দিকে নজর না দিয়ে ছুটে চললেন বনভূমির দিকে। বাঁশির ব্যাকুল আহ্বানে তাঁরা ক্রমেই আকুল হয়ে পড়ছেন, আর তাঁদের সঙ্গে প্রকৃতিও যেন অধীরা হয়ে উঠছেন। কবি জয়দেবের ভাষায়—

'রতিসুখসারে গতমভিসারে
মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী।
পীন-পয়োধর পরিসরমর্দন-
চঞ্চলকরযুগশালী॥'

"অবশেষে গোপীগণ এখানে, এই যমুনাতীরের নির্জন নিকুঞ্জে উপস্থিত হলেন। চতুর শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাঁদের দেখে বলে উঠলেন, 'এই নির্জন ও ভয়ঙ্কর বনে রাতে হিংস্র জন্তুরা বিচরণ করে। এসময়ে এখানে মেয়েদের থাকা ঠিক নয়। তোমরা ঘরে ফিরে যাও। এখানে দেরি করে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি ক'রো না।'

"গোপীরা উত্তর দিলেন, 'হে পুরুষরত্ন, তোমাকে দেখে আমরা কামাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়েছি, তুমি আমাদের উত্তপ্ত স্তনযুগলে ও মাথায় তোমার করপল্লব স্থাপন করো।'

"তখন শ্রীকৃষ্ণ একটু হেসে গোপীদের প্রেমাধীন হয়ে তাঁদের সঙ্গে রমণ করলেন। তিনি প্রথমে হাত বাড়িয়ে গোপীদের গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। তারপরে তাঁদের হাত, চুল, উরু, কটিবন্ধন ও স্তনযুগল স্পর্শ করে নখরজালের দ্বারা আকর্ষণ ও কটাক্ষ নিক্ষেপ করে তাঁদের সঙ্গে পরিহাস করতে থাকলেন।

"তারপরে হঠাৎ কৃষ্ণ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বিরহ-সন্তপ্তা গোপীগণ তখন পাগলের মতো তাঁকে খুঁজে বেড়াতে থাকলেন। তাঁরা বনের ফুল-ফল, তরু-লতা ও পশু-পক্ষীকে কৃষ্ণের খবর জিজ্ঞেস করলেন। বললেন—'হে কুরুবক, হে অশোক, হে চম্পক! আমাদের প্রাণনাথ কৃষ্ণ কি এখান দিয়ে গিয়েছে? হে শ্যামপ্রেয়সী তুলসি! তুমি কি বলতে পারো, বাসুদেব কোথায় গেছে? হে মালতি ও মাধবি, হে জাতি ও যূথি! তোমরা কি দেখেছো, প্রিয়তম মাধব আমাদের কেবল তাঁর করকমলের স্পর্শ দান করেই কোথায় চলে গিয়েছে? তাঁর বিরহে আমাদের চিত্ত বিহ্বল হয়েছে, আমরা যে এ বিরহ-যাতনা আর সইতে পারছি না।'

"কিন্তু তারা কোন উত্তর দিতে পারল না। গোপীরা ভাবলেন—

'অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥'

—রাধার সঙ্গে গোপনে বিহার করবার জন্যই কৃষ্ণ আমাদের ফেলে রেখে সেই ভাগ্যবতী রমণীকে নিয়ে নির্জন স্থানে চলে গেছে।

"শেষ পর্যন্ত যখন তাঁরা কিছুতেই কৃষ্ণের দেখা পেলেন না, তখন সেই অদর্শনব্যাকুলা, বিরহসন্তপ্তা ও উদ্বেগাকুলা গোপীদের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন হল। তাঁরা কৃষ্ণধ্যানে তন্ময় হয়ে উঠলেন। তাঁদের হৃদয় কৃষ্ণের অলৌকিক লীলারঙ্গে তরঙ্গিত হয়ে উঠল। কোন গোপী গোপালের লীলাভাবে ভাবিত হয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন, কেউ বা পুতনারূপিণী অন্য এক গোপীর স্তনপান করতে থাকলেন, কেউ তৃণশয্যায় শুয়ে শকটরূপিণী আর এক গোপীকে পদাঘাত করলেন। কোন গোপী তৃণাবর্ত হয়ে শিশু-

কৃষ্ণকে চুরি করতে ছুটলেন। এইভাবে তাঁরা যশোদার ব্রহ্মাণ্ডদর্শন, শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি, যমলার্জুন ভঞ্জন, বৎসাসুর অঘাসুর ও বকাসুর-বধ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার অভিনয় করতে থাকলেন।"

মথুরা মহারাজ একটু থামেন। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি আবার শুরু করেন, "শ্রীকৃষ্ণ এদিকে প্রধানা গোপীর সঙ্গে নানাপ্রকার প্রেম-বিলাস করলেন। এই প্রধানা গোপীকেই আমরা ভাবলোকের মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারাণী বলে থাকি।

"শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমানন্দে সম্ভোগ করে গর্বিতা হলেন। ভাবলেন, 'গোপীরা সবাই তো কৃষ্ণ কামনায় বনে এসেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ কেবল আমারই অধীন।' তাই গর্বিতা রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'হে প্রিয়তম, আমি যে আর চলতে পারছি না।'

"কৃষ্ণ বললেন, 'বেশ, তুমি আমার কাঁধে উঠে ব'সো।'

"কিন্তু প্রেম-গর্বিতা রাধা তাঁর কাঁধে চড়ার চেষ্টা করতেই কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাধারাণী তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে আকুল স্বরে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে থাকলেন। তাঁর সেই আহ্বান জনহীন বনে ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

"ততক্ষণে গোপীদের তন্ময়ভাব কেটে গিয়েছে। তাঁরা কৃষ্ণলীলার অভিনয় শেষ করে আবার তাঁকে খুঁজতে আরম্ভ করেছেন।

"অবশেষে রাধা-কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন অনুসরণ করে গোপীরা অচৈতন্য শ্রীরাধিকার কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সেবায় রাধারাণীর চৈতন্য ফিরে এলো। তিনি সখীদের কাছে সব কথা খুলে বললেন।

"সখীরা তখন রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে আবার এখানে এলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে থাকলেন, 'হে চিত্তহরণকারি, আমরা তোমাকে সর্বস্ব অর্পণ করেছি। তুমি দেখা দাও। আমরা তোমার অভয় পদযুগল আমাদের বুকে স্থাপন করে শান্তিলাভ করি।'

"সহসা শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আবির্ভূত হলেন। তাড়াতাড়ি গোপীরা চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলেন তাঁকে। কেউ তাঁর হাত ধরলেন,

কেউ বা তাঁর চন্দন-চর্চিত বাহু নিজের কাঁধে স্থাপন করলেন। কেউ তাঁর চর্বিত তাম্বুল অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করলেন, কেউ বা তাঁর পদকমল নিজের স্তনের ওপর স্থাপিত করলেন। আর কেউ বা কেবলই নির্নিমেষ নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ তারপরে গোপীদের নিয়ে কুন্দ ও মন্দার কুসুমে পরিপূর্ণ যমুনার মনোহর পুলিনে প্রবেশ করলেন। গোপীরা কর-মর্দন ও চরণ-মর্দণ করে কৃষ্ণসেবা শুরু করলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের কাম উদ্দীপিত হল। তাঁরা আনন্দে পুলকিতা হলেন।

"অবশেষে কৃষ্ণ গোপীদের আলিঙ্গন করে রাসলীলা শুরু করলেন। গোপীদের হাতের বলয়, কটিদেশের কিঙ্কিনী ও পায়ের নূপুর নৃত্যের তালে তালে বাজতে থাকল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে আলিঙ্গন, কর-মর্দন, প্রণয়-নিরীক্ষণ ও উদ্দাম-বিলাস করতে থাকলেন। গোপীদের দেহে তখন আনন্দের শিহরণ। তাঁদের মালা ও অলঙ্কার মাটিতে খসে পড়েছে। তাঁদের কেশের বন্যায় কৃষ্ণ ঢাকা পড়ে গেছেন। গোপীদের শাড়ি ও কাঁচুলি খুলে পড়তে চাইছে, কিন্তু সেদিকে তাঁদের খেয়াল নেই। তাঁরা কেবল মাঝে মাঝে কৃষ্ণের কাঁধে মাথা রেখে সুখনিদ্রা অনুভব করছেন আর মাঝে মাঝে তাঁর ঘনশ্যাম মুখমণ্ডলে নিজেদের মুখকমল সংযোজিত করে অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন।

"ক্রমে গোপীদের অন্তরে কামরসের আবির্ভাব হল। কৃষ্ণ তখন বহুরূপে কামশরে প্রপীড়িতা গোপীগণের সঙ্গে কামক্রীড়া সম্পন্ন করলেন। ভাগবতকারের ভাষায়—

'কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোহপি লীলয়া ॥'

—শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, সুতরাং তাঁর আনন্দ বাইরেব বস্তু-নিরপেক্ষ হলেও, তিনি যত-সংখ্যক গোপী, নিজেকে তত-সংখ্যক করে তাঁদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন।

"অবশেষে গোপীগণ রতিক্রীড়ায় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হবার পরে লীলাবিহারী কৃষ্ণ তাঁদের মুখ মুছিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

তাঁদের সব শ্রান্তি দূর হয়ে গেল। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করতে শুরু করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের নখরস্পর্শে তাঁদের আবার উচ্ছল করে তুললেন।

"তারপরে কেলিশ্রমে ক্লান্ত কৃষ্ণ গোপকুমারীদের নিয়ে যমুনার জলে অবগাহন করলেন।

"জলক্রীড়া শেষ হবার পরে শুরু হল কুঞ্জক্রীড়া। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমর ও গোপী পরিবৃত হয়ে পুষ্পরেণু-গন্ধময় যমুনার উপবনে বিহার করতে থাকলেন।

"এইভাবে সৈকতলীলা, জললীলা ও কুঞ্জলীলার ভেতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সমাপ্ত হল।"

"জয় রাধে, জয়........."

"না, না। উঠবেন না চক্রবর্তীবাবু!" মথুরা মহারাজ উচ্ছ্বসিত চক্রবর্তীকে বাধা দিলেন। চক্রবর্তী আধোবদনে আবার বসে পড়ে।

মথুরা মহারাজ বলেন, "ভাগবতকার বলেছেন—

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥'

—যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে গোপীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা শ্রবণ করেন, অথবা কীর্তন করেন, তিনি অচিরেই ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করে শরীর এবং মনের অনিষ্টকর কামপ্রবৃত্তি দূর করতে সমর্থ হন।

"সুতরাং ভক্তবৃন্দ, আপনাদের কাম-বিবর্জিত মন নিয়ে রাস-মহোৎসব শ্রবণ ও মনন করতে হবে। অশুদ্ধ মন নিয়ে রাসলীলা-শ্রবণ করলে অশেষ অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।"

॥ দশ ॥

এবার ফিরে যাবার পালা। আর সে পালা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আমাদের দেখে অবশ্য কেউ বুঝতে পারছেন না। কারণ, শোভাযাত্রার গতিবেগ কমে নি এবং কীর্তনের বেগ বেড়েছে।

কেনই বা বাড়বে না? এখনও যে আজকের পথ-পরিক্রমা পূর্ণ হয় নি। আশ্রমে ফিরে যাবার পথে আমরা নিধুবন ও নিকুঞ্জবন দর্শন করব।

বারোটি বন নিয়ে ব্রজমণ্ডল। বৃন্দাবন সেই দ্বাদশ বনের একটি বন। আবার বৃন্দাবনে রয়েছে বারোটি উপবন—অটলবন, কেবারিবন, বিহারবন, গোচরণবন, কালীয়দমনবন, গোপালবন, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, রাধাবাগ, ঝুলনবন, গহ্বরবন ও পপড়বন। এর দু'টি মাত্র উপবন এখন দর্শন করব, বাকি দশটি পরশুদিন—পঞ্চক্রোশী অর্থাৎ বৃন্দাবন-পরিক্রমার সময়ে।

নিধুবনের সামনে এসে থেমে গেল আমাদের শোভাযাত্রা—দরজা বন্ধ। কি ব্যাপার? তাহ'লে কি দর্শন হবে না?

"হবে বৈকি, নিশ্চয়ই হবে।" বলেন কেষ্টপ্রভু, "ভেতরে যাত্রী বেশি হয়ে গেছে বলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা বেরিয়ে এলেই আমরা ভেতরে যাব।"

চারিদিকে দেওয়াল-ঘেরা সুবিরাট এলাকা জুড়ে নিধুবন। সেখানে যাত্রী বেশি হয়েছে? ব্যাপারটা বিস্ময়কর! তাহলেও আমরা সারি বেঁধে পথের দু'দিকে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীর্তন করতে থাকি।

পথের দু'ধারেই লোকালয়। শুধু পথ কেন, নিধুবনের চারিদিকেই লোকালয়। মহামতি আকবর ও মহাত্মা হরিদাসের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত নিধুবনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা।

রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলনস্থল নিধুবন। কৃষ্ণলীলার বহু চিহ্ন রয়েছে এই বনে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি চুরি হলে, শ্রীরাধা নিধুবনে বসে চোরের বিচার করেছিলেন।

এত ভাবনার মাঝেও কিন্তু প্রশ্নটা ভুলতে পারি নি—কত লোক ভেতরে গেছেন যে, আমাদের জায়গা হবে না?

একটু বাদেই আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। হাফ্-প্যান্ট ও হাফ্-সার্ট পরে একদল ব্যাণ্ডবাদক হিন্দী সিনেমার গান বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছেন। তাঁদের ব্যাণ্ডের শব্দে আমাদের কীর্তনের সুর ডুবে গেল। আমরা কীর্তন থামালাম। প্রহরী চেঁচিয়ে উঠল, "এক তরফ্ হো যাইয়ে!"

আমরা তাদের নির্দেশ পালন করি। ব্যাণ্ডবাদকরা এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের পেছনে বিরাট শোভাযাত্রা। যতদূর দেখা যাচ্ছে, কেবল লোক আর লোক! এত লোক এলো কোথা থেকে?

জনৈক পথচারী জানান, "গতকাল মথুরা থেকে বৃন্দাবনে এসেছেন এঁরা।"

"এঁরা কারা?"

ভদ্রলোক উত্তর দেন, "গোকুলীয়া গোসাঁইদের শিষ্য, বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। প্রায় সকলেই এসেছেন মহারাষ্ট্র থেকে। এঁদের বনযাত্রা চলছে। এক হাজার যাত্রী এবারের যাত্রায় অংশ নিয়েছেন।"

ব্যাণ্ডবাদকরা তোরণ পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন। তাঁদের পেছনে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ। যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা। যে দেশে হাসপাতাল, বিবাহ-বাসর ও শ্মশানঘাটে পুলিশ অপরিহার্য, সে দেশে পুলিশ ছাড়া তীর্থযাত্রা সুসম্পন্ন হবে কেমন করে? কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়েই পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি পুলিশ নিয়ে কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শনের জন্য এঁদের উপহাস করেন, তাহলে তিনি অন্যায় করবেন।

পুলিশের পরে ডাক্তারী ব্যাগ-হাতে দু'জন ভদ্রলোক। তারপরে কয়েকজন বয়েজ-স্কাউট্‌স ও গার্লস-গাইড্‌স। তাদের পরে আধ-ডজন ক্যামেরাম্যান। দু'জনের হাতে ১৬ মি. মি. মুভি ক্যামেরা। সম্ভবত একটিতে 'কালারড্‌' ও একটিতে 'ব্লাক এ্যাণ্ড হোয়াইট' ফিল্ম রয়েছে। আধুনিক যুগে নিশ্চয়ই ক্যামেরাকে ব্রজ-যাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করা উচিত। বিশেষ করে সে যাত্রার অধিকাংশ যাত্রী যদি বম্বের অধিবাসী হন।

ফিল্ম ডিভিশনের পরে শুরু হল যাত্রীদের শোভাযাত্রা। দু'বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। একথাটা অবশ্য আমাদের বেলাতেও সত্য। আমাদের সঙ্গেও একটি দু'বছরের শিশু আছে। সে তার বাবার কাঁধে চড়ে পরিক্রমা করছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর যে, ইতিমধ্যে শিশুটি চমৎকার দণ্ডবৎ করতে শিখে গেছে, যা আমি এখনও পর্যন্ত পেরে উঠলাম না।

অতএব বয়সের বিভিন্নতার জন্য বিস্মিত হবার কিছু নেই। বিস্ময়কর হচ্ছে এঁদের পোশাকের বৈচিত্র্য। আমাদের দলে কেবল কর্ণেল প্যাণ্ট পরে যাত্রায় যোগদান করেছেন। তিনিও নাকি আজ বিকেলে ধুতি-পাঞ্জাবি কিনে নেবেন। আর এঁদের দেখছি অধিকাংশেরই পরনে বিদেশী পোশাক। বয়স্কদের 'ফোল্ডলেস' ইংলিস প্যাণ্ট, যুবকদের 'প্লেটলেস', তরুণদের 'ড্রেন-পাইপ' আর ছোটদের হাফ্‌-প্যাণ্ট। বয়স্কাদের শাড়ি, যুবতীদের শালওয়ার কিংবা 'স্ল্যাক্‌স' আর তরুণীদের 'বেল বটম্‌'। অনেকেরই কাঁধে ক্যামেরা, ট্রানজিস্টার রেডিও অথবা টেপ্‌-রেকর্ডার এবং প্রত্যেকের পায়ে জুতো। বম্বের ম্যারাইন ড্রাইভ অথবা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এই বৈচিত্রময় পোশাকের বহর দেখলে বিস্মিত হতাম না। কিন্তু বৃন্দাবনের নিধুবনে ব্যাপারটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছি না।

না পারলেও প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। কারণ, এঁদের ধর্মগুরু কৃচ্ছ্রসাধনের বিরোধী ও ভোগ-বিলাসের পক্ষপাতী ছিলেন।

অতএব নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি, আর ভেবে চলি এঁদের ধর্মগুরু শ্রীবল্লভাচার্যের কথা—

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। শেষজীবনে তিনি কিছুকাল গোকুলে বাস করেছেন বলে তাঁর শিষ্যরা গোকুলকেই প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত করেছেন। অনেকে তাই তাঁর মতকে গোকুলীয়া গোসাঁইদের ধর্মমত বলে থাকেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বলেন যে, তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে এলাহাবাদের আড়াইল গ্রামে দেখা করেন এবং তাঁর নির্দেশ নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। পরে পুরীতে ফিরে গিয়ে তিনি মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় নেন। কিন্তু গোকুলের গোসাঁইরা এই বক্তব্যকে স্বীকার করেন না। বরং তাঁরা বল্লভাচার্যকেই মহাপ্রভু বলে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্পর্ক মোটেই মধুর নয়, যেমন নয় নবদ্বীপের সঙ্গে মায়াপুরের বৈষ্ণবদের। এখানেও সেই একই ব্যাপার, গোকুলের গোসাঁইরা বলেন, তাঁদের গোকুলই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল। আর গৌড়ীয়রা বলেন, মহাবনই হচ্ছে আদি গোকুল। তাই তাঁরা মহাবনকে গোকুল-মহাবন বলে থাকেন।

যাক্‌গে, যেকথা ভাবছিলাম। পশ্চিম ভারতে গোকুলীয়া গোসাঁইদের বহু ঐশ্বর্যবান শিষ্য আছেন। বল্লভাচার্য বলে গেছেন ভগবানের উপাসনার জন্য উপবাস বা তপস্যা করার প্রয়োজন নেই। বিষয়-সুখ ও সম্ভোগের মধ্য দিয়েই ভগবানের সেবা করা উচিত। শুনেছি, গোকুলের গোসাঁইরা সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। শিষ্য-শিষ্যাদের ওপরে গোঁসাইদের নাকি প্রবল প্রভুত্ব। তাঁরা তাঁদের গুরুদেবকে ধন মন ও তনু সমর্পণ করে থাকেন। শিষ্যরা অধিকাংশই অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী। কাজেই গোসাঁইদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল।

বল্লভাচার্য জন্মগ্রহণ করেন ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি একজন

তেলেগু ব্রাহ্মণ এবং পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর পিতার নাম লক্ষ্মণ ভট্ট। স্বীয় সুকৃতি ও অধ্যবসায়বলে বল্লভ বালক বয়সেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। প্রবাদ আছে যে, মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

তাঁর বয়স যখন এগারো বছর, তখন তাঁর বাবা মারা যান। তারপরে আর তিনি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পারেন নি। কিন্তু বৈষ্ণবদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখে বালক বল্লভের মনে তখন থেকেই এক নতুন ধর্মমত প্রচারের প্রেরণা দানা বাঁধতে শুরু করে।

শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর মত প্রচার শুরু করেন। উত্তর-ভারতে কিছুদিন প্রচারের পরে তিনি দাক্ষিণাত্যে চলে যান। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শুরু হল তাঁর বিজয়-অভিযান। উজ্জয়িনী, বারাণসী, প্রয়াগ ও হরিদ্বার—সর্বত্রই অসংখ্য ভক্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বল্লভাচার্য বলতেন, আজীবন ব্রহ্মচর্যাবলম্বন ন্যায়সঙ্গত ও ধর্মপ্রণোদিত নয়। তাই বারাণসীতে বসে তিনি বিবাহ করেন।

বল্লভাচার্য শেষজীবন গোকুলে কাটিয়েছেন। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে গোবর্ধনে তিনি শ্রীনাথের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির স্থাপন করেন। কথিত আছে, তিনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিলেন। এবং কৃষ্ণ তখন তাঁকে এক অভিনব প্রথায় বালগোপালের পুজো করতে বলেন। তিনি সেই পূজা-পদ্ধতিরই প্রচলন করেন। বল্লভাচার্য কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'সুবোধিনী' নামে ভগবদ্গীতার সুবিস্তৃত টীকা সুপ্রসিদ্ধ। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভাচার্যের তিরোভাব ঘটে।

"চলো হে!" চক্রবর্তীর কথায় বাস্তবে ফিরে আসি।

বল্লভীদের শোভাযাত্রা শেষ হয়ে গেছে, এবারে গৌড়ীয়দের

দর্শনের পালা। অতএব বল্লভাচার্যের ভাবনা ছেড়ে চক্রবর্তীর সঙ্গে নিধুবনে প্রবেশ করি।

ব্রজমণ্ডলের বহু পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত এই নিধুবন। একালের বৃন্দাবনের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের এই লীলাবিলাস-ভূমি থেকে।

পরিক্রমার পরে আমরা দর্শন করি স্বামী হরিদাসের সমাধি, বিশাখাকুণ্ড ও শ্রীবাঁক। শ্রীবাঁকে বঙ্কুবিহারীজী প্রকট হয়েছিলেন।

কীর্তন করতে করতে বেরিয়ে আসি নিধুবন থেকে। এগিয়ে চলি নিকুঞ্জবনের দিকে। শ্রীরাধিকা সতত বিরাজমানা সেই বনে। আজও সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যলীলা করছেন। তাই রাতে নিকুঞ্জবনে কোন প্রাণী বাস করতে পারে না। যাঁরা সে দুঃসাহস করেছেন, পরদিন সকালেই তাঁদের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু জানা যায় নি মৃত্যুর কারণ।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যাপতি প্রতাপনারায়ণ সিংহের কনিষ্ঠা মহিষী নিকুঞ্জবনের চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছেন।

তোরণ পেরিয়ে ভেতরে আসি। নিকুঞ্জবন দেখছি এখনও বন রয়ে গেছে। অশোক কদম্ব নিম তুলসী আর তমাল প্রভৃতি কৃষ্ণ প্রিয় গাছে বোঝাই হয়ে আছে সারা বনভূমি। তাদেরই মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। সেই পথে বন-পরিক্রমা করছি আমরা।

একটি তমাল গাছের তলায় অসংখ্য শালগ্রাম শিলা। দিদিমা লোভ সামলাতে পারলেন না। কিন্তু হাত বাড়িয়েই বিপদ হল। দেখে ফেললেন মথুরা মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, "কি করছেন? মরবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি? এই শালগ্রাম শিলা নিয়ে আর আশ্রমে ফিরতে হবে না। ফেরার পথেই মারা যাবেন।"

তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে এগিয়ে চলেন দিদিমা। জানকী মুখ টিপে হাসছে, আর চক্রবর্তী সোচ্চার স্বরে।

নিকুঞ্জবনের আরেকটি নাম সেবাকুঞ্জ। রাধারাণী এই বনের দেবী, আর ললিতা তাঁর সখী। বনের একদিকে রয়েছে ললিতাকুণ্ড। জল অনেক নিচে। ভক্তি মহারাজ আদেশ দিলেন, "কেউ নিচে নামবে না। সেবকগণ জল তুলে নিয়ে এসে তোমাদের গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।"

তাই করা হল। করতেই হবে। গুরুমহারাজ আসেন নি বলে আজ ভক্তি মহারাজ আমাদের নেতৃত্ব করছেন। তিনি গুরুমহারাজের গুরুভাই এবং তাঁকে সাহায্য করতে আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে এসেছেন। কলকাতায় তাঁর পৃথক আশ্রম আছে। শুনেছি, এই ক্ষীণস্বাস্থ্য সন্ন্যাসী সুপণ্ডিত এবং সুলেখক।

ললিতাকুণ্ডের জল স্পর্শ করে বনপথ দিয়ে আমরা মন্দিরে আসি। বনের মধ্যস্থলে মন্দির—প্রেমের মন্দির। রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থল এই বন-মন্দির। কবির ভাষায়—

'অদ্যাপিও সেই লীলা করেন কৃষ্ণ রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥'

আমরা ফিরে চলেছি আশ্রমে। সহসা নজর পড়ে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে।

কাল থেকেই দেখছি তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত চরণে পরিক্রমা করেছেন। ভদ্রলোক কি অসুস্থ?

তাঁর কাছে এগিয়ে আসি। জিজ্ঞেস করতেই তিনি একেবারে কেঁদে ফেললেন। চোখ মুছে বলেন "হ্যাঁ ভাই, প্রেসারটা বড্ড বেড়ে গেছে। রাতে ঘুমোতে পারি না। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তবুও কষ্ট করে আজ আপনাদের সঙ্গে পরিক্রমা করে এলাম। কিন্তু কাল থেকে বোধহয় আর পারব না।"

বললাম, "কেন, বৃন্দাবন মহারাজ তো ভাল হোমিওপ্যাথি জানেন, তাঁকে দেখান নি?"

"দেখিয়েছিলাম। ওষুধও খাচ্ছি, কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না। টাকা-পয়সাও বেশি নিয়ে আসি নি যে, ভাল ডাক্তার দেখিয়ে

ওষুধ-পত্তর খাব।" একবার থামেন তিনি। চোখ মুছে নিয়ে আবার বলেন, "আমার বোধহয় পরিক্রমা করা হবে না। আমি আপনাদের সঙ্গে বন-ভ্রমণে যেতে পারব না। আমাকে একা একা পড়ে থাকতে হবে আশ্রমের নাট-মন্দিরে।"

"না, না, একি বলছেন আপনি! পরশু পর্যন্ত তো আমরা রয়েছি এখানে। চলুন, দেখি আপনাকে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা!"

ভদ্রলোক খপ্ করে দু'হাত দিয়ে আমার একখানি হাত ধরে ফেলেন। করুণ স্বরে বলেন, "কৃষ্ণ-ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। আপনি আমাকে দয়া করুন!"

অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলি, "এসব কি বলছেন? আপনি আমার সহযাত্রী। আপনাকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য!"

ভদ্রলোক আমার হাত ছেড়ে দেন। আমি বলি, "আশ্রমে চলুন, দেখি কি করা যায়!"

আশ্রমের গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান সর্দারজী বলেন, "নৃসিংহবল্লভজী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, অফিস-ঘরে বসে আছেন।"

দ্বাররক্ষকের কাজ করলেও বৃদ্ধ সর্দারজীকে সবাই সম্মান করে। তিনি মথুরায় একটি ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন। সংসারে কেউ নেই। গুরুমহারাজের ভক্ত। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখানে চলে এসেছেন। এ আশ্রমকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব পালন করছেন। বলা বহুল্য, এজন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক নেন না। বহুদিন এখানে আছেন। কাজেই, বৃন্দাবনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর পরিচিত। শ্রীনৃসিংহবল্লভ গোস্বামী শাস্ত্রী বৃন্দাবন মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য এবং এখানকার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের অন্যতম। কাজেই তিনি সর্দারজীর পরিচিত।

কিন্তু আমি তো শাস্ত্রীজীকে লিখেছিলাম, অবসর মতো গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসব। তাঁকে আমার খোঁজে আসতে দেখে

যে এঁদের আমার সম্পর্কে একটা কৌতূহল হবে। সেটি হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

তাড়াতাড়ি ছুটে আসি অফিসে। কুশল-বিনিময়ের পরে শাস্ত্রীজীকে বলি, "ওপরে চলুন।"

তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঘরে আসি। মথুরা মহারাজ ও ভক্তি মহাবাজ ছুটে আসেন এ ঘরে। শাস্ত্রীজীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন। আমি চুপ করে থাকি।

সহসা সেই অসুস্থ ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। মহারাজরা বিরক্ত হন। কিন্তু আমি মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। এবারে শাস্ত্রীজীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব। তারপর ভদ্রলোককে বলি, "এসে ভালই করেছেন। শাস্ত্রীজী এসেছেন। উনি আপনার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। আপনি ওঁকে সব বলুন।"

সব কথা শুনে শাস্ত্রীজী বলেন, "আউট-ডোর বোধহয় এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। তবু চলুন, দেখি কি করা যায়!" তারপরে তিনি আমাকে বলেন, "আমি বৃন্দাবন মহারাজকে বলেছি, আপনি আজ আমার ওখানে প্রসাদ পাবেন।"

ভদ্রলোককে নিয়ে শাস্ত্রীজীর সঙ্গে বেরিয়ে আসি পথে। একটি টাঙ্গা ভাড়া করে এগিয়ে চলি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের দিকে। মথুরা জেলার শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল এই সেবা প্রতিষ্ঠান। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন স্থানীয় সমাজসেবী একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর তাঁরা সেটি স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেন। তৎকালীন মিশনের বাড়িতেই সেবাশ্রম খোলা হয়।

কয়েক বছরের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠান পঞ্চান্ন শয্যা-বিশিষ্ট একটি হাসপাতালে পরিণত হয়। অর্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল ধরে হাসপাতালটি সেখানেই ছিল। তারপরে দেখা গেল, মিশনের সেই বাড়িটি প্রায়ই যমুনার জলে প্লাবিত হচ্ছে। তাই সেবাশ্রমকে

নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনার জন্য শহরের উপকণ্ঠে, এই মথুরা রোডের ওপরে ছাব্বিশ একর জমি সংগ্রহ করা হল। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেবাশ্রম-ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এখন এই সেবাশ্রম আউট-ডোরসহ একশো তিন শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ মানব-সেবার আদর্শপীঠে পরিণত করেছেন।

টাঙ্গা থেকে নেমে সামনের সুবিস্তীর্ণ সবুজ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আমরা সেবাশ্রম-ভবনে উঠে আসি। শাস্ত্রীজী ঠিকই বলেছিলেন—আউট-ডোর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আমাদের কোন অসুবিধে হল না। শাস্ত্রীজী কৃপানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। বলা বাহুল্য, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ, কৃপানন্দজী আমার পরিচিত। সাহিত্য সম্মেলনের সময় তিনি আমাদের 'হোস্ট্' ছিলেন।

'বেড টি' থেকে 'ডিনার' পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিবার পরিবেশনের সময় তিনি নিজে উপস্থিত থেকে দেখা-শোনা করতেন। তাঁর মতো নিরলস সেবাব্রতী খুব কমই দেখেছি। তাই তো তাঁরই ওপরে এই সেবা-প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সঙ্গে রয়েছেন। এখন আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব না। পরে সুবিধামতো দেখা করা যাবে। এখন শুধু দূর থেকে সেই সেবাপরায়ণ সুমহান সন্ন্যাসীকে মনে মনে প্রণাম করি।

ডাক্তারবাবু বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন ভদ্রলোককে। তারপরে তাঁকে বললেন, "আপনি এখানে ভর্তি হয়ে যান, দিন-সাতেক বিশ্রাম করুন, ভাল্ হয়ে যাবেন। আমি তাই লিখে দিচ্ছি।"

"না ডাক্তারবাবু, আপনি দয়া করুন আমাকে!" ভদ্রলোক প্রায় কেঁদে ফেলেন।

আমরা বিস্মিত! যেখানে মানুষ দিনের পর দিন চেষ্টা করে

হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে না, সেখানে সুযোগ পেয়েও তিনি ভর্তি হতে চাইছেন না।

ডাক্তারবাবু হেসে বলেন, "ভয়ের কি আছে?"

"ভয় নয়, ডাক্তারবাবু!"

"তাহলে?"

"আমার যে পরিক্রমা হবে না।"

হায় হরি! পরিক্রমা হবে না বলে অসুস্থ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইছে না।

ভদ্রলোক আবার বলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি! আপনি আমাকে এমন ওষুধ দিন যাতে আমি পঁচিশটা দিন ভাল থাকতে পারি, বন-পরিক্রমা পূর্ণ করতে পারি। পরিক্রমার পরে বৃন্দাবনে ফিরে এসে আমি নিশ্চয়ই আপনার হাসপাতালে ভর্তি হব ডাক্তারবাবু!"

ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, যেন তিনি হাসপাতালে ভর্তি হলে ডাক্তারবাবু বাধিত হবেন। তাই তাঁর কথা শুনে বিলাত-ফেরত যুবক ডাক্তার হেসে ফেলেন। বলেন, "এমন ওষুধ যে আজও আবিষ্কার হয় নি! তবু আমি আপনাকে ওষুধ দিচ্ছি। আপনি দৈনিক তিনটি করে ট্যাবলেট এবং দু'বার করে মিকশ্চার খাবেন। আর, গাড়িতে চড়ে এক বন থেকে আরেক বনে যাবেন। কখনও সিঁড়ি ভাঙবেন না, ডুলি করে ওপরে উঠবেন।"

ভদ্রলোক মাথা নাড়েন। গুরুমহারাজকে বলে না হয় মালের বাসে তাঁর যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেব, কিন্তু বুঝতে পারছি না, তিনি ডুলিভাড়া কোথায় পাবেন?

ডাক্তারবাবু আমাকে বলেন, "হাসপাতালের গেটে গিয়ে দেখুন, দারোয়ানরা বোতল বিক্রি করছে। আপনি সেখান থেকে তিনটে বড় বোতল নিয়ে আসুন।"

দারোয়ানকে বলতেই সে আমাকে ধুয়ে-মুছে তিনটি বোতল দিল। হাতে নিয়ে দেখি তিনটিই মদের বোতল। বিস্মিত হই।

বৃন্দাবন তো 'ড্রাই এরিয়া।' তার ওপরে বৈষ্ণবদের শ্রীধাম, যাঁরা চা পর্যন্ত খান না। তাহলে এখানে এত মদের বোতলের ছড়াছড়ি কেন ?

ভদ্রলোককে ওষুধসহ আশ্রমে নামিয়ে দিয়ে আমাদের টাঙ্গা এগিয়ে চলে রাধাবাগের দিকে। শাস্ত্রীজী রাধাবাগে থাকেন।

বাসস্ট্যাণ্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির অফিস ছাড়িয়ে আমরা চৌরাস্তার মোড়ে আসি। ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে চলি। পোস্ট-অফিস ও থানা পেরিয়ে আসি।

কিছুদূর এসে টাঙ্গা বাঁদিকের নির্জন পথ ধরে। মূল-পথটি দিয়ে খানিকটা এগোলেই শ্রীরঙ্গনাথজীর বাগানবাড়ি। এখান থেকে তোরণটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওখানেই নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্ভব হলে একবার যেতে হবে ঐ উদ্যানবাটিতে। ভারী সুন্দর জায়গা। গতবার বৃন্দাবনে এসে ওখানেই প্রথম গিয়েছি। মানসীও নাকি ওখানেই আমাকে প্রথম দেখেছে। তখন অবশ্য আমাদের পরিচয় ছিল না। মানসীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার অনেক পরে—মানালীর পথে। কিন্তু মানালীর কথা এখন থাক্, এখন বৃন্দাবনের কথা হোক্।

বাঁদিকে শ্রীরঙ্গনাথজী মন্দিরের সুউচ্চ প্রাচীর। শ্রীরঙ্গজীর মন্দির উত্তর-ভারতের বৃহত্তম মন্দির। এবারে এখনও দর্শন করা হয়ে ওঠে নি আমার।

আমরা রাধাবাগে এসে গেছি। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাধারাণীর চুল বেঁধে দিয়েছিলেন। রমণীয় স্থান—পাখীর গান আর ময়ূরের নাচ দেখতে দেখতে চলেছি এগিয়ে। সেকালে নিশ্চয়ই আরও রমণীয় ছিল। কিন্তু রাধাবাগ একালেও সুন্দর—ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়। তাই রাজশাহীর তালন্দাধিপতি পুণ্যাত্মা আনন্দমোহন মৈত্র এখানেই শ্রীরাধামাধব জীউর কুঞ্জ স্থাপন করেছেন।

কথিত আছে, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৃন্দাবনে এসে মৈত্রকুঞ্জের বকুলতলায় সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তার পরেই তাঁর ভাবান্তর ঘটে।

মৈত্রকুঞ্জেই চলেছি আমরা। শাস্ত্রীজী সেই কুঞ্জের সেবাইত।

এই রাধাবাগেই স্বামী কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত শ্রীকাত্যায়নী মন্দির। কিন্তু এখন আমার সে মন্দির দর্শন করা হবে না, পরে দেখা যাবে। তাই চিরবৈষ্ণবী জগন্মাতাকে মনে মনে প্রণাম করে নেমে পড়ি টাঙ্গা থেকে। আমরা পৌঁছে গেছি মৈত্রকুঞ্জের সামনে।

কুঞ্জে প্রবেশ করি আমরা। অন্যান্য আধুনিক নগরীর মতো বৃন্দাবনে লোকালয়কে কেন্দ্র করে মন্দির গড়ে ওঠে নি, মন্দিরকে কেন্দ্র করে লোকালয় গড়ে উঠেছে। মৈত্রকুঞ্জও মন্দির-প্রধান। সেবাইতদের জন্য মন্দিরের পাশেই নির্মিত হয়েছে বাসগৃহ। পরাধীন ভারতে মন্দিরটির অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বৃন্দাবনের অন্যান্য বহু মন্দিরের মতো এ মন্দিরেরও সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল পূর্ববঙ্গে। বঙ্গ-বিভাগের পর থেকে তাই শাস্ত্রীজীকে বহু কষ্টে দেব-সেবা ও সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে। একদিকে অবশ্য তিনি খুবই ভাগ্যবান। ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়ায় ভাল। অদূর ভবিষ্যতে শাস্ত্রীজী আবার স্বচ্ছলতার মুখ দেখবেন। প্রার্থনা করি, ভগবান তাঁর সে সুদিন ত্বরান্বিত করুন!

আজ আমাকে আনতে যাবার জন্য ছেলেকে পুজো করতে বলে গিয়েছিলেন। পুজো শুরু হয়ে গেছে। আমরা মন্দিরে প্রণাম করে বৈঠকখানায় এসে বসি।

কথায় কথায় শাস্ত্রীজী বৃন্দাবনের কথা বলতে থাকেন, "যদিও প্রায় সমস্ত পুরাণেই বৃন্দাবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবু কয়েক শতাব্দী ধরে এই পবিত্রপুরী মনুষ্যহীন বনভূমিরূপে পড়ে ছিল। মহাপ্রভুর নির্দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীরূপ-সনাতন এবং তাঁদের সহযোগী বৈষ্ণবাচার্যগণ লুপ্ত বৃন্দাবনকে প্রকট করেন। তারপরে আওরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলা। সে-সব আপনার অজানা নয়।

"মোগল সম্রাজ্যের পতনের পরে আহমদ শাহ দুরানীর অত্যাচার,

জাঠ ও মারাঠা শাসন প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনার পরে মথুরামণ্ডল ব্রিটিশ অধিকারে আসে। ইংরেজ রাজত্বকালে বৃন্দাবন পুনর্গঠিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হল—বৃন্দাবন শহরের মর্যদা লাভ করল।

"বৃন্দাবনের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। তবে এখানে মৃত্যুর হার বেশি। কারণ, বহু পুণ্যার্থী, বিশেষ করে বাঙালী বিধবারা শ্রীকৃষ্ণের পায়ে আশ্রয় পাওয়ার জন্য শেষ-জীবনে বৃন্দাবনে এসে বাস করে থাকেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের জনসংখ্যা ছিল ২০,৩৫০ জন, আর ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫,১৩৮ জন। এর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা প্রায় আট হাজার।

"পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমায় আপনারা বৃন্দাবন শহরের চারিদিকে পরিক্রমা করবেন। তবে এই পরিক্রমাকে পঞ্চক্রোশী বললেও, বৃন্দাবনের ব্যাস দশ মাইল নয়, আট মাইলের মতো।

"পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমার সময় আপনি বৃন্দাবনের প্রায় সমস্ত ঘাট দর্শন করতে পারবেন। বৃন্দাবনে যমুনার তীরভূমি প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ। এই বেলাভূমিতে যুগে যুগে অসংখ্য ঘাট গড়ে উঠেছে। বহু ঘাট বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এখন যা রয়েছে, তার সংখ্যাও অনেক। তবে উনিশটি ঘাট পুণ্যঘাট বলে সমাদৃত। এগুলি হল—বরাহ, কালীয়দমন, গোপাল, সূর্য বা প্রস্কন্দন, যুগল, বিহার, অন্ধের, আম্‌লী বা ইম্‌লি, শিঙ্গার, গোবিন্দ, চীর, ভ্রমর, কেশী, ধীর-সমীর, রাধাবাগ, পাণি, আদিবদ্রী, রামবাগ ও রাজঘাট।

"যমুনার ঘাট ছাড়াও বৃন্দাবনে রয়েছে ছ'টি কুণ্ড ও একটি ঝিল। এগুলি হল—দাবানল, ললিতা, বিশাখা, ব্রহ্মা, গজরাজ ও গোবিন্দ-কুণ্ড এবং মতিঝিল।" থামলেন শাস্ত্রীজী।

আমি বলি, "আচ্ছা, আমরা তো ষড়্‌গোস্বামীর মন্দির, মানে গৌড়ীয় সপ্তদেবালয় দর্শন করেছি। আর কি কি মন্দির দর্শন করা উচিত?"

"শ্রীধাম বৃন্দাবনে চার হাজারের ওপর মন্দির আছে, তার

মধ্যে প্রায় হাজারখানেক মন্দির উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোন যাত্রীর পক্ষেই এত মন্দির দর্শন করা সম্ভব নয়। তবে গৌড়ীয় সপ্তদেবালয় ছাড়া আরও অন্তত আঠারোটি মন্দির প্রত্যেক যাত্রীর দর্শন করা কর্তব্য।" শাস্ত্রীজী উত্তর দেন।

"কি কি, বলুন না!"

শাস্ত্রীজী আঙুল গুনে বলতে থাকেন, "শ্রীগোপাল, রাধাবল্লভ, বঙ্কুবিহারী, বিল্বমঙ্গল, শাহজী, মহাপ্রভু, মীরাবাঈ, তাড়াশ, কাত্যায়নী, অষ্টসখী, চৌষট্টি মহান্ত, রঙ্গজী, জামাই বিনোদ, অমিয় নিমাই, ব্রহ্মচারী, জয়পুর ও লালাবাবুর মন্দির এবং আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম।"

"একটা কথা," আমি বলি, "শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর কি কোন মন্দির নেই?"

"না। রঘুনাথ দাস রাধাকুণ্ড সংস্কার করিয়ে কুণ্ডের তীরে বাস করতেন। আপনারা বন-পরিক্রমার সময় রাধাকুণ্ডে তাঁর ভজনকুটি দর্শন করবেন। আর শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহাপ্রভুর নির্দেশে শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনা ও প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তাই তিনি প্রতি সন্ধ্যায় গোবিন্দ-মন্দিরে ভাগবত পাঠ করতেন। তবে শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রকট হবার পরে ভট্টগোস্বামীর জনৈক ভক্ত তাঁকে ছোট একটি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ মানসিংহ সেই জায়গাতেই প্রাচীন গোবিন্দ-মন্দির নির্মাণ করেন।"

"আচ্ছা, বঙ্কুবিহারী মন্দিরের সেবাইতরা কি হরিদাস স্বামীর বংশধর?" আবার প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ, মানে, তাঁর ভাইয়ের বংশধর।"

"বৃন্দাবনে তো তাঁরাই সবচেয়ে সচ্ছল?"

"নিশ্চয়ই। তাঁদের মন্দিরের আয় বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দিরের মিলিত আয় থেকেও বেশি। বঙ্কুবিহারীর সেবাইতদের বহু ধনী শিষ্য আছেন। তাঁরা নিয়মিতভাবে মন্দিরে ধর্মদা দিয়ে থাকেন।"

"ধর্মদা কি?"

"ব্যবসায়ের লাভের এক-দশমাংশ দেবসেবায় দান করাকে ধর্মদা বলে।" একবার থামেন শাস্ত্রীজী। তারপরে বলেন, "হরগুলাল শেঠ নামে ওঁদের এক ধনী শিষ্য বহু টাকা দিয়ে মন্দিরটির সংস্কার করে দিয়েছেন। কেবল এখানেই নয়, বর্ষাণের শ্রীজীর মন্দিরসহ্ তিনি ব্রজমণ্ডলের বহু মন্দিরের সংস্কার সাধন করেছেন। বৃন্দাবনে যক্ষ্মা-স্বাস্থ্যনিবাস তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বছর তিনি শীতের আগে ত্যাগী বৈষ্ণবদের লেপ, কম্বল ও পাদুকা বিতরণ করেন।"

"বৃন্দাবনবাসীদের পেশা কি?"

"প্রধানত যাত্রীসেবা।" শাস্ত্রীজী বলেন।

"দরিদ্র বাঙালী বিধবারা কিভাবে বেঁচে আছেন?"

"তাঁদের অধিকাংশই স্থানীয় ভজনাশ্রমে কীর্তন করে দৈনিক পঞ্চাশ পয়সা করে পারিশ্রমিক পান। এছাড়া শীতকালে কম্বল ও চাদর এবং দোলযাত্রা ও ঝুলনের সময় তাঁদের কাপড়-চোপড় দেওয়া হয়। উৎসবের সময় তাঁরা প্রসাদ পান। এঁদের কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে ভজনাশ্রমে গিয়ে দু'বেলা ঘণ্টা চারেক করে নামকীর্তন করা। বৃন্দাবনে চার-পাঁচটি ভজনাশ্রম আছে।"

"এখানে তাহলে কোন 'ইনডাস্ট্রি' নেই?"

"না।"

"স্কুল-কলেজ?"

পাঠশালা ও মাইনের স্কুল অনেক আছে। সংখ্যা বলতে পারব না। তবে ছেলেদের একটি করে হায়ার সেকেণ্ডারী ও টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল এবং দুটি ইন্টার-কলেজ আছে। মেয়েদের আছে একটি হাইস্কুল। এছাড়া রয়েছে শ্রীবি. এইচ. বন মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বৈষ্ণব থিয়োলজিক্যাল য়ুনিভারসিটি।"

"হ্যাঁ, শ্রীকরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর কাছে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং জ্ঞান-তপস্বী শ্রীবন মহারাজের কথা শুনেছি।"

"করুণকৃষ্ণ!" বুঝতে পারছেন না শাস্ত্রীজী।

"আপনি বোধহয় চেনেন না।" আমি বলি, "বন মহারাজের শিষ্য ও বৃন্দাবন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক তরুণ অধ্যাপক।"

"তাঁর সঙ্গে কোথায় পরিচয় হল ?"

"কলকাতায়—জাতীয় গ্রন্থাগারে। করুণকৃষ্ণ এখন সেখানে শ্রীজীব গোস্বামীর ওপরে গবেষণা করছেন।" একবার থামি। তারপরে প্রশ্ন করি, "আচ্ছা, বৃন্দাবনে দর্শনার্থীদের থাকার কি ব্যবস্থা আছে ?"

শাস্ত্রীজী বলেন, "বারোটি ধর্মশালা আছে বৃন্দাবনে। এখানকার বহু মন্দির এবং প্রায় প্রত্যেক আশ্রমেই যাত্রীনিবাস রয়েছে। এছাড়া বহু যাত্রী ব্রজবাসী পাণ্ডাদের বাড়িতেও থাকেন। বৃন্দাবনের পাণ্ডাদের মতো এমন ভদ্র পাণ্ডা আপনি ভারতের খুব কম তীর্থেই পাবেন। জুলুম তো দূরের কথা, তাঁরা কখনও কোন দাবী করেন না।"

"আচ্ছা, বৃন্দাবনের সবচেয়ে বড় উৎসব কি ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ঝুলন পূর্ণিমা, রাস পূর্ণিমা, দোলযাত্রা ও রথযাত্রা। অক্ষয় তৃতীয়া, কার্তিকী শুক্লা-নবমী, রথযাত্রা ও বাসন্তী পঞ্চমীর সময়ে মেলা বসে বৃন্দাবনে। সবচেয়ে বড় মেলা হয় রথের সময়ে। প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়।"

শাস্ত্রীজীর ছেলে ঘরে আসে। আমরা তার দিকে তাকাই। শাস্ত্রীজী জিজ্ঞেস করেন, "আসন হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ।" ছেলেটি মাথা নাড়ে।

শাস্ত্রীজী আমাকে বলেন, "চলুন। ভেতরে যাওয়া যাক্!"

আমি উঠে দাঁড়াই।

গরম গরম ঘি-য়ের কচুরি, তিন রকমের সুস্বাদু তরকারী, ভাজা, চাটনি ও প্রচুর মিষ্টি সহযোগে প্রসাদ পাবার পরে বিদায় নিলাম শাস্ত্রীজীর কাছ থেকে। বললাম, পরিক্রমা শেষে বৃন্দাবন ফিরে

আবার দেখা করব তাঁর সঙ্গে। তাঁর ছেলে রিক্শা ডেকে দিল। আমি উঠে বসলাম। রিক্শা এগিয়ে চলল।

কোথায় যাব? আশ্রমে? সেখানে গিয়ে তো সহযাত্রীদের সেই কলহ কিংবা কীর্তন! একই জিনিস দিনের পর দিন আর কত ভাল লাগে? না, এখন আশ্রমে ফিরতে মন চাইছে না। তার চেয়ে মানসীর ওখানে যাওয়া যাক্। মাঝে তো মাত্র দুটো দিন। তরশু সকালেই আমরা বন-যাত্রার পথে মথুরা রওনা হচ্ছি। যদি এ দু'দিন আর সময় করে উঠতে না পারি?

মানসীর বাড়ির গলিব মুখে রিক্শা থেকে নেমে পড়ি। অসময়ে আমাকে দেখে সে নিশ্চয়ই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে। তা হোক্, কাল তাকে আশ্রমে দেখে আমিও কি কিছু কম আশ্চর্য হয়েছিলাম?

ভেজানো দরজায় টোকা দিই। ভেতর থেকে মানসী জিজ্ঞেস করে, "কে?"

"আমি!"

আর কোন সাড়া নেই। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। নীবব কিছুক্ষণ। তার পরেই খুলে যায় দরজা। মানসী দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। না, সে কোন বিস্ময় প্রকাশ করে না, এমন কি কোন প্রশ্ন পর্যন্ত করে না। শুধু বলে, "ভেতরে এসো।"

আমি ভেতরে আসি। বিছানার চাদরটাকে একটু ঠিক করে দিয়ে মানসী বলে, "বোসো।"

না, মনটা ভাল লাগছে না আমার। ভেবেছিলাম মানসী আমাকে দেখে উচ্ছল হয়ে উঠবে। সহর্ষে স্বাগত জানাবে। তার এমন নিরুত্তাপ ভদ্রতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি নিঃশব্দে বসে পড়ি।

মানসীও নীরব। খাটের একপাশে বসে একমনে কি যেন একটা সেলাই করে চলেছে। নীরবতাটা অস্বস্তিকর ঠেকছে। তাই প্রশ্ন করতে বাধ্য হই, "ওটা কি সেলাই করছো?"

"খুকুর একটা জামা। এখানে তো মেশিন নেই, তাই হাতেই সেলাই করতে হয়।"

"খুকু কোথায়?"

"স্কুলে গিয়েছে।" মানসী তেমনি উত্তাপহীন কণ্ঠে উত্তর দেয়। তারপরে সে নিজের কাজ করে যেতে থাকে। আমিও চুপ করে থাকি। কি বলব? তার চেয়ে বরং একটু গড়াগড়ি দিয়ে নেওয়া যাক্।

আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিই। সে বলে, "শোবে? দাঁড়াও, বালিশ দিচ্ছি।"

নিঃশব্দে শুয়ে থাকি। মানসী সেলাই রেখে, বিছানার একপাশে জড়ো করে রাখা বালিশের স্তূপ থেকে দুটি বালিশ বের করে আমার মাথার নিচে দেয়। তারপরে আমার পাশে বসে আবার সেলাইটা হাতে নেয়। আমি চুপচাপ শুয়ে থাকি।

হঠাৎ মানসী প্রশ্ন করে, "তারপরে, এ সময়ে হঠাৎ কি মনে করে?" একটা স্পষ্ট অভিযোগ যেন ঝরে পড়ল তার কণ্ঠস্বরে।

চমকে উঠি আমি। বলি, "গিয়েছিলাম রাধাবাগে। ফেরার পথে চলে এলাম তোমার এখানে। ভাবলাম······"

"ভাবলে, আহা, যাবার আগে যদি একবার দেখা না করি, তাহলে বড়ই অভদ্রতা হবে! মেয়েটা হয়তো পথ চেয়ে বসে আছে!"

"না, মানে, ঠিক তা নয়। তবে···"

"শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসে আর মিথ্যে কথাগুলি না হয় না-ই বা বললে?" একবার থামে সে। তারপরে সহসা বলে ওঠে, "সত্যি সখা, তুমি তো এত নিষ্ঠুর ছিলে না?" তার দু'চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোটা অশ্রু নেমে এসেছে।

কি বলব? আমি যে কোন কথাই পাচ্ছি না খুঁজে! কেবল তাই নয়, আমার চোখদুটিও হয়ে উঠেছে অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠ হয়েছে বাক্‌রুদ্ধ। কথা বলতে গেলে যে আমিও ধরা পড়ে যাব!

কতক্ষণ কেটে গিয়েছে বুঝতে পারি না একসময়ে মানসী মুখ তোলে। আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। তারপরে আমার ঘড়ি দেখে বলে, "চারটে বাজে। আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসি। খুকুরও খাবার আনতে হবে। আমি একবার দোকান থেকে আসছি।"

"না।" আমি মানসীর একখানি হাত ধরি। সে বাধা দেয় না। বলি, "তুমি বিশ্বাস করো মানসী! সত্যি, তেমন কিছু ভেবে আমি এ সময়ে আসি নি।"

"না ভাবলেই ভাল। আমি যে সকাল থেকে তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি সখা! এমন কি, পড়াতে পর্যন্ত যাই নি।"

হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করি, "পড়াতে! তুমি কি ছাত্রী পড়াও নাকি?"

"হ্যাঁ, তবে 'অনারারী'।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "খুকুদের স্কুলে ক্লাশ নিই। কিন্তু শরীর খারাপ বলে খবর পাঠিয়ে তিনদিন ছুটি নিয়েছি। পাছে তুমি এসে দেখা না পেয়ে ফিরে যাও!"

"আমার অন্যায় হয়েছে মানসী! এ জানলে আমি সকালেই পরিক্রমার পথে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো!"

হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে সে, "আচ্ছা, তুমি আমাকে আর কত পাপের-ভাগী করবে, বলতে পার?"

কোন উত্তর দিই না। মানসীও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপরে বলে ওঠে, "আমি তোমার চা নিয়ে আসছি।"

এবারে আর বাধা দিই না। সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

আমি আবার শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি মানসীর কথা। এমন নির্জন ঘরে আমরা দু'জনে এই প্রথম নয়। কুলু-উপত্যকা ভ্রমণের সময় দিনের পর দিন আমরা এক ঘরে বাস করেছি —এমন কি, এক বিছানায় রাত কাটিয়েছি। কিন্তু সে তো কখনই

এমন আচরণ করে নি। বরং আমাকে বলেছে—'পাওয়া আর না-পাওয়া নিয়েই জীবন। পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার দিকটা সব সময়েই বড়। কিন্তু চরম প্রতিকূলতার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানই তো জীবনধারণ!'

সেই মানসী আজ এমন উতলা হয়ে উঠল কেন?

অথচ সেদিন সন্ধ্যায় বঙ্কুবিহারী মন্দিরের সামনে ওর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই আমার মনে হয়েছে, সে আগের তুলনায় আরও ধীর স্থির ও শান্ত হয়েছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। তাহলে আজ সে এমন আচরণ করল কেন?

"শিগ্‌গীর ধরো, হাত পুড়ে গেল!" মানসী চা নিয়ে ঘরে ঢোকে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে হাত বাড়িয়ে চা-য়ের ভাঁড়টা নিই। মানসী খাবারগুলো নিয়ে ঘরের কোণে যায়। একখানি থালায় কয়েকটা সিঙ্গারা সাজাচ্ছে সে। আমি আঁতকে উঠি। বলি, "সেকি! আমাকে দিচ্ছো নাকি?"

"তুমি বুঝি ভেবেছো, নিজে খাব বলে এগুলি দোকান থেকে নিয়ে এলাম!"

"না। আমি ভেবেছিলাম খুকুর জন্য এনেছো।"

"খুকুকে আমি ভাজা-পোড়া খেতে দিই না। ওর আবার লিভারের দোষ আছে কিনা!"

"আর আমার যাতে সে দোষ হয়, কিংবা অসুখে পড়ে যাতে যাত্রা পণ্ড হয়, তাই বোধহয় আমার জন্য এগুলো নিয়ে এলে?"

"তাছাড়া আর কি? তুমি যে আমার পরম শত্রু! জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু!" সে এগিয়ে আসে আমার কাছে। থালাখানা সামনে রেখে বলে, "বক্‌বক্ না করে চটপট খেয়ে নাও তো, নইলে জুড়িয়ে যাবে।"

"কিন্তু আমি যে এখন কিছুতেই খেতে পারব না মানসী!" আমি তাকে শাস্ত্রীজীর নিমন্ত্রণের কথা বলি।

সব শুনে সে বলে, "থাক্, তাহলে খেয়ে দরকার নেই। অসুখ-

বিসুখ হয়ে পড়লে তো আবার আমাকেই ঝামেলা পোহাতে হবে। আর তাহলে তোমার বন-পরিক্রমাও হবে না। দরকার নেই বাপু তোমার সহযাত্রীদের অভিশাপ কুড়িয়ে।" সে থালাটা রেখে দিয়ে আসে।

আমি বলি, "রেখে দিলে কেন? ওগুলো যে সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! তার চেয়ে তুমি খেয়ে নাও না!"

হেসে ফেলে মানসী। কারণ বুঝতে পারি না। আমি তাকিয়ে থাকি তার দিকে। সে ফিরে আসে আমার কাছে। বলে, "না, সত্যি, তোমার আর বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে না কোনকালে।"

"কেমন করে বুঝলে বলো তো?" কপট গম্ভীর স্বরে বলি।

সে হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করে, "আমি দোকানের সিঙ্গারা খাব?"

"কোন দোষ আছে কি?"

"আছে বৈকি!"

"কিন্তু তুমি তো খেতে!"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে মানসী। তারপরে ভারী স্বরে বলে, "তোমার সে মানসী যে মরে গেছে সখা!"

"না, মরে নি।" আমি তার একখানি হাত ধরি। সে আমার দিকে তাকায়। ওর চোখে চোখ পড়ে আমার।

অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধস্বরে বলি, "তবে আমার মানসী একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু করুণাময় বৃন্দাবনচন্দ্রের কৃপায় যখন তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে, তখন তাকে আমি ভাল করে তুলব। তাকে কিছুতেই আত্মহত্যা করতে দেব না।"

হাত ছাড়িয়ে নেয় মানসী। কিন্তু চলে যায় না। বরং আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে। তারপর ক্ষীণস্বরে বলে, "এ তুমি কি বলছো?"

"ঠিকই বলছি।" তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিই। "একে আত্মহত্যা ছাড়া..."

'ছিঃ!" মানসী একখানা হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে। বলে, "অমন কথা বলতে নেই সখা। প্রেমামৃত রসার্ণব, শ্রীরাসরাসেশ্বরের শ্রীচরণবিন্দে আমি আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, একে তুমি আত্মহত্যা বলছো কেন?"

ভাবি, তাহলে একটু আগে আমার জন্য অমন উতলা হয়েছিলে কেন?

মানসী বলে, "আমি জানি, তুমি কি ভাবছো?"

"কি বলো তো?"

"সখা, আমার প্রাণের ঠাকুর যে বড়ই উদার! তাকে অশ্রদ্ধা না করে আর কাউকে ভালোবাসলে, এমন কি তার জন্য উতলা হলেও তিনি কিছু মনে করেন না।...কারণ কি জানো?"

"কি?"

"তিনি যে তোমার মতো হিংসুক নন।"

আমি আর গম্ভীর থাকতে পারি না। হেসে বলি, "আমি তোমার ঠাকুরকে হিংসে করি, একথা কে বললে তোমাকে?"

"বলবে আবার কে? আমি নিজেই বুঝতে পারি।" একবার থামে সে। তারপরে সহসা কণ্ঠস্বরকে সতেজ ও স্বাভাবিক করে তুলে আবার বলে, "যাক্‌গে, এবার কাজের কথায় আসা যাক্‌। কবে রওনা হচ্ছো?"

"তরশু সকালে।"

"গোছগাছ হয়ে গেছে?"

"গোছগাছের আবার কি আছে? যা সঙ্গে এনেছি সবই নিয়ে যাব।"

"বিছানা কি এনেছো? এয়ার-ম্যাট্রেস আর স্লিপিং-ব্যাগ?

"এয়ার-ম্যাট্রেস আর দু'খানা কম্বল।"

কি যেন একটু ভাবে মানসী। তারপরে বলে, "স্লীপিং-ব্যাগটা আনলে না কেন?" কিন্তু আমি কিছু বলার আগে নিজেই আবার

বলে "যাক্ গে, আনো নি যখন, সেকথা জিজ্ঞেস করে লাভ কি? গরম জামা-কাপড় সব এনেছো তো?"

"মোটামুটি।"

"ঠিক কথা, এক জোড়া হাওয়াই চপ্পল সঙ্গে নিও। রাতে তো বটেই, দিনের বেলায়ও অসুবিধে হলে পায়ে দিও। তাতে কোন পাপ হবে না।"

আমি মাথা নেড়ে তার প্রস্তাব মেনে নিই।

সে আবার বলে, "টুপি নেওয়াটা ভাল দেখাবে না। তুমি সব সময় গামছাটা সঙ্গে রাখবে। বেশি রোদ হলে মাথায় বেঁধে নেবে। আর, কালো চশমটা এনেছো তো?"

"হ্যাঁ।"

"জলের বোতল, টর্চ, মোমবাতি···?"

"এনেছি।"

"ঠিক কথা" মানসী চেঁচিয়ে ওঠে, "ওষুধ···ওষুধ নিয়েছো তো? সেই হাঁপানির ওষুধটা?"

আমি নিঃশব্দে হাসতে থাকি। কোন উত্তর দিই না।

মানসী ক্ষেপে যায়। বলে, "কথা বলছো না কেন? নাও নি নিশ্চয়ই! অথচ কালও তোমাকে আমি এই একই কথা বলেছি।"

না, আর ক্ষেপানো উচিত হবে না। শান্তস্বরে বলি, "আমি কি কখনও তোমার অবাধ্য হয়েছি মানসী? ওষুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব কিছু সঙ্গে নিয়েছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

"কে জানে সত্যি কথা বলছো কিনা! কিন্তু কি করব, গিয়ে যে গুছিয়ে দিয়ে আসব, তার তো উপায় নেই। যাক্ গে, না নিলে কষ্ট পাবে আর কি! সহযাত্রীরা সবাই যে-যার নিজের ধান্দায় থাকবে। কেউ দেখবে না তোমাকে।"

"জানি মানসী! আমি জানি যে, আমার এবারের সহযাত্রীরা

কেউ দুঃসহ শীতের দুপুররাতে দীর্ঘ ও নির্জন পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়ে আমার জন্য ওষুধ নিয়ে আসবে না। তাই আমি সব কিছুই সঙ্গে নিয়েছি।"

মানসী চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবছে সে। কুলুর ট্যুরিস্ট-বাংলোর সেই রাতটির কথা কি?

মানসীর নীরবতা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একটু বাদেই সে কথা বলে এবং তা বলে সহজ ও স্বাভাবিক স্বরে। মানসী বলে, "বন-যাত্রার সময় তোমাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।"

"কি কাজ?" প্রশ্ন করি।

মানসী উত্তর দেয়, "সপ্তাহে অন্তত একখানি করে চিঠি লিখবে আমাকে।"

আমি অবাক হই তার প্রস্তাবে। কারণ, এর আগে আমরা কখনও পত্র-বিনিময় করি নি। তবু বলি, "বেশ, লিখব।"

"আর একটা কথা।"

'বলো।"

"আগে তুমি বলো, কথাটা রাখবে?"

"রাখব।"

"পরশু পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমার পরে আশ্রমে না ফিরে আমার এখানে চলে আসবে।"

"কারণটা জানতে পারি কি?"

"আমি সেদিন গোবিন্দ-মন্দিরে পুজো দেব।"

"আমার মঙ্গল-কামনায় বোধকরি?"

"হ্যাঁ।...আসবে তো?" মানসী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে আমার সম্মতি প্রতীক্ষা করছে।

হেসে বলি, "তাহলে কি পরশু দুপুরে আমাকে এখানেই খেতে হবে?"

"হ্যাঁ।" মানসী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

"খাবার পরে কি করতে হবে?"

"আমার সঙ্গে বেরুবে।"

"কোথায়?"

"দর্শনে।"

একটু সময় চুপ করে থাকি। মানসী বোধহয় ভয় পায়। কম্পিতকণ্ঠে সেই পুরনো প্রশ্ন করে, "আসবে তো?"

আমি তার মুখের দিকে তাকাই। শান্তস্বরে উত্তর দিই, "আসব।"

মানসী কথা বলে না. হয়তো বলার মতো কোন কথা পাচ্ছে না খুঁজে। সে শুধু অপলক নয়নে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, তার চোখে পরম-প্রাপ্তির পরশ।

॥ এগারো ॥

নাট-মন্দিরের সামনে একটা জটলা। কি ব্যাপার! প্রভাতী কীর্তন শুরু হয়ে গেছে, আর এঁরা এই শীতে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

কাছে এসেই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। একজন অ-ভারতীয় তরুণকে ঘিরে ভক্ত ও শিষ্যদের সমাবেশ। ছেলেটির বয়স বড়-জোর আঠারো। এখনও দাড়ি গজায় নি, কেবল গোঁফের রেখা পড়েছে। মাথায় লম্বা চুল, পা দুটি পাদুকাহীন। পরনে হাঁটু সমান সাদা বহির্বাস। গায়ে একটি সাদা ফতুয়া। গলায় দু'গাছা তুলসীর মালা। সুন্দর তিলক কেটেছে সে। তার হাতে হরিনামের ঝুলি। কাঁধে কাপড়ের থলি। না, যা ভেবেছিলাম তা নয়, ছেলেটি 'হিপি' নয়। তার সঙ্গে কোন লুঙ্গি-পরিহিতা সঙ্গিনী নেই। সে আমেরিকান বৈষ্ণব—শ্রীভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজের শিষ্য। স্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীচৈতন্য মঠের সভাপতি শ্রীমদ্ ভক্তি-বিলাস তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীবন মহারাজের গুরুভাই। এঁরা সকলেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সুযোগ্য সন্তান, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিষ্য। মাত্র বছর পাঁচেক আগে স্বামী মহারাজ হরিনাম প্রচারের উদ্দেশে কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকা গিয়েছিলেন। এই সামান্য সময়ে তিনি সেখানে প্রায় পঞ্চাশটি মন্দির ও প্রচার-কেন্দ্র খুলেছেন। হাজার হাজার আমেরিকানকে শিষ্য করে সেখানে হরিনামের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। 'ব্যাক্ টু গড হেড' বলে একটি মাসিক কাগজ ও 'ইন্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কন্‌সাস্‌নেস' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই ছেলেটি তাঁরই শিষ্য। শুনলাম, সে আমেরিকা থেকে

বিমানে বিলেত এসেছে। কিন্তু সেখান থেকে শূন্যহাতে স্থলপথে এসেছে ভারতে—শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেশে।

কখনও হেঁটেছে, কখনও বা কোন সদাশয় চালক তাঁর গাড়িতে করে নিজের পথে তাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়েছে। কোনদিন ছেলেটির খাবার জুটেছে, কোনদিন জোটে নি। কোন রাতে সে শোবার মতো একটু জায়গা পেয়েছে, কোন রাতে পায় নি। সে রোদে পুড়েছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে, শীতে কেঁপেছে, কিন্তু পথ-চলা বন্ধ করে নি।

অবশেষে সে পৌঁছেছে দিল্লী। সেখান থেকে একটি আগ্রাগামী ট্রাকে চড়ে মথুরা। দর্শন করেছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ও বিশ্রামঘাট। বিশ্রামঘাটে বিশ্রাম করবার সময় শুনেছে আমাদের এই বন-পরিক্রমার কথা। তাড়াতাড়ি মথুরা স্টেশনে ট্রেনে চড়ে বসেছে। রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় কালকের রাতটা সে বৃন্দাবন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটিয়েছে। আজ সকাল না হতেই বেড়িয়ে পড়েছে পথে। মাইকের শব্দ অনুসরণ করে এসে পৌঁছেছে আশ্রমে। ভাগ্যিস, বৃন্দাবন মহারাজ মাইকের ব্যবস্থা করেছিলেন!

প্রশ্ন-বাণ নিক্ষেপরত ভক্ত-বৈষ্ণবদের এড়িয়ে ছেলেটি উঠে আসে নাট-মন্দিরে। গিয়ে বসে দেওয়ালের ধারে। তারপরে চোখ বুজে মুখ নাড়তে শুরু করে। সে-ও কীর্তন করছে কি?

মনে পড়ছে কার্ল উলরিখ-য়ের কথা। জার্মানীর ওবেরামের্গো থেকে এসেছিল সে। যমুনোত্রীর পথে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে।*

কিন্তু সে তো সব হারিয়ে হিমালয়ে এসেছিল শান্তির জন্য। এই আমেরিকান ছেলেটির এ বয়সে তো কিছু হারাবার প্রশ্ন উঠতে পারে না! বরং এই আসার জন্যই হয়তো তাকে সব কিছু হারাতে হতে পারে।

তাহলে কেন এলো সে?

কীর্তন শেষ হল। এবারে সংকীর্তন শোভাযাত্রা শুরু হবে। আজ আমরা শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা-লীলাস্থল ভাতরোল দর্শন করে অক্রূরতীর্থে যাব। অনেকটা দূর বলে আজ আর প্রভাতী পাঠের আসর বসল না। লীলাস্থলে বসেই মহারাজরা কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করবেন।

সকাল ঠিক সাড়ে সাতটায় কীর্তন করতে করতে পথে নেমে এলাম। আমেরিকান ছেলেটিও চলেছে আমাদের সঙ্গে। সঙ্গী হবার জন্যই যে সে এসেছে বৃন্দাবনে। আজ তার বড় আনন্দের দিন—সে বৃন্দাবনে এসেছে, কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করছে।

কর্ণেল আজ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিয়েছেন। কাল বিকেলে বাজারে গিয়ে তিনি এই দেশী পোশাক সংগ্রহ করেছেন। পাঞ্জাবিটা লম্বায় একটু ছোট হয়েছে। উপায় কি? ভদ্রলোক যে ছ'ফুটের ওপরে লম্বা! বৃন্দাবন-ধামে তাঁর মাপের পাঞ্জাবি বড় একটা বিক্রি হয় না। অথচ কাপড় কিনে বানিয়ে নেবার সময়ও ছিল না হাতে। কাজেই তিনি খাটো পাঞ্জাবি পরেই সঙ্গী হয়েছেন আমাদের। তবে তাতে তাঁর কিছুই ক্ষতি হয় নি। এখানে কেউ জামা-কাপড়ের দিকে নজর দেয় না।

আজ আমরা বৃন্দাবন শহরের বিপরীত দিকে অর্থাৎ মথুরা রোড ধরে মথুরার দিকে চলেছি। অনেকটা হাঁটতে হবে বলে আজ শোভাযাত্রার গতিবেগ ক্ষিপ্রতর।

ডানদিকে মোদী-ভবন ও বাঁদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। মোদী-ভবন বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গেস্ট-হাউস। সাহিত্য সম্মেলনের সময় আমরা এখানে ছিলাম।

মোদী-ভবনের পরে পথের ডানদিকে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম ও জয়পুরের মহারাজার মন্দির। আশ্রম বললে আমাদের মানসলোকে যে মনোহারী মূর্তিটি ভেসে ওঠে, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম ঠিক তাই। সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই পথের দু'ধারে চমৎকার বাগান। বাগানের পরে নাট-মন্দির ও মন্দির—একই সঙ্গে।

মন্দিরটি তিন ভাগে বিভক্ত। গর্ভ-মন্দিরে রাধা কৃষ্ণের মূর্তি। নাট-মন্দিরের নিচে কয়েকটি কুঠরি আছে। সেখানে সন্ন্যাসীরা তপস্যা ও ভজন করেন।

মন্দিরের পেছনেও বাগান। তারই মাঝে সন্ন্যাসীদের বাসগৃহ। স্কুল ও ছাত্রাবাস। মা এখানে এলে মন্দিরের ঠিক পেছনে কুটিরাকৃতি একটি ছোট বাড়িতে বাস করেন। এখন তিনি কাশীতে রয়েছেন। অন্নকুট উৎসবের পরে বৃন্দাবনে আসবেন। সংযম-সপ্তাহ পালন করবেন।

মন্দির বা ছাত্রাবাস নয়। বাগানের দিকে নজর পড়লেই এ আশ্রমকে অসাধারণ বলে মনে হবে। আর নজর না পড়ে উপায়ও নেই। কারণ, মন্দির ও বাড়ি ক'খানি ছাড়া সবটাই বাগান। বোধহয় কানন বলাই উচিত হবে। সমস্ত আশ্রমটি ছায়া-শীতল শান্তির নীড়। ভেতরে গেলে আপনা থেকেই মনটা ব্রহ্মলোকে চলে যায়—চারিপাশে সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। হৃদয় আনন্দময় হয়ে ওঠে, আর মাকে আনন্দময়ী বলে মনে হয়।

আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম ছাড়িয়ে জয়পুরের মহারাজার মন্দির। বৃন্দাবনের ইতিহাসে জয়পুরের অবদান অমূল্য। সমস্ত ঐতিহাসিক-গণ আজ দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করেন যে, বৃন্দাবন যদিও পৌরাণিক যুগের জনপদ, তাহলেও বৌদ্ধধর্মের প্রসাব এবং মুসলমান সম্রাটদের অত্যাচারের ফলে বৃন্দাবন তথা প্রায় সমগ্র ব্রজমণ্ডল লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আদেশে শ্রীরূপ-সনাতন ও অন্যান্য গৌড়ীয় গোস্বামিগণ ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবনকে আবার প্রকট করে তোলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার প্রথম ও প্রধান সহায়ক ছিলেন জয়পুরাধিপতি মহারাজা মানসিংহ এবং সেই থেকেই জয়পুরের মহারাজারা চিরকাল বৃন্দাবনের উন্নতি ও ব্রজমণ্ডল রক্ষার চেষ্টা করে এসেছেন। আওরঙ্গজেবের আক্রমণের আগে জয়পুরের তৎকালীন মহারাজা বৃন্দাবনের অধিকাংশ মূল-বিগ্রহ সরিয়ে

নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন বৃন্দাবন-বন্ধু গ্রাউস সাহেব গোবিন্দ-মন্দির সংস্কারের পরিকল্পনা করেন, তখনও তৎকালীন জয়পুরের মহারাজা তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা দিয়েই গ্রাউস সংস্কারকার্য আরম্ভ করেন।

জয়পুরের সঙ্গে বৃন্দাবনের রাজনৈতিক সম্পর্ক সুপ্রাচীন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জয়পুরের মহারাজারা আগ্রা প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন। বৃন্দাবনের প্রাচীনতম অট্টালিকা আদালত—স্থানীয় ভাষায় 'ঘেরা' এই সময় নির্মিত। এটি ছিল তৎকালীন রাজ্যপাল (জয়পুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা) মহারাজা জয়সিংহের (১৭২১-১৭২৮ খ্রীঃ) বৃন্দাবন নিবাস।

যাক্‌গে, যেকথা বলছিলাম, মন্দির হিসেবে এখন খুব জনপ্রিয় না হলেও জয়পুরের মহারাজার মন্দির বৃন্দাবনে অবশ্য দর্শনীয়। প্রকাণ্ড মন্দির-তোরণ। তার পরে পাথর-বাঁধানো পথ দিয়ে অনেকটা হেঁটে গিয়ে সুবিশাল ও সুন্দর মন্দির। অপূর্ব খোদাই কাজ মন্দিরের সারা গায়ে।

গর্ভ-মন্দিরের মূল-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দ। ডানদিকে হংসবিহারী, বাঁদিকে আনন্দবিহারী ও গিরিধারী—গিরিরাজ গোবর্ধনকে ধারণ করে আছেন।

জয়পুরের মন্দিরকে ডানদিকে রেখে মথুরা রোড ধরে আমরা চলেছি এগিয়ে। চলেছি কীর্তন করতে করতে। এই পথটি নির্মিত হয়েছে হালে—ইংরেজ আমলে। প্রাচীন পথ ছিল যমুনার তীর দিয়ে। এখনও বৃন্দাবন থেকে প্রায় মাইল চারেক পর্যন্ত সে পথকে খুঁজে পাওয়া যায়। আগামীকাল বৃক্ষাচ্ছাদিত সেই যমুনা-বিধৌত পথ দিয়েই আমরা পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করব। প্রাচীন পথের পাশেই অক্রূরগ্রাম। সেই গ্রামেই অক্রূর-ঘাট ও ভাতরোল—আপাতত আমাদের গন্তব্যস্থল

আশ্রম থেকে প্রায় মাইলখানেক হেঁটে বৃন্দাবন শহরের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি আমরা। এখানেই বৃন্দাবনযাত্রীদের

কাছ থেকে চুঙ্গী বা 'অকট্রয় ট্যাক্স' আদায় করা হয়। সেই শালবল্লীর 'গেট' ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়েই একটি আধ-পাকা পথ—আড়া-আড়িভাবে বড় রাস্তাকে অতিক্রম করেছে। এটিই পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমার পথ। আমরা সেই পাথরকুচির পথে বাঁদিকে এগিয়ে চললাম। পাথরকুচি পায়ে বিঁধছে। কিন্তু পায়ের যন্ত্রণায় থামবার অবকাশ নেই। সহযাত্রীদের সঙ্গে কীর্তন করতে করতে সবেগে এগিয়ে যেতে হচ্ছে—আমি যে ব্রজযাত্রী, দামোদর ব্রতধারী ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে তীর্থ দর্শন করছি।

পথের দু'দিকেই মাঠ। মাঝে দু'একটি কুটির ও ভগ্ন-মন্দিরের ভেঙে-পড়া দেওয়ালের চিহ্ন। এরই কোনখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাণী অহল্যা বাঈ নির্মিত বাগিচা ছিল।

প্রায় মাইল আধেক হেঁটে আমরা ডানদিকে মাঠের মধ্যে নেমে এলাম। মাটির কাঁচা পথ, ধুলো উড়ছে অবিরত। কিন্তু বিপদটা ঠিক ধুলোর জন্যে নয়। বৃন্দাবনে আসার পর থেকে এ ক'দিন আমার নাক, চোখ ও মুখ দিয়ে এত ধুলো গ্রহণ করেছি যে, ধুলোকে আর মোটেই ধুলো বলে মনে করছি না। বরং পুণ্যময় ব্রজরজঃ বলেই ভাবতে শুরু করেছি। বিপদ হয়েছে কাঁটার জন্য—পথের দু'ধারেই কাঁটাবন এবং পথের ওপরে সেই কাঁটার ছড়াছড়ি। শুনেছি ধুলোর মতো এই কাঁটা বস্তুটিকেও অগ্রাহ্য করতে না পারলে বন-পরিক্রমা করা যায় না। কারণ, বৈকুণ্ঠের পথ চিরকালই কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু এখনও আমাদের প্রকৃত বন-পরিক্রমা শুরু হয় নি কিনা, তাই পা দু'খানি কণ্টকাঘাত সইতে সক্ষম হচ্ছে না। পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে।

তাহলেও সেকথা কাউকে বলা যাচ্ছে না। কারণ, কেউ বলছেন না। সম্ভবতঃ তীর্থ পরিক্রমাকালে পথকষ্টের কথা উচ্চারণ করতে নেই। তাতে পুণ্যের পরিমাণ কমে যায়। অতএব মুখে যতটা সম্ভব সানন্দভাব প্রকট করে এগিয়ে চলেছি।

মাঠ ভাঙা শুরু করার প্রায় আধঘণ্টা বাদে আমরা একটি

মন্দিরের সামনে পৌঁছলাম। মাঠের মাঝখানে টিলার ওপরে, অনেকটা উঁচুতে মন্দির—ভাতরোলের মন্দির।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। ছোট তোরণ পেরিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ আর একপাশে একটি নিমগাছ। চারিদিক দেওয়াল-ঘেরা। ছোট মন্দির, কিন্তু বেশ উঁচু। ইটের তৈরি, কাজেই প্রাচীন নয়। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে আমরা মন্দিরের বারান্দায় এলাম। মন্দিরের সামনে হিন্দীতে লেখা—'শ্রীবিষ্ণুস্বামী পীঠ'। ছোট বারান্দা, কাজেই ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। তারই মাঝে গর্ভ-মন্দিরের দিকে তাকাই। সিংহাসনে শুধু শ্রীরাধিকার প্রস্তরমূর্তি। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেলেন? এটি তো কৃষ্ণলীলাস্থল!

মন্দিরের পুরোহিত জানালেন, কয়েকদিন আগে কে বা কারা মন্দিরের তালা ভেঙে কৃষ্ণমূর্তিটি চুরি করে নিয়ে গেছে। চারিদিক জনশূন্য বলে এখানে রাতে কোন লোক থাকে না। তবে কৃষ্ণ অপহরণকারীরা রাধারাণীকে কেন রেখে গেছে, তা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

দর্শন শেষে আমরা নেমে আসি মন্দির-প্রাঙ্গণে। পূজারী একখানি ছেঁড়া পর্দা টাঙিয়ে দিলেন গর্ভ-মন্দিরের দ্বারে—শ্রীরাধিকা ঢাকা পড়ে গেলেন। আমরা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাই। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। উত্তরে মথুরা রোড, দক্ষিণে যমুনার নীলধারা। চারিপাশেই শস্যক্ষেত্র, এখন অবশ্য শস্যহীন।

মন্দিরশীর্ষে একটি লাল পাথরের পদ্ম। আর একটা কাঠের খুঁটিতে বাঁধা একগুচ্ছ ময়ূরপুচ্ছ। সেই খুঁটির মাথায় দড়ির সাহায্যে 'আকাশ-প্রদীপ' তথা একটি লণ্ঠন টাঙিয়ে দেওয়া হয় প্রতিরাতে। মথুরা রোড থেকে সেই আলোকশিখাটি বড় সুন্দর দেখায়—মনে হয় অন্ধকার দিগন্তের একক নক্ষত্র।

কীর্তন শেষে আমরা মন্দির-প্রাঙ্গণে বসে পড়লাম। গুরুমহারাজ বলতে শুরু করলেন, "আপনারা সকলেই জানেন যে, ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ এই পুণ্যক্ষেত্রে অন্নভিক্ষা লীলা করেছিলেন। বস্ত্রহরণ লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণ সেই লীলা করেছেন।" থামলেন গুরুমহারাজ। কাল তিনি অসুস্থ ছিলেন, আজও সম্পূর্ণ সুস্থ নন। তবু এতটা পথ এসেছেন আমাদের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, নিজেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী বর্ণনা করছেন।

গুরুমহারাজ আবার বলতে আরম্ভ করেন, "তখন গ্রীষ্মকাল, বলরাম ও সখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে এসেছেন। কিন্তু সেদিন তাঁরা দুপুরের খাবার আনতে ভুলে গেছেন। স্বাভাবিক-ভাবেই সখাদের খিদে পেল। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে খেতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'ওখানে গিয়ে দেখ, বেদ-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ অথচ বেদজ্ঞ অভিমানী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ-কামনায় যজ্ঞ করছেন। তোমরা তাঁদের কাছে গিয়ে অন্ন-ভিক্ষা কর।'

"অহঙ্কারী ব্রাহ্মণগণ কিন্তু তাঁদের প্রার্থনায় কর্ণপাত পর্যন্ত করলেন না। সখারা খালিহাতে ফিরে এলেন। তাঁরা হতাশকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন সেকথা। কৃষ্ণ তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বন্ধুগণ, ভিক্ষার্থীর অভিমান করা অন্যায়। তোমরা ব্রাহ্মণীদের কাছে যাও। আমার কথা বললে, তাঁরা তোমাদের ফিরিয়ে দেবেন না।'

"সখাদের কাছ থেকে ক্ষুধার্ত শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে দ্বিজকামিনীগণ অধীরা হয়ে উঠলেন। তাঁরা পতিদের নিষেধ অমান্য করে বহু উপাদেয় ভোজ্যবস্তু নিয়ে ছুটে এলেন এখানে। অনন্যচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্না হলেন।

"ভগবান সানন্দে সে ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করে ব্রাহ্মণগৃহিণীদের ঘরে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু তাঁরা বললেন, 'আমরা স্বামীদের নিষেধ অমান্য করে আপনার সেবা করতে এসেছি। স্বামিগৃহে আর আমাদের ঠাঁই হবে না। আপনি আমাদের পায়ে স্থান দিন!'

"শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আপনারা ভুল করছেন। আমার সেবা করার শুভেচ্ছা নিয়ে আপনারা এখানে এসেছেন। তাঁরা আপনাদের কিছুই বলতে পারবেন না। আপনারা ঘরে যান এবং ঘরে

বসেই আমাতে চিত্ত-সংযোগ করুন। তাহলেই আপনারা আমাকে পাবেন।'

"ভগবানের আদেশে ব্রাহ্মণীরা ঘরে ফিরে গেলেন এবং ব্রাহ্মণগণ সানন্দে তাঁদের গ্রহণ করলেন।"

"জয় রাধে, জয়......" চক্রবর্তী ছ'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল। জানি না ছেঁড়া পর্দার পেছন থেকে শ্রীরাধিকা সে জয়ধ্বনি শুনতে পেলেন কিনা! তবে গুরুমহারাজ বোধকরি তার ধ্বনি শুনে একটু বিরক্ত হলেন। বিরক্তকণ্ঠে তিনি বললেন, "চলো, এবার রওনা হওয়া যাক্। কীর্তন শুরু কর।"

শুরু হল কীর্তন। কীর্তন করতে করতে নেমে এলাম নিচে। এগিয়ে চললাম সেই কণ্টকাকীর্ণ পথে। মিনিট পনেরো পরে আমরা পৌঁছলাম অক্রূরঘাটে। ঘাট রয়েছে, কিন্তু যমুনা নেই। যমুনা সরে গেছে বহু দূরে। সেকালে যমুনার তীরেই তৈরি হয়েছিল মন্দির। সেই মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি আমরা।

দেওয়াল-ঘেরা মন্দির। ভেতরে ঢুকেই বাঁধানো উঠান। মাঝখানে একটা কুয়ো। সকলেই তৃষ্ণার্ত। কাজেই সতৃষ্ণ-নয়নে আমরা কুয়োর দিকে তাকাই। গুরুমহারাজ বলেন, "আগে দর্শন হয়ে যাক্, তারপরে জল খাবেন।"

মন্দিরের ঠিক সামনে একটি নিমগাছ। তারপরে উঁচু একফালি বাঁধানো জায়গা। যারা ঠেলাঠেলি সইতে পারি না, তারা বসে পড়ি সেখানে।

একটু বাদে জানকী ও বৌদিকে নিয়ে উঠে এলাম বারান্দায়। বারান্দার পরে গর্ভ-মন্দির। ছোট হলেও সুন্দর। কারুকার্যময় পাথরের মন্দির। মধ্যস্থলে দাড়ি-গোঁফ ও জটাজূট কৃষ্ণভক্ত অক্রূরের দণ্ডায়মান মূর্তি। তাঁর পেছনে ছ'পাশে শ্বেত-পাথরের ছটি বলদেব মূর্তি। আর তার পেছনে, দেওয়ালের ধারে কালো পাথরের বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ এবং বলরামও দাঁড়িয়ে আছেন।

দর্শনের পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করে আমরা কুয়োতলায় এলাম।

মন্দিরের জনৈক পূজারী কুয়ো থেকে জল তুলে দিলেন। শীতল জল পান করে আমাদের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

আমরা নিমের ছায়ায় এসে বসে পড়লাম। আর চক্রবর্তী কয়েকজন উৎসাহী ভক্তকে নিয়ে ঘাট দর্শন করতে চলল। খুব দূরে নয়। কিন্তু একেবারে কাঁটাবনের ভেতরে।

আমাদের বসে থাকতে দেখেই বোধহয় ভক্তি মহারাজ এসে পাশে বসলেন। এবং কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলতে শুরু করলেন, "কৃষ্ণ ভগবান এগারো বছর আট মাস ও দশদিন বয়সে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি আর বৃন্দাবনে ফিরে আসেন নি। কিন্তু এসব হল স্থূল কথা, আপনারা যাকে বলেন 'হিস্ট্রি', মানে ইতিহাস। আসলে সে যাওয়া তো যাওয়া নয়। বৃন্দাবনচন্দ্র বৃন্দাবনেই চিরবিরাজমান। স্থূলভাবে অবশ্য তিনি গোপ ও গোপীদের বিরহসাগরে নিমজ্জিত করে মথুরায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিরহ তো মিলনের আর এক রূপ। বিরহেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তাই বিরহহীন দ্বারকায় বাষট্টি প্রকারের গুণ, লীলাভূমি মথুরায় তেষট্টি প্রকারের রস আর বিরহময় বৃন্দাবনে চৌষট্টি প্রকারের রস।

"কৃষ্ণময় বৃন্দাবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ এই অক্রূরঘাট। তাই আমরা 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' দেখতে পাই যে—

একদিন অক্রুর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে—॥
এই ঘাটে অক্রুর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥"

থামলেন ভক্তি মহারাজ। আমি নম্রস্বরে বলি, "ভারী ভাল লাগল শুনতে!'

"লাগবেই তো।" মহারাজ বলেন, "শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ সর্বদা অমৃতবৎ। আচ্ছা চলুন, এবারে যাওয়া যাক্। ওরা রওনা হচ্ছে।"

আমরা রওনা হলাম বৃন্দাবনের পথে—সেই কাঁটা আর পাথরের পথে। কীর্তন করতে করতে পথ চলি। আমার কিন্তু কীর্তনে মন নেই। আমি আপন মনে ভেবে চলি সেই কাহিনী—

একদিন হঠাৎ দেবর্ষি নারদ এসে হাজির হলেন কংসের কাছে। কথায় কথায় তাঁকে জানালেন, রোহিণীর পুত্র বলরামই দেবকীর সপ্তম সন্তান। দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হয় নি। যশোদার পুত্র নামে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র। বসুদেব কংসের ভয়ে নিজের ছেলেকে যশোদার কাছে রেখে, তাঁর মেয়েকে এনে কংসের হাতে দিয়েছিলেন।

কংস তখুনি বসুদেবকে হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু নারদ তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন। কংস বসুদেবকে হত্যা করলেন না বটে, কিন্তু বসুদেব ও দেবকীকে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তারপরে বলরাম ও কৃষ্ণকে বধ করবার জন্য কেশীদৈত্যকে বৃন্দাবনে পাঠালেন।

কেশীদৈত্য বৃন্দাবনে এসে অশ্বমূর্তি নিয়ে ভীষণ চিৎকার করে ব্রজবাসীদের ভয় দেখাতে লাগল। একদিন শ্রীকৃষ্ণ তার সামনে এসে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। ছুটে এসে কেশী কৃষ্ণকে পদাঘাত করল, কিন্তু কৃষ্ণের তাতে কিছুই হল না। তারপরে কৃষ্ণ তার পা দুটি ধরে কয়েকবার শূন্যে ঘুরিয়ে তাকে দূরে ছুঁড়ে মারলেন। কেশী জ্ঞান হারিয়ে ফেলল, কিন্তু মরল না। একটু বাদে জ্ঞান ফিরে আসতেই সে প্রকাণ্ড হাঁ করে কৃষ্ণকে গিলতে এলো। কৃষ্ণ তখন তার মুখের মধ্যে বাঁ হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দম বন্ধ হয়ে কেশী মারা গেল। সেই কেশী-বধ স্থানই এখন কেশীঘাট নামে

প্রসিদ্ধ। এটি বৃন্দাবনের বৃহত্তম ঘাট। আমরা আগামীকাল স্নান করব সেখানে।

কিন্তু না, কেশীঘাট নয়। ভেবে চলি অক্রূরঘাটের কথা। কেশীদৈত্য নিহত হবার পরে ব্রজধামে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল। আর কংস হলেন অনুচরহীন। তখন তিনি কৃষ্ণ ও বলরামকে মেরে ফেলবার জন্য এক নতুন ফাঁদ পাতলেন। তিনি এক ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করলেন। ঠিক হল—কৃষ্ণ ও বলরামকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে এসে হাতীর পায়ের নিচে পিষে মেরে ফেলা হবে। যদি তা-ও না পারা যায়, তাহলে মল্লযোদ্ধারা তাঁদের হত্যা করবে। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরামকে আনতে যাবে কে? যার-তার কথায় তো আর তাঁরা মথুরায় আসবেন না!

কংস তখন কৃষ্ণের কাকা অক্রূরকে ডেকে পাঠালেন। অক্রূরকে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন। অক্রূর যে শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত, একথা জানা ছিল না তাঁর।

পরদিন সকালে অক্রূর রথে চড়ে গোকুল যাত্রা করলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি নন্দালয়ে পৌঁছলেন। তিনি কৃষ্ণ ও বলরামকে কংসের পরিকল্পনার কথা বললেন। সব শুনে তাঁরা একটু হাসলেন। শ্রীকৃষ্ণ তারপরে মহারাজ নন্দকে বললেন, 'বাবা, কংস তাঁর ধনুর্যজ্ঞে আমাদের আমন্ত্রণ করেছেন। আপনি অনুমতি দিন, আমরা মথুরায় যাব।'

নন্দ অনুমতি দিলেন। তাঁর আদেশে মথুরা যাত্রার আয়োজন শুরু হল। খুব তাড়াতাড়ি সংবাদটা রটে গেল চারিদিকে। গোপগণ স্থির করলেন তাঁরাও মহারাজ নন্দকে নিয়ে রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে মথুরায় যাবেন। কিন্তু গোপীগণ?

তাঁরা তো আর কংসালয়ে যেতে পারেন না? তাঁরা 'ভীতাঃ বিরহকাতরাঃ সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখ্যোঽচ্যুতশ্রয়াঃ'—ভাবী বিরহে কাতরা, ভীতা ও অশ্রুমুখী হয়ে দলবদ্ধভাবে বিলাপ করতে থাকলেন। তাঁরা নিদারুণ বিরহবিধানকারী বিধাতাকে দোষ দিলেন।

তাঁদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল অক্রূরের ওপরে। বললেন, কৃষ্ণহরণকারী অক্রূরের নাম ক্রূর হওয়াই উচিত ছিল। তাঁরা মথুরার মেয়েদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে ঈর্ষান্বিতা হলেন। ভাবলেন, শহরের মার্জিতরুচি মনোহর রমণীদের কোমল বচনে মুগ্ধ হয়ে রাসবিহারী আর গ্রাম্য ও অচতুর ব্রজবালাদের কাছে ফিরে আসবেন না।

কৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্তা গোপীদের কৃষ্ণের ওপরে অভিমান হল। তাঁরা বললেন, 'নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ক্ষণভঙ্গুর। তিনি নিত্য নূতন রমণী-পিয়াসী। একদিন তিনি আমাদের প্রেমে বশীভূত করেছিলেন। আমরা ঘর ছেড়ে তাঁর দাসী হয়েছিলাম। আর আজ তিনি আমাদের ফেলে মথুবায় চলে যাচ্ছেন।'

শ্রীমদভাগবতের আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'সমগ্র ভাগবতে এই বিরহবর্ণনা সর্বাপেক্ষা করুণ।···এ তো দেহের বিচ্ছেদে দেহের ক্রন্দন নয়, পরমাত্মার বিরহে জীবাত্মার চিরকালের রোদনধ্বনি।'

সেই ধ্বনি একদিন কবি বিদ্যাপতির হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তাই তিনি লিখেছেন—

'তিমির দিক্ ভরি ঘোরা যামিনী
অথির বিজুলিকা পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঁয়ায়বি
হবি বিনে দিন রাতিয়া॥'

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম। কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবেন। গোকুলের আকাশ-বাতাস বিরহবিধুর, কিন্তু যাত্রার আয়োজনে বিরাম নেই এবং একসময়ে সে আয়োজন সম্পূর্ণ হল।

পরদিন সকালে অক্রূর রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে রথে উঠলেন। নন্দরাজ এবং অন্যান্য গোপগণও নিজ নিজ রথে চড়ে বসলেন। অক্রূর রথ ছেড়ে দিলেন। গোপীরা কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণের রথের পেছনে ছুটতে থাকলেন। একদিন যাঁরা নিতম্বের ভারে নিপীড়িতা হয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন নি, আজ তাঁরা রথের সঙ্গে সমানে

ছুটে চলেছেন—আজ যে তাঁরা পাগলিনী। আজ যে বিরহব্যথায় তাঁদের দেহ ও মন কৃষ্ণময়।

গোপীদের কাতর ক্রন্দনে শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হলেন। তিনি রথ থামিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, তিনি দূত পাঠিয়ে তাঁদের খবর নেবেন।

গোপীরা শান্ত হলেন। রথ আবার চলতে শুরু করল। গোপীরা সজল চোখে তাকিয়ে রইলেন। কৃষ্ণের রথ ক্রমেই দূর থেকে আরও দূরে চলে গেল। তবু তাঁরা অচল ও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রথের চূড়া অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁরা অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন রথের ধূলির দিকে। রাসবিহারীর রথের চাকায় যে উড়ছে ঐ ধূলি।

এক সময় তাও আর দেখা গেল না। তখন গোপীগণ—'কৃষ্ণ আবার ফিরে আসবেন,' এই আশায় বুক বেঁধে ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরে তাঁরা কৃষ্ণের রূপ গুণ ও লীলার কথা স্মরণ ও কীর্তন করে দিন কাটাতে থাকলেন।

এদিকে কৃষ্ণের রথ যমুনার তীরে উপস্থিত হল। রথ থামলে রাম ও কৃষ্ণ জল পান করে যমুনার তীরে পায়চারি করতে থাকলেন। আর অক্রূর জলে নামলেন স্নান করতে। তিনি যমুনায় ডুব দিলেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর সামনে রাম-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি। ভাবলেন, তাহলে তাঁরাও জলে নেমেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন রাম-কৃষ্ণ রথে বসে আছেন।

অক্রূর ভাবলেন, ভুল দেখেছেন। তিনি আবার জলে ডুব দিলেন। এবারে আরও বিস্ময়কর। তিনি দেখলেন—শ্রীরাম সহস্রশিরধারী অনন্ত দেবরূপে বিরাজ করছেন। আর তাঁর কোলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে বিরাজিত। তাঁর চার হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম। তিনি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে অক্রূরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভক্ত ঋষি মুনি ও দেব-দেবীগণ সেই পরমপুরুষের চারিদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর স্তব-স্তুতি করছেন।

এইভাবে অক্রূরের বৈকুণ্ঠ দর্শন হল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং পরমেশ্বর বলে জানতে পারলেন। তাই তিনিও জলে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করলেন। এবারে অক্রূরের সামনে ভগবানের জ্ঞানময় বিশ্বরূপ প্রকট হল।

তার পরেই সব কিছু গেল মিলিয়ে। অক্রূর আর কিছু দেখতে পেলেন না। তিনি স্নান সেরে জল থেকে উঠে এলেন। পূর্ণমনোরথ অক্রূর রথে উঠে বসলেন। রথ এগিয়ে চলল মথুরার পথে। সেদিন তাঁরা সন্ধ্যার আগেই পৌঁছেছিলেন মথুরায়।

কিন্তু মথুরার কথা এখন নয়, মথুরার কথা পরে হবে। আমি ভাবি আজকের কথা। আমরা বৈকুণ্ঠ দর্শন করি নি, কিন্তু পরম পুণ্যক্ষেত্র অক্রূরতীর্থ তো দর্শন করেছি। এতেই ধন্য হল জীবন—আমরা আজ ধন্য হলাম।

॥ বারো ॥

দুপুরে প্রসাদের পরে এঁটো বাসন হাতে বেরিয়ে আসি আশ্রমের বাইরে। রাস্তার ওপারে খানিকটা খালি জমি পড়ে আছে। বৃন্দাবন মহারাজ সেখানেই এঁটো ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন। যথারীতি আমরা সেখানে আসি, এবং যথারীতি আমাদের আগে তারাও পৌঁছে গেছে সেখানে।

না, মানুষ নয়। কলকাতায় উৎসবের বাড়ির সামনে উচ্ছিষ্টের জন্য যারা ভিড় করে, তারা বৃন্দাবনে অনুপস্থিত। তাই এখানে উচ্ছিষ্টভোজী সেই মানুষদের ভূমিকা নিয়েছে শুয়োর। মানুষের মতই উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ওরা। মানুষের মতই ওদের রাজ্যেও 'জোর যার, মুলুক তার' নীতি চালু হয়েছে। বড় শুয়োরটা ছোট শুয়োরগুলোব মুখের অন্ন কেড়ে খাচ্ছে।

দৃশ্যটা দর্শনীয় হলেও পুবনো হয়ে গেছে। দৈনিক দু'বেলা আমরা এ দৃশ্য দেখছি। কাজেই দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট না করে থালার এঁটো ছুঁড়ে ফেলে আমরা রাস্তার কলের দিকে এগিয়ে চলি।

কলের কাছে এসে দেখি, সেই পাঞ্জাবী মহিলা স্নান করছেন। তিনি সকালে স্নান করে দর্শনে বেবিয়েছিলেন, আবার স্নান করছেন। দৈনিক অন্তত তিনবার স্নান না করলে নাকি চলে না তাঁর। অথচ আশ্রমে জলাভাব। তাই ঘর ছেড়ে পথে এসেছেন।

কিন্তু তাতেও রেহাই পাচ্ছেন না। তরুণ সেবকরা যথারীতি ক্ষেপাচ্ছে ভদ্রমহিলাকে। বলছে, "বৃন্দাবনে যমুনাজী ছাড়া অন্য কোথাও স্নান করতে নেই ভক্ত-বৈষ্ণবের, আর তাই তো লটারীর টিকেটটা হারিয়ে গেল আপনার।"

গায়ে জল ঢালতে ঢালতেই ভদ্রমহিলা করুণ স্বরে তাদের বলছেন, "দাও না ভাই, আমার টিকেটটা দিয়ে দাও। কাল

রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমার ঐ টিকেটটাই এবার ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে, পাঁচ লাখ রূপয়া।······আচ্ছা, টিকেটটা দিয়ে দাও, আমি তোমাদের দশ হাজার রূপয়া দেব।”

ব্যাপারটা কি? আজ কাগজে দেখেছি, পাঞ্জাব স্টেট লটারীর ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। প্রথম পুরস্কার পাঁচ লাখ টাকা। তাহলে কি শুচিবায়ুগ্রস্থা এই মহিলাই সেই ভাগ্যবতী, আর তাঁর সেই টিকেটটাই সেবকরা হাতিয়েছে?

পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা জানকীকে কানে কানে জিজ্ঞেস করি কথাটা। সে চেঁচিয়ে উত্তর দেয়, “পাগলীর কথা ছেড়ে দিন, ওঁর সবই পাগলামো।”

“কিন্তু সেবকদের কেউ কি ওঁব টিকেট নিয়েছে নাকি?”

“না, না। তারা ওঁর টিকেট কোথায় পাবে? তবে ওঁর ধারণা হয়েছে টিকেটটা নাকি খোয়া গেছে, আর তাই সেবকরা ওঁকে ক্ষেপাচ্ছে।”

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই টিকেটের পালা চলল। আর ততক্ষণ আমাদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হল কলেব সামনে। তারপরে একসময়ে ভদ্রমহিলা কল ছাড়লেন। আমরা বাসন মেজে ও মুখ ধুয়ে ফিরে এলাম আশ্রমে।

বণিকপ্রভু এখনও শুয়ে রয়েছেন। তাঁর পেটটা নাকি আজও ঠিক হয় নি। স্ত্রী যথারীতি চিঁড়ে দই দিয়ে গেছেন। আজ অবশ্য তিনি দর্শনে বেরিয়েছিলেন—হেঁটে নয়, রিক্‌শা করে। তাই বোধহয় শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন।

কেষ্টপ্রভুও শুয়ে পড়েছেন। অদ্ভুত নিয়মানুবর্তিতা তাঁর দৈনন্দিন জীবনে। প্রায় প্রত্যেকটি আসরে তাঁকে গান গাইতে হয়। কিন্তু স্নান ও বিশ্রামটুকু ঠিক আছে। রাতে সবার আগে শুয়ে পড়েন। দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর নাসিকা-গর্জন শুনতে পাওয়া যায়। আবার সকালে সবার আগে ঘুম থেকে ওঠেন। তিনি স্নান সেরে ঘুম ভাঙান আমাদের।

হরিদাসপ্রভু যথারীতি তাঁর রাধারাণীর স্কেচ করে চলেছেন। যেমন-তেমন মূর্তি হলে তো চলবে না, তাঁর বাড়ির কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে মেলা চাই। কিন্তু কেন যেন স্কেচটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। তিনি আঁকছেন, আর ছিঁড়ে ফেলছেন। প্রসাদের পরে ওপরে এসেই আবার কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসে গেছেন।

চেকারপ্রভু আজ অনেকটা শান্ত। তাঁর শরীরটা নাকি ভাল নয়। ক'দিন ক্রমাগত হাঁটায় বাতের ব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তিনিও চুপচাপ শুয়ে আছেন।

মধু ব্রহ্মচারী যথারীতি 'স্টক্ ক্লিয়ার' করছে। ব্রহ্মচারীরা অনেকেই তার বন্ধু। ভক্তরা মহারাজদের যে-সব ফল ও মিষ্টি প্রণামী দেন, সেগুলি থাকে কয়েকজন ব্রহ্মচারীর কাছে। সেই 'স্পেশাল স্টক্' থেকে মধু একটা ভাগ পায়। প্রতিবার প্রসাদের পরে ওপরে এসে সে তার সেই 'পার্সোন্যাল স্টক্ ক্লিয়ার' করে। 'স্ট্যাণ্ডার্ড' খারাপ বলে সে নাকি আশ্রমের প্রসাদ পেট ভরে খেতে পারে না।

সেনবাবু এবং বোসবাবু গল্প করছেন। আমি তাঁদের পাশে বসি। যথারীতি চক্রবর্তী চেঁচিয়ে ওঠে, "বুঝলে ঘোষ, কাল তোমাকে যা বলেছিলাম···"

আমি চক্রবর্তীর দিকে তাকাই, কিন্তু তার কথার ভাবার্থ উদ্ধার করতে পারি না। দিনরাত একসঙ্গে আছি, কত কথাই তো বলা-বলি করছি। চক্রবর্তী কোন্ কথা বোঝাতে চাইছে ?

সে বোধহয় বুঝতে পারে আমার অবস্থা। তাই আবার বলে, "আরে ভাই, আমার শরীর, আর আমি বুঝব না ?"

তা তো বটেই! যার শরীর সে না বুঝলে, কে বুঝবে ? কিন্তু বিষয়টা কি ?

একটু বাদেই বুঝতে পারি। চক্রবর্তী বলে চলেছে, "কাল সেই যে ফেরার পথে আড়াই শো দই খেলাম, ব্যস্······!" চক্রবর্তী থেমে যায়।

বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমাকে, "কি ?"

"কি আবার ? আজ সকালেই কোষ্ঠ সাফ্............শরীর হাল্কা........."

আর শোনার দরকার নেই, সমস্ত জিনিসটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। বটেই তো, দই না খেলে শরীর হাল্কা হবে কেন ? বিশেষ করে ব্রজ-পরিক্রমায় এসে।

চক্রবর্তী কিন্তু থামে নি, সে চালিয়ে যাচ্ছে, "বুঝলে, আমি যখন 'মোটর ওনারস্ য়ুনিয়ন'-য়ের 'ওয়েল-ফেয়ার অফিসার' ছিলাম, তখন থেকেই আমার এই দই খাবার অভ্যেস। তারপরে মনে করো, কোম্পানী উঠে গেল। ব্যবসা শুরু করলাম, কিন্তু এ অভ্যেসটা ছাড়ি নি। আরে সেই সব দুর্দিনে, যখন টাকার অভাবে রেশন তুলতে পারতাম না, তখনও নিয়মিত পাঞ্জাবী দোকানে গিয়ে 'খট্টা দহি' খেতাম।"

না, ভুল ভেবেছি আমি। চক্রবর্তীর বক্তব্য শেষ হয় নি, বরং সে নতুন করে শুরু করল, "তোমাদের তো আমার ব্যবসার গল্পই বলি নি। সে এক মস্ত ইতিহাস।"

আজ ভোগাবে বুঝতে পারছি। কীর্তনের ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত চালিয়ে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু কে এখন থামাবে ওকে ? কার সে সাধ্য আছে ?

অতএব আমরা নীরবে শুনে যাই সেই ইতিহাস। চক্রবর্তী বলে যায়, "সেই বাজারে চাকরির চেষ্টা না করে ব্যবসায় নামা—বুঝলে ? শুনে সবাই 'ডিসকারেজ' করেছে। কিন্তু আমি তাতে মোটেই ঘাবড়াই নি। কষ্ট করব, কিন্তু গোলামী করব না—এই প্রতিজ্ঞা করে পথে নেমেছিলাম। আজ মনে করো, আমার বাড়ির দাম কম করেও লাখখানেক টাকা। নিজে থাকি, আর চার শো টাকা ভাড়া পাই। তবে কি জানো—?" চক্রবর্তী আমাকে কি যেন জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু সে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করে না। নিজেই বলতে

থাকে "টাকা মাটি, মাটি টাকা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই 'স্পর্শমণি' কবিতাটা মনে আছে তো?"

আমি মাথা নাড়ি। সে বলে চলে, "আমার হচ্ছে সেই জীবন ঠাকুরের অবস্থা। কি হবে টাকা দিয়ে? জীবনে বহু টাকা রোজগার করেছি এবং করছি। কত আর বলব তোমাকে? নীলাম থেকে আট শো টাকার মাল কিনে আঠারো হাজার টাকায় বেচেছি। পাঁচ হাজার টাকার মাল বেচেছি পঞ্চান্ন হাজারে। এই তো, 'নেট' দু'হাজার টাকা লাভের ব্যবসা ফেলে বৃন্দাবনে এসেছি। কেন এসেছি জানো?"

চুপ করে থাকি। কারণ, উত্তর দেওয়া মুশকিল। সঠিক উত্তর জানা নেই আমার।

আমাকে নির্বাক দেখে চক্রবর্তী নিজেই উত্তর দেয়, "এসেছি, পরকালের কাজ করতে। আরে, সারাজীবন যদি ইহকাল নিয়েই ব্যস্ত রইলাম, তাহলে ওপারে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেব? তাছাড়া কৃষ্ণ কৃপা করলে বহু ব্যবসা হবে। কিন্তু ব্যবসার জন্য কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন না করলে যে নরকেও ঠাঁই হবে না!"

চক্রবর্তীর বোধহয় আরও কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে বলতে পারে না সেকথা। দরজা ঠেলে গোবর্ধন মহারাজ আমাদের ঘরে আসেন।

চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "দণ্ডবৎ মহারাজ, দণ্ডবৎ!"

আমরাও প্রণাম করি তাঁকে। তিনি এগিয়ে আসেন আমার কাছে। এসে একেবারে আমার বিছানার ওপর বসে পড়েন। তারপরে কোনপ্রকার প্রস্তাবনা না করে প্রশ্ন করেন, "তুমি কতদূর লেখা-পড়া করেছো?"

"সামান্যই।" সবিনয়ে উত্তর দিই।

"ইংরেজিতে খানকয়েক চিঠি লিখে দিতে পারবে?"

"চেষ্টা করতে পারি।" তেমনি বিনীত স্বরেই উত্তর দিই।

"কিন্তু তুমি আবার কম্যুনিস্ট নও তো?"

"হলেই বা আপনার ক্ষতি কি ?" হেসে জিজ্ঞেস করি।

"ক্ষতি আছে বৈকি! কম্যুনিস্ট হলে তোমাকে দিয়ে চিঠি লেখাব না আমি। কম্যুনিস্টরা ভগবান বিশ্বাস করে না, ওরা নাস্তিক, ওরা ম্লেচ্ছ।......"

কি বলব ? কেমন করে ওঁকে বোঝাই, ভগবানে বিশ্বাসী হয়েও কম্যুনিস্ট হওয়া যায়—যেমন, স্বামী বিবেকানন্দ। কাজেই বলতে হয়, "না মহারাজ, আমি রাজনীতি করি না।"

"ভাল কথা, খুব ভাল কথা। তাহলে তুমি আমাকে কয়েকখানা ইংরেজি চিঠি লিখে দেবে। তোমরা তো জানো, আমি গুরুমহারাজের অযোগ্য শিষ্য। তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মতো আমি স্কুল-কলেজে পড়ি নি। তবু তিনি আমাকে কৃপা করেছেন, ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়েছেন। কিন্তু ইংরেজি লেখাপড়া আর শেখা হয়ে ওঠে নি আমার।"

"এসব কথা আপনি কেন বলছেন মহারাজ ? আমি আপনার চিঠি লিখে দেব। যখন আপনার সময় হয়, আমাকে আদেশ করবেন।"

"তা আমি জানি ভাই, আর জানি বলেই এত লোক থাকতে তোমার কাছে এসেছি।"

"কোথায় চিঠি লিখবেন মহারাজ ?" মাঝখান থেকে চক্রবর্তী প্রশ্ন করে।

"বোম্বাইয়ে, আমার কয়েকজন শিষ্যকে। আমি এই বন-পরিক্রমার পরে প্রচারে যাব কিনা। তাই তাদের আগে জানিয়ে দিতে হবে। তারা সব ব্যবস্থা করে রাখবে। জানো তো, বর্ষাণায় আমার একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। কিছু পয়সা-কড়ি না হলে সেটা আর চালাতে পারছি না।"

"কবে বোম্বাই যাচ্ছো গোবর্ধন ?" বলতে বলতে ভক্তি মহারাজ ঘরে ঢোকেন।

গোবর্ধন মহারাজ চমকে ওঠেন। এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন

না তিনি। প্রশ্নকর্তার এই আকস্মিক আবির্ভাবে তিনি যেন মোটেই খুশি হতে পারছেন না। তাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তস্বরে বলেন, "এখনও কিছু ঠিক করি নি।" একবার থামেন তিনি। তারপর আমাকে বলেন, "আচ্ছা, এখন আসি।" আমরা কেউ কিছু বলার আগেই তিনি বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

তাঁর পরিত্যক্ত জায়গায় ভক্তি মহারাজ বেশ জাঁকিয়ে বসে পড়েন। তারপরে তিনি বলেন, "গোবর্ধন বুঝি প্রচারে বোম্বাই যাচ্ছে? করে নাও বাবা। কৃষ্ণের নাম করে যা পারো, লুট করে নাও।"

আমরা নীরব। কেষ্টপ্রভুর নাসিকা-গর্জনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তিনি ব্রহ্মচারী মানুষ। এই পরিবেশে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার অভ্যেস আছে তাঁর।

কিন্তু আমরা বেশিক্ষণ তাঁর নাসিকা-গর্জন শ্রবণ করার সুযোগ পাই না। ভক্তি মহারাজ আবার বলেন, "মূর্খ, বুঝলেন, আকাট মূর্খ! আর বলিহারি মুকুন্দের নির্বাচন, এই সব মহামূর্খকে সে সন্ন্যাসী করেছে। বোধ নেই, ভক্তি নেই, প্রচারে যাবে! যেন প্রচারটা ছেলের হাতের লাট্টু—ঘোরালেই ঘুরবে। বলি, তুমি কি জানো হে, যে প্রচারে যাচ্ছো? মহাপাপ বুঝলেন, মহাপাপ। না জেনে, না বুঝে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মতো অধর্ম আর নেই জগতে।"

"যথার্থ বলেছেন মহারাজ।" চক্রবর্তী ইন্ধন যোগায়।

ভক্তি মহারাজ নবোদ্যমে আরম্ভ করেন, "আর একজন হয়েছে এই মথুরা। কি যে ছাই ভাগবত পাঠ করছে, সে-ই জানে। ভাগবতের প্রকৃত ভাব, কৃষ্ণলীলার প্রকৃত অর্থ না বলে 'হিস্ট্রি' বলে যাচ্ছে। আরে হিস্ট্রি হল গিয়ে জড় বস্তু, পার্থিব জগতের জিনিস। হিস্ট্রি দিয়ে কি হবে? রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী বর্ণনা করতে হলে প্রথমেই বলতে হবে রাধা কি? কৃষ্ণ কাকে বলে? আপনি তো শুনেছি মুকুন্দের কাছে শিগ্‌গীরই দীক্ষা নেবেন। বলুন তো মশাই, কৃষ্ণ কি?" তিনি চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করেন।

আচমকা আক্রমণে চক্রবর্তী বিভ্রান্ত। কিন্তু সে ব্যবসায়ী মানুষ। প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন না হলে ব্যবসায়ী হওয়া যায় না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে হাত জোড় করে বলে ফেলে, "আমরা মূর্খ মহারাজ; আপনি বলুন, আমরা শুনি!"

"তাহলে শুনুন," ভক্তি মহারাজ বলেন, "কৃষ্ণ হচ্ছেন চিদানন্দবিগ্রহ ও অতসীপুষ্পাভ। মাতৃকান্যাসে ছয় বর্ণের শক্তি। তিনি হচ্ছেন শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন, যিনি সংসারারণ্যকে বিদীর্ণ করেন অথবা অজ্ঞানরাশিকে আত্মসাৎ অর্থাৎ বিলোপ করেন। তিনিই সৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং পরমব্রহ্ম।"

"দণ্ডবৎ মহারাজ, দণ্ডবৎ! কি কথাই না শোনালেন!" চক্রবর্তী বিগলিত।

কিন্তু মহারাজ তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বলে যেতে থাকেন, "আর শ্রীরাধিকা? রাধারাণী কি, জানেন? শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবরা। ভগবানের প্রতি ভক্তি-কামাগ্নিতে সর্বাপেক্ষা অধিক দন্দহ্যমানা অথবা শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌প্রকারে রমণ-সুখদায়িকা। শ্রীরাধার ভাবাঢ্য হয়েই কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই রাধারাণী হচ্ছেন আমাদের মা—জগজ্জননী।"

"যথার্থ বলেছেন মহারাজ, রাধারাণীকে মা ছাড়া আর কিছুই ভাবা উচিত নয়।" চক্রবর্তী আবার মন্তব্য করে। নাঃ, লোকটার সত্যি সাহস আছে।

মহারাজ বলেন, "আমি সব সময়েই যথার্থ কথা বলে থাকি। আর তাই তো বলছি, হিস্ট্রি শুনে কি আর ব্রজ-পরিক্রমা হয়? স্থূল দৃষ্টি দিয়ে শ্রীধাম দর্শন অর্থহীন। ধাম কিভাবে দর্শন করতে হয়, তা জানতে হলে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনী জানতে হবে আপনাদের।"

"একটু বলুন না মহারাজ!" চক্রবর্তী অনুরোধ করে।

মহারাজ বলতে আরম্ভ করেন, "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যৌবনে চরিত্রহীন ছিলেন। চিন্তামণি নামে একজন গণিকার রূপে তিনি

ছিলেন উন্মাদ। এই সময় তাঁর বাবা মারা গেলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের ঝামেলা মিটতে সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিল্বমঙ্গল শ্রাদ্ধ শেষ হতেই রওনা হলেন চিন্তামণির কাছে। চিন্তামণি থাকেন অজয়ের ওপারে। তখন বর্ষাকাল, অজয় উত্তাল ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। পারাপারের খেয়া নেই। বিল্বমঙ্গল তখন ভাসমান কাঠ ভেবে একটা গলিত শবদেহকে ধরে নদী পেরিয়ে এলেন।

"এদিকে বাবার শ্রাদ্ধ ও দুর্যোগের জন্য বিল্বমঙ্গল আসবেন না ভেবে চিন্তামণি তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাজেই বিল্বমঙ্গল দেখলেন, চিন্তামণির সদর দরজা বন্ধ। তিনি তখন পাঁচিলের গর্ত থেকে ঝুলন্ত একটি গোখরো সাপকে দড়ি ভেবে, তাকে ধরে পাঁচিল টপকে বাড়ির ভেতরে এলেন।

"চিন্তার ঘুম গেল ভেঙে। বিল্বমঙ্গলের কাছ থেকে সব কথা শুনে তাঁর দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এলো। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, 'হায় বিল্বমঙ্গল। তোমার যে মন এই পাপিনী চিন্তামণির রূপের চিন্তায় অর্পণ করেছো, সেই মন যদি জগচ্চিন্তামণির স্বরূপ চিন্তায় সমর্পণ করতে, তাহলে তুমি আজ কৃষ্ণ-কৃপারূপ স্পর্শমণি লাভ করতে পারতে।'

"চিন্তামণির কথায় বিল্বমঙ্গলের চৈতন্য উদয় হল। তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। নিজের বাড়িতেও ফিরলেন না বিল্বমঙ্গল। তিনি কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। কিছুদিন বাদে সোমগিরি নামে জনৈক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সেবায় দিন কাটাতে থাকলেন। কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় বিল্বমঙ্গলের অসাধারণ শক্তি দেখে সোমগিরিব শ্রীশুকদেবের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বিল্বমঙ্গলের নাম রাখলেন 'লীলাশুক'। বিল্বমঙ্গল তখন গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে নাম-কীর্তন করতে করতে বৃন্দাবনের পথে রওনা হলেন।

"পথ চলতে চলতে একদিন দেখলেন, পথের পাশে সরোবরে

একটি স্বাস্থ্যবতী ও রূপসী যুবতী স্নান করছেন। স্নানরতা সেই অর্ধনগ্না নারীকে দেখে বিল্বমঙ্গলের দেহে ও মনে আবার সেই সুপ্ত-কামাগ্নি প্রজ্বলিত হল। তিনি সম্ভোগ-বাসনায় বিচলিত হলেন।

"সেই সদ্যস্নাতা বণিক-বধূকে অনুসরণ করে বিল্বমঙ্গল তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। যুবতীর বণিক-স্বামী বড়ই অতিথিপরায়ণ ও সাধুভক্ত ছিলেন। তিনি বিল্বমঙ্গলকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, 'আদেশ করুন মহারাজ, সাধ্যাতীত না হলে অবশ্যই তা পালন করব।'

"নির্ভীক চিত্তে বিল্বমঙ্গল বললেন, 'আমি আপনার স্ত্রীকে ভোগ করতে চাই।'

"চমকে উঠলেন বণিক। ভাবলেন, এ কোন্ কামুক ও কপট সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়া গেল! কিন্তু তার পরেই তাঁর মনে পড়ল রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা। সত্যরক্ষার জন্য তিনি তাঁর রাণীকে পর্যন্ত বিক্রয় করেছিলেন। সত্যরক্ষা মহাধর্ম, ধর্মপালনে যুক্তি-তর্ক ও বিচারের কোন স্থান নেই। তাই সত্যাশ্রয়ী বণিক মোক্ষদাতা বাসুদেবের কাছে শক্তি প্রার্থনা করে অন্তঃপুরে এলেন। স্ত্রীকে বললেন সব কথা।

"পতিব্রতা স্ত্রী মনে মনে মধুসূদনকে স্মরণ করে বললেন, 'প্রভু, তুমি দাসীকে রক্ষা করো। আমি যেন স্বামীর সত্য ও আমার সতীত্ব রক্ষা করতে পারি। তুমি এই ভ্রান্ত অতিথিকে সুমতি দান করো।'

"তারপরে তিনি প্রসাধনে বসলেন। ভাল করে চুল বাঁধলেন। পায়ে পরলেন আলতা, গায়ে মাখলেন চন্দন। বিচিত্র বসনে সজ্জিতা হয়ে তাম্বূল চর্বণ করতে করতে তিনি বিল্বমঙ্গলের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'স্বামীর আদেশে স্ত্রীর জীবনের সার-সর্বস্ব সতীত্ব-রত্ন নিয়ে আমি আপনার সেবা করতে এসেছি। এখন আসুন, চর্ম ও মাংস দিয়ে আবৃত আমার এই নশ্বর নারীদেহকে আলিঙ্গন করুন, স্তনরূপ বক্ষস্থিত মাংসপিণ্ড দুটিকে মর্দন করুন।

আমার লালাপূর্ণ মুখগহ্বরকে আপনি সুধাপাত্রবোধে চুম্বন করুন। তারপরে আমার অপবিত্র চর্ম-বিবরে রমণ করে সাময়িক ইন্দ্রিয়-সুখ আস্বাদন করুন। আসুন, দৈহিক ভোগ-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে আপনার সন্ন্যাসধর্ম বিসর্জন দিন।'

'কোথায়?' প্রশ্ন করলেন বিল্বমঙ্গল।

'কোথায়?' একটু হাসলেন বণিক-পত্নী। বললেন, 'আপনার বোধহয় কখনও পতিব্রতার পতি হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি, নইলে আপনি এ প্রশ্ন করতেন না। যাই হোক্, আপনি নিজেকে এ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করুন। তার পরেও যদি পর-পত্নীকে সম্ভোগরূপ বিষম বিষপানে চিরজীবনের জন্য জর্জরিত করতে চান, তাহলে আসুন এই শয্যায়। খুলে ফেলুন আপনার ঐ গেরুয়া বহির্বাস। স্বহস্তে উলঙ্গ করুন আমাকে। তারপরে আমার সেই নগ্ন নারীদেহ দিয়ে আপনার পাশব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে ক্ষণিকের ইন্দ্রিয়-আনন্দ আস্বাদন করুন।'

"বণিক-পত্নী এগিয়ে এলেন পালঙ্কের কাছে—বিল্বমঙ্গলের পাশে। কিন্তু বিল্বমঙ্গল অচল ও অনড় হয়ে বসে রইলেন।

"বণিক-বনিতা আবার বললেন, 'আর যদি অনন্ত কালের জন্য আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হতে চান, তাহলে হৃদয়বাসী হৃষীকেশের চরণে শরণ নিন—প্রেমের ভব-ক্ষুধাহারী সুধা পান করুন।'

"বিল্বমঙ্গলের মোহভঙ্গ হল। তাঁর সন্ন্যাসিত্ব ফিরে এলো। তিনি বললেন—'মা, তোমার খোঁপা থেকে দুটি কাঁটা তুলে নিয়ে আমার দু'চোখে বিঁধিয়ে দাও।'

"এবারে বণিক-রমণীর বিস্মিত হবার পালা। তিনি বললেন, 'এ আপনি কি ছলনা করছেন প্রভু! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি এই নির্দয় আদেশ ফিরিয়ে নিন। আপনি আমাকে দিয়ে, আমার এই সুন্দরী নারীদেহ দিয়ে যা ইচ্ছা করুন। কিন্তু আমাকে আপনার চোখ নষ্ট করতে বলবেন না। আমি আপনার এ আদেশ পালন করতে পারব না।'

'পারতেই হবে তোমাকে।' গর্জে উঠলেন বিল্বমঙ্গল, 'মনে রেখো, স্বামীর আদেশে তুমি আমাকে দেহদান করতে এসেছো। তোমার হাত দুটি এখন আমার। সেই হাত দিয়ে তুমি আমার চোখদুটি নষ্ট করে দাও।'

"বলতে বলতে বিল্বমঙ্গল এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। বার বার তাঁকে ঐ একই আদেশ করতে থাকলেন। বললেন, 'পতির আদেশে তুমি আমার সন্তোষ বিধান করতে এসেছো, আমার চোখ-দুটি নষ্ট করে তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করো।'

"শেষ পর্যন্ত তাই করলেন শ্রেষ্ঠীপ্রিয়া। আর তার পরেই তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। স্ত্রীর কান্না শুনে বণিক ছুটে এলেন সেখানে। নিদারুণ দৃশ্য দেখে ভাবলেন, তাঁর যুবতী স্ত্রী নিজের সতীত্ব বাঁচাতে বিল্বমঙ্গলকে চরম আঘাত করেছে। তিনি লুটিয়ে পড়লেন বিল্বমঙ্গলের চরণে। বললেন, 'আমার স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করুন প্রভু!'

'অপরাধ?' যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে অন্ধ বিল্বমঙ্গল বললেন, 'কোন অপরাধ করে নি তোমার সতীসাধ্বী স্ত্রী। বরং সে আজ বিশ্বমাঝে যে কীর্তি-কুসুম প্রস্ফুটিত করল, তার যশ যুগ যুগ ধরে স্থায়ী হবে।' একবার থামলেন তিনি, তারপরে বললেন, 'এখন তোমরা আমাকে সেই সরোবরের তীরে রেখে এসো।'

"বণিক-দম্পতি বিল্বমঙ্গলের আদেশ পালন করে ফিরে এলেন ঘরে। তাঁরা সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ-ভজন করে দিন অতিবাহিত করতে থাকলেন।

"আর বিল্বমঙ্গল? অন্ধ বিল্বমঙ্গল সেই সরোবরের তীর থেকে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলতে বলতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বৃন্দাবনের দিকে এগোতে থাকলেন।

"একদিন একটি রাখাল বালক কৃষ্ণপ্রেমে পাগল বিল্বমঙ্গলের হাত ধরে বৃন্দাবনে নিয়ে এলেন। বিরহবিধুরা-ব্রজবালা-ভাবে বিভোর লীলাশুক সেই রাখাল বালকের স্পর্শে এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করলেন।

"কৃষ্ণের ভক্ত-বৎসল নাম সার্থক হল। অবশেষে বৃন্দাবনে পৌঁছে চকিতে তাঁর দিব্যজ্ঞান লাভ হল—'এই তো কৃষ্ণ', বলে তিনি সেই রাখাল বালককে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন। কিন্তু চতুর কৃষ্ণ ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

"বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে এসে প্রেমোন্মাদভাবে ব্রজধামে বিচরণ করতে থাকলেন। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তিনি মানস-নয়নে কৃষ্ণ-লীলাস্থল দর্শন করলেন। সেই মানস-রূপই তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্লোক হয়ে দেখা দিয়েছে। 'আর সেই সব মধুর শ্লোকই তাঁর [illegible] 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন—

'ভক্ত কণ্ঠ রত্নহার সেই সব গীত।
অদ্যাপি আছয়, নাম 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'॥'

মহাপ্রভু নিজে এই অমর গ্রন্থের রসাস্বাদন করেছেন।"

একবার থামলেন ভক্তি মহারাজ। তারপরে আমাদের দিকে ফিরে আবার বলেন, "তাই তো বলছিলাম, হিস্ট্রি শুনে আর স্থূল দৃষ্টি দিয়ে ব্রজদর্শন হয় না। ব্রজধাম দর্শন করতে হয় মানসলোকে, দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রেমিক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের মতো, সাধক লীলাশুকের মতো।" এবারে চুপ করলেন ভক্তি মহারাজ।

কিন্তু তাঁকে বিশ্রাম নিতে দেয় না চক্রবর্তী। জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, সেই সুন্দরী চিন্তামণির কি হল?"

"ও!" মনে পড়ে ভক্তি মহারাজের। তিনি বলেন, "তাঁর কথা বুঝি বলা হয় নি? বিরহ-বিধুরা চিন্তামণি বেশিদিন বিল্বমঙ্গলের অদর্শন সইতে পারলেন না। একদিন তিনিও বৃন্দাবনে এলেন, এলেন লীলাশুকের কাছে। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের সহায়ক বিবেচনা করে তাঁকে 'বর্ত্মোদ্দেশী' জ্ঞানে প্রণাম করলেন। চিন্তামণিও কাতরকণ্ঠে বললেন, 'ঠাকুর, তুমি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করাও।'

"তাই করিয়েছিলেন বিল্বমঙ্গল। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী বৃন্দাবনচন্দ্র দর্শন দিয়েছিলেন চিন্তামণিকে। প্রেমময়ী চিন্তামণি কৃষ্ণপ্রেমে

বিভোর হয়ে লীলাশুকের সেবা করে সুখ ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁরা দু'জনেই বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করেন। এখানেই তাঁদের সমাধিস্থল। সময় হলে একদিন গিয়ে দর্শন করে আসবেন সেই মহাতীর্থ।" এতক্ষণে কাহিনীর যতি টানলেন ভক্তি মহারাজ।

হাতজোড় করে চেঁচিয়ে ওঠে চক্রবর্তী, "চমৎকার মহারাজ, চমৎকার! তাই তো বলছিলাম মহারাজ, আপনি অশেষ জ্ঞানী, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।"

"আপনারাও ইচ্ছে করলে আমার মতো পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারেন।" মহারাজ আমাদের অভয় দান করেন।

অবিশ্বাস্য অভয়ে বিশ্বাস করে না চক্রবর্তী। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "কি যে বলেন মহারাজ!"

"ঠিকই বলেছি।" ভক্তি মহারাজ থামেন, আমাদের সবাইকে একবার দেখে নিয়ে আবার বলেন, "আপনারা জানেন আমি অনেকগুলি বই লিখেছি?"

"জানি মহারাজ।" চক্রবর্তী উত্তর দেয়।

"জানলে, সেই গ্রন্থরাজি গ্রহণ করছেন না কেন?"

"বুঝতে পারব না বলে।" সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্তী জবাব দেয়।

"আহা, না পড়লে বুঝবেন কি করে? আর যদি একান্তই না বুঝতে পারেন, আমি তো রয়েছি—বুঝিয়ে দেব।"

"ও আমাদের মাথাতেই ঢুকবে না মহারাজ।" চক্রবর্তী এবারে আসল কথাটি বলে।

"খুব ঢুকবে। নিয়েই দেখুন না! বেশি তো নয়, একটা সেট, মানে আমার সব ক'খানি বই নিতে মাত্র তেতাল্লিশ টাকা আনুকূল্য লাগে। আপনাদের কাছে কিছুই নয়। অথচ এই সামান্য আনুকূল্য দিয়ে অমূল্য সম্পদ ঘরে নিয়ে যাবেন। এমন একদিন আসবে, যেদিন আমার এ বই প্রত্যেকের ঘরে ঘরে থাকবে। যার ঘরে থাকবে না, লোকে তাকে মহামূর্খ বলবে।"

চক্রবর্তী নীরব। সে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বার চেষ্টায় আছে। ভক্তি মহারাজ তাকিয়ে রয়েছেন আমাদের দিকে। কি বলব? শুনেছি, তিনি কয়েকখানি বই লিখেছেন এবং তার কিছু বই সঙ্গে করে নিয়েও এসেছেন। বই কেনায় আপত্তি হবার কথা নয়, কিন্তু বইগুলি নাকি সত্যিই দুর্বোধ্য। তাহলেও এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না। তাই বলি, "আমি নিতান্তই অজ্ঞ মহারাজ, তার ওপরে বই পড়ার সময়ও বড় একটা পাই না। তব্ আপনার এক সেট সেই অমূল্য গ্রন্থ আমি নিয়ে যাব ঘরে।"

"আপনিই প্রকৃত ভক্ত।" মহারাজ প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়েন জায়গা থেকে। বলেন, "আমি তাহলে নিয়ে আসি···।"

"না, না। এখন আনবার কি দরকার?" আমিও উঠে দাঁড়াই। বলি, "পরে দেবেন। আরও তো অনেকদিন আমরা আছি এক-সঙ্গে।"

"বেশ, তাই হবে। আর, আমি আপনাকে চল্লিশ টাকাতেই দেব এক সেট, বুঝলেন?"

আমি মাথা নাড়ি। ভক্তি মহারাজ খুশি মনে বেরিয়ে যান আমাদের ঘর থেকে।

নাট-মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। পাঠ-কীর্তনের সময় হয়ে গেল। আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চক্রবর্তী আমাকে বলেন, "দেখলে ব্যাপারটা?"

"কি?"

"এই ভক্তি মহারাজের ব্যাপারখানা? তোমার কাছে ঠিক বাণিজ্য করে গেলেন।"

"ব্যাপারটা বোধহয় এভাবে ভাবা উচিত নয় চক্রবর্তী। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, ধর্মগ্রন্থ লিখেছেন···"

"ধর্মগ্রন্থ না ছাই! আর তুমি তাই নিয়ে নিলে! আরে আমি

তো জানি, গুরুমহারাজকে অনেক ধরাধরি করে এই যাত্রায় এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন একরাশ বই। তার কুলিভাড়াও দিতে হয়েছে গুরুমহারাজকে। কি করবেন, শত হলেও গুরুভাই!" একটু থেমে সে আবার বলে, "আর তোমারও বুদ্ধির বলিহারি! দেখলে না, আমি কিভাবে কাটিয়ে দিলাম!"

হেসে বলি, "চক্রবর্তী, সবাই যদি তোমার মতো কাটাতে পারবে, তাহলে তো তোমার মতো লাভের ব্যবসাই করত। ঐ কাটাতে না পারার জন্যই যে পরের গোলামী করছি।"

॥ তেরো ॥

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি যাত্রী-নিবাসের নিচের তলায়। সিঁড়ির বাঁদিকে গুরুমহারাজের আর ডান দিকে বৃন্দাবন মহারাজের ঘর। তাঁর ঘরেই আশ্রমের অফিস। সুতরাং সেখানে সর্বদা ভিড় লেগে আছে। এখন রয়েছেন নরেনপ্রভু, তাঁর সহকারীসহ। তাঁরা বোধহয় বাজারের হিসাব মেলাচ্ছেন। কম তো নয়, দৈনিক শতাধিক লোকের বাজার। এক রকম নয়, তিন রকমের বাজার—মন্দিরের বাজার, মহারাজদের বাজার ও আমাদের বাজার। কাজেই ফুল-বেলপাতা ও রাবড়ি-আপেল থেকে গিমা-কুমড়ো পর্যন্ত প্রচুর জিনিস প্রতিদিন কিনতে হয় নরেনপ্রভুকে। তার ওপর আবার জল-খাবারের ব্যাপার আছে। আমাদের জন্য নয়, মহারাজ ও সীনিয়ার ব্রহ্ম-চারীদের জন্য। তাঁরা তো আর আমাদের মতো কীর্তন ফাঁকি দিয়ে দোকানে গিয়ে চা ও কচুরি খেয়ে আসতে পারেন না! তাই তাঁদের জন্য দু'বেলা একটু চিঁড়ে-দই ও ফল-মিষ্টির ব্যবস্থা রাখতে হয়।

'মাইক'-য়ে কীর্তনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। 'ঈভ্‌নিং সেসন' শুরু হয়ে গেছে। প্রতিবেশীদের পাঠ-কীর্তন শোনাবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি বৃন্দাবন মহারাজ। নাট-মন্দিরের বাইরে তো বটেই, মন্দির-চূড়ায় পর্যন্ত 'লাউড্‌ স্পীকার' বসানো হয়েছে। বহুদূর থেকে পথচারী ও প্রতিবেশীরা সব শুনতে পাচ্ছেন। তাঁদের ভাল লাগছে কিনা, সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, না লাগলেও তাতে বৃন্দাবন মহারাজের কিছুই যায় আসে না। তাছাড়া ধর্মের পথ তো চিরকালই কষ্টকর। শ্রোতাদের কান যদি কষ্ট করে এই শব্দ সহ্য করতে পারে, তাহলে হয়তো কৃষ্ণের কৃপায় একদিন-না-একদিন তাঁদের মনে ভক্তির উদ্রেক হবে।

নাট-মন্দিরে ঢোকার মুখে বৃন্দাবন মহারাজের সঙ্গে দেখা।

তিনি বাগানের তদারকি করছেন। তাড়াতাড়ি দণ্ডবৎ করি। মহারাজ জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, আপনি নৃসিংহবল্লভ গোস্বামীকে চেনেন কেমন করে?"

সর্বনাশ! যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। গোস্বামীজীকে দেখে ওঁরা আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। তবু চেষ্টা করতে হবে। বলি, "আমি এখানে সাহিত্য-সম্মেলনে এসেছিলাম, তখন ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।"

"তিনিও তাই বললেন। কিন্তু আপনি সাহিত্য-সম্মেলনে এসেছিলেন কেন? আপনি কি সাহিত্যিক?"

"না, না। সাহিত্যিক হওয়া কি সহজ কথা? আমি একজন সাধারণ কেরাণী।"

"না মশাই, আপনি বোধ হয় ঠিক বলছেন না। আপনি আমাদের শিষ্য কিংবা ভক্ত নন, অথচ এতগুলো টাকা দিয়ে পরিক্রমায় এসেছেন। আপনার কিছু একটা মতলব আছে। দেখবেন, এই পুণ্য-পরিক্রমা নিয়ে আবার কুৎসা-টুৎসা রটাবেন না, তাহলে কিন্তু বৃন্দাবনচন্দ্র আপনাকে ক্ষমা করবেন না।"

কি উত্তর দেব? তিনি তো শেষকথাই বলে দিলেন। বললেন, বন-পরিক্রমা নিয়ে কুৎসা রটালে বৃন্দাবন মহারাজ আমাকে ক্ষমা করবেন না। হয়তো বা মামলা করবেন। এঁদের শিষ্যদের মধ্যে একাধিক 'সলিসিটার' ও 'এ্যাড্‌ভোকেট' রয়েছেন।

কিন্তু আমি বন-পরিক্রমা নিয়ে কুৎসা রটাতে যাব কেন? আর পরিক্রমার মধ্যে কুৎসার আছেই বা কি? তবে কি তিনি বন-পরিক্রমা বলতে আশ্রমিক-শোষণের কথা বলতে চাইছেন? তা যদি বলে থাকেন, তাহলে তিনি ভুল করেছেন। আমি ব্রজ-পরিক্রমায় এসেছি পরিক্রমার কথা লিখব বলে। ভাল ও মন্দ দুই-ই লিখতে হবে আমাকে। নইলে যে পাঠক-পাঠিকার প্রতি অবিচার করা হবে। সেটা কিছুতেই সম্ভব নয় আমার পক্ষে—এমন কি মামলার ভয়েও নয়।

নাট-মন্দিরে উঠে আসি। জোর কীর্তন চলছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি। আমেরিকান ছেলেটির পাশে আসি। গুরু ও বৈষ্ণবদের দণ্ডবৎ করে বসে পড়ি।

আমেরিকান ছেলেটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কীর্তনরত ভক্তদের দিকে। সে কি বুঝছে, বলতে পারব না। তবে তার মনোযোগ আমাদের অনেকের থেকেই বেশি। মাঝে মাঝে সে তার ঝোলা থেকে শ্রীকৃষ্ণের ছোট একখানি ছবি বের করে দেখছে, আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। বোধহয় নাম-জপ করছে। ভক্ত-বৈষ্ণবকে দিনে অন্তত একলক্ষ বার হরিনাম করতে হয়। মনে মনে প্রণাম করি স্বামী মহারাজকে, সত্যিই তিনি কৃষ্ণকৃপা লাভ করেছেন। নইলে এই তরুণ আমেরিকান কেন সমস্ত ভোগ-বাসনা বিসর্জন দিয়ে এদেশে আসবে? যাঁরা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করেছেন, তাঁদেরই একজন বৃন্দাবনের এক আশ্রমে বসে কৃষ্ণনাম কীর্তন করছে। যে চিরকাল ভোগ আর ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত ও পালিত, সে কেমন করে এই সর্বত্যাগী সাধকে রূপান্তরিত হল?

মথুরা মহারাজ পাঠ শুরু করলেন। আমি পাঠে মনঃ-সংযোগ করি।

মথুরা মহারাজ বলছেন—"সেদিন অপরাহ্ণে অক্রুরের রথ মথুরা নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হল। অক্রুর কৃষ্ণ ও বলরামকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁরা তাতে সম্মত হলেন না।

"ইতিমধ্যে গোপদের নিয়ে মহারাজ নন্দ সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। রাম-কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে শহরে প্রবেশ করলেন। তাঁরা গাঁয়ের ছেলে। এর আগে আর কখনও শহরে আসেন নি। তাই চারদিক দেখতে দেখতে তাঁরা নগরীর পথে এগিয়ে চললেন।

"কিছুক্ষণ চলার পরে তাঁরা দেখতে পেলেন, এক কুব্জা-রমণী

চন্দন নিয়ে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'তুমি আমাদের দু'ভাইকে চন্দন মাখিয়ে দাও।'

কুব্জা বললেন, 'আমার নাম ত্রিবক্রা। মহারাজ কংসকে অনুলেপন করব বলে আমি এই চন্দন নিয়ে রাজবাড়িতে চলেছি। তবু আমি তোমার আদেশ অমান্য করব না।'

"তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গায়ে চন্দন মাখিয়ে দিলেন। আর সেই অনুলেপনের শেষে শ্রীকৃষ্ণ সহসা তাঁর পা দুটি দিয়ে কুব্জার পা দু'খানি চেপে ধরলেন। তারপরে হাতের দুটি আঙুল দিয়ে কুব্জার চিবুক ধরে ওপর দিকে টান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুব্জা ত্রিবক্রা এক পরমাসুন্দরী যুবতীকে রূপান্তরিতা হলেন। কৃষ্ণকৃপা লাভে ধন্য ত্রিবক্রা তখন 'উত্তরীয়ান্তামাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া'—তাঁর তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করবার বাসনা হল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ করে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন। পথের মাঝে কুব্জার প্রেমাভিলাষ দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন। তারপরে তিনি কুব্জাকে বললেন, 'এখানকার কাজ শেষ করে আমি নিশ্চয়ই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করব।'

"যথাসময়ে মদনমোহন ত্রিবক্রার অভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু সেকথা এখন নয়, মথুরায় কুব্জালয় দর্শন করার সময় আমি আপনাদের সে কাহিনী বলব।

"শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসে খুশি হয়ে কুব্জা রাজবাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। আর রাম-কৃষ্ণ হাঁটতে হাঁটতে কংসের ধনুর্যজ্ঞশালার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ভেতরে ঢুকে তাঁরা সেখানে ইন্দ্রধনুর মতো একটা অদ্ভুত ধনুক দেখতে পেলেন। দেখলেন, প্রহরীরা সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করছে সেই ধনুক। শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে গেলেন সেই ধনুকের কাছে। প্রহরীদের বারণ না শুনে তিনি ধনুকটা হাতে নিয়ে তাতে গুণ পরাতে চাইলেন। প্রচণ্ড শব্দে ধনুকটা ভেঙে গেল। সেই শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল প্রহরীরা, কেঁপে উঠলেন স্বয়ং কংস।

"তারপরে রাম-কৃষ্ণ আবার ফিরে এলেন মহারাজা নন্দের কাছে।

তাঁদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে রাত কাটালেন তাঁরা। আর কংস সেদিন সারারাত ধরে দুঃস্বপ্ন দেখলেন।"

একবার থামলেন মথুরা মহারাজ। এক ঢোক জল পান করে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন—

"পরদিন সকালে কৃষ্ণ ও বলরাম মল্ল-রঙ্গভূমির দ্বারে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন উৎসব শুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে তূর্যভেরী বাজছে। মালা ও পতাকা দিয়ে রঙ্গমঞ্চ সাজানো হয়েছে। মহারাজ কংস প্রধান মঞ্চে বসে আছেন। তাঁর চারিদিকে অমাত্যগণ। বিভিন্ন মঞ্চে বসে আছেন নন্দরাজ ও অন্যান্য সামন্ত রাজগণ।

"রাম-কৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করতে যাবেন, এমন সময় কংসের আদেশমত মাহুতের নির্দেশে হাতি কুবলয়াপীড় তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। শ্রীকৃষ্ণ মাহুতকে পথ ছেড়ে দিতে বললেন। কিন্তু সে তাঁর কথা না শুনে কুবলয়াপীড়কে তাঁদের দিকে চালিয়ে দিল। রাম-কৃষ্ণকে সে হাতির পায়ের তলায় পিষে মারতে চাইল। কংস তাকে সেই আদেশই দিয়েছিলেন।

"কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল না। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অবলীলাক্রমে কুবলয়াপীড়কে বধ করলেন। তারপরে তার দাঁত দুটি খুলে কাঁধে করে দু'জনে মল্ল-রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁদের দেখতে থাকলেন। দেখলেন আপন আপন মনোভাব অনুযায়ী। মল্লরা দেখল, শ্রীকৃষ্ণ বজ্রের মতো ভীষণ। সাধারণ মানুষদের মনে হল, তিনি নরশ্রেষ্ঠ। পুরনারীরা ভাবলেন, তিনি মূর্তিমান কন্দর্প। গোপগণ মনে করলেন, তিনি তাঁদের পরম আত্মীয়। দুষ্ট রাজাদের কাছে তিনি দণ্ডধর বলে প্রতিভাত হলেন, আর নন্দ তাঁকে দেখলেন একটি কোমল শিশুরূপে। কংসের মনে হল, স্বয়ং যমরাজ এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। মূর্খেরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখল জড়পিণ্ডবৎরূপে, যোগীরা দেখলেন পরমাত্মারূপে, আর বৃষ্ণিগণ দেখলেন পরমেশ্বররূপে। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন।

"আর তখনই কংসের দুই মল্ল, চানূর ও মুষ্টিক সহসা আক্রমণ করল শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে। তারা রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। মহিলারা মনে মনে ধিক্কার দিলেন কংসকে। বললেন, 'এ কি রকমের অদ্ভুত অসম মল্লযুদ্ধ? কোথায় বজ্রের মতো কঠিন ও পর্বততুল্য দুই যোদ্ধা, আর কোথায় কিশোর বয়স্ক দুটি সুকুমার বালক!'

"কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের সকল আশঙ্কা মিথ্যে হল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের হাতে নিহত হল মল্লশ্রেষ্ঠ চানূর ও মুষ্টিক। সঙ্গে সঙ্গে কংসের ইসারায় অন্যান্য মল্লরা একযোগে আক্রমণ করল রাম-কৃষ্ণকে। কিন্তু তারা কোন সুবিধাই করতে পারল না। মুহূর্তে রাম-কৃষ্ণ হত্যা করলেন কয়েকজন মল্লকে। আর তাই দেখে বাকিরা ভয়ে পালিয়ে গেল রঙ্গভূমি থেকে।

"ভয় পেলেন রাজা কংস। ক্রোধে ও হতাশায় তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। তিনি পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলেন, 'কৃষ্ণ ও বলরামকে এখুনি মথুরা নগরী থেকে বের করে দাও, বন্দী কর নন্দকে। গোপদের সমস্ত সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে এসো। আর হত্যা কর বসুদেব এবং উগ্রসেনকে।'

"কিন্তু রাজা কংসের আদেশ পালন করবে কে? প্রাণের মায়ায় প্রহরীরা কেউ এগিয়ে এলো না রাম-কৃষ্ণের কাছে। কংসের আদেশ শুনে এবং প্রহরীদের আচরণ দেখে বিস্মিত হলেন দর্শকবৃন্দ।

"তবে তাঁদের বিস্ময়ের পালা তখনও শেষ হয় নি। সহসা শ্রীকৃষ্ণ লাফ দিয়ে মঞ্চের ওপরে কংসের সামনে উপস্থিত হলেন। সুদৃঢ় হস্তে তিনি তাঁর চুল ধরে তাঁকে মঞ্চ থেকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপরেই লাফিয়ে পড়লেন তাঁর গায়ের ওপরে। শ্রীকৃষ্ণের দেহের ভারে নিষ্পেষিত হয়ে দুরাচার কংস নিহত হল।

"কৃষ্ণ ও বলরাম ছুটে এলেন কংসের কারাগারে—শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমিতে। পরশুদিন সেই পুণ্যভূমি দর্শন করব আমরা।"

আবার একটু থামলেন মথুরা মহারাজ। তারপরে বলতে

থাকলেন, "শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীকে মুক্ত করলেন। রাম ও কৃষ্ণ তাঁদের চরণ-বন্দনা করলেন।

"তারপরে পিতা-মাতাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা এলেন কংসপত্নীদের কাছে। তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে কংসের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করালেন।

"শ্রীকৃষ্ণ মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসন ফিরিয়ে দিলেন। নন্দরাজকে ব্রজধামে ফিরে যাবার অনুরোধ করলেন। মহারাজ নন্দ রাম-কৃষ্ণের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি গোপদের নিয়ে ফিরে এলেন বৃন্দাবনে। দুরাত্মা কংসের নিহত হবার সংবাদে ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্ত হলেন। ব্রজগোপীরা তখনও শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অশ্রুপাত করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসেন নি শুনে তাঁরা আবার আকুল হলেন। আর তাঁদের সে কান্না কোনদিন থামে নি। কিন্তু বিরহিনী ব্রজবালাদের কথা থাক্, আসুন, আমরা শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা কবি।

"বসুদেব পুবোহিত গর্গাচার্য ও ব্রাহ্মণদের দিয়ে রাম-কৃষ্ণের উপনয়ন-সংস্কার করালেন। দুই ভাই গর্গাচার্যের কাছে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে অবন্তীপুব রওনা হলেন।

"অবন্তীপুরে গিয়ে রাম-কৃষ্ণ কাশ্যপগোত্রীয় সান্দিপণি মুনির কাছে বিদ্যাভ্যাস করতে থাকলেন। তাঁরা সংযত-চিত্তে গুরুসেবা শুরু করলেন। গুরুর কৃপায় তাঁরা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং উপনিষদ শিক্ষালাভ করলেন।

"শিক্ষাশেষে তাঁরা যখন গুরুদেবের কাছে গুরুদক্ষিণা দেবার অভিপ্রায় জানালেন, তখন মুনি বললেন, 'তোমরা আমার মৃতপুত্রকে ফিরিয়ে এনে দাও।'

"রাম-কৃষ্ণ তখন যমরাজের কাছ থেকে সান্দিপণি মুনির মৃত-পুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তারপরে গুরুদেবের আশীর্বাদ লাভ করে প্রত্যাবর্তন করলেন মথুরায়।"

পাঠ শেষ হল। প্রণাম সেরে বেরিয়ে আসি নাট-মন্দির থেকে।

আমেরিকান ছেলেটিও বাইরে আসে। আমি কিছু বলার আগেই সে আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, কাল সকালে ব্রিণ্ডাবন থেকে কখন মুথ্‌রার ট্রেন ছাড়বে?"

"ন'টার সময়।" উত্তর দিই। তারপরে বলি, "হঠাৎ এ খোঁজ নিচ্ছো কেন? তুমি তো কাল সকালে আমাদের সঙ্গে পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমায় বেরুচ্ছো।"

"না। আমার আর আপনাদের সঙ্গে পরিক্রমা করা হল না।" একবার থামে ছেলেটি। তারপরে আবার বলে, "আমি কাল সকালের ট্রেনেই মুথ্‌রা চলে যাব।"

"কেন?"

"নবড্ডীপ ঢাম যেতে হবে।......আচ্ছা, মুথ্‌রা থেকে কেমন করে নবড্ডীপ ঢাম যেতে হয়, একটু বলে দিন না!"

"তোমাকে হাওড়াগামী তুফান একস্‌প্রেস ধরে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে নামতে হবে। ব্যাণ্ডেল হাওড়ার মাত্র পঁচিশ মাইল আগে। সেখান থেকে বি. এ. কে. লুপ লাইনের গাড়িতে চেপে তুমি পৌছবে নবদ্বীপ। ব্যাণ্ডেল থেকে নবদ্বীপ ধাম পঁয়ষট্টি মাইল।"

"আর শিরি-খেট্রো?"

প্রশ্নটা বুঝতে পারি না। তাই তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে।

ছেলেটি বুঝতে পারে আমার অবস্থা। সে আবার বলে, "শিরি-খেট্রো? আই মিন্‌ জগন্নাঠ ঢাম......পুরী, পুরী!"

নিজের অজ্ঞতায় লজ্জা পাই। সে শ্রীক্ষেত্র বলেছিল। তাই তাড়াতাড়ি বলি, "তোমাকে নবদ্বীপ থেকে কলকাতায় আসতে হবে। সেখান থেকে সোজা পুরীর গাড়ি পাবে। কিন্তু তুমি কালই চলে যাচ্ছো কেন? আমাদের সঙ্গে বন-পরিক্রমা কর, তারপরে আমাদেরই সঙ্গে চলো কলকাতায়। সেখান থেকে নবদ্বীপ এবং পুরী যাবে।"

"তা হয় না স্যার!" সে বলে, "এখানে আসাটাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে।"

কি বলছে সে? বৈষ্ণবের পক্ষে বৃন্দাবন আসা অন্যায় হয়েছে! তাহলে কি সেবকদের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে? কিন্তু সেবকরা তার দিকে নজর না দিলেও গুরুমহারাজ তো ওর সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করছেন। দুপুরে নাট-মন্দিরের ব্রজরজঃ মিশ্রিত সুতার গালিচায় তুলোর কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে তিনি ওকে একটা সোয়েটার ও একখানা ভাল কম্বল দিয়েছেন। সে অবশ্য নিতে চাইছিল না। তখন গুরুমহারাজ বলেছেন, 'আমি তোমার গুরুদেবের গুরুভাই। আমি তোমাকে বলছি, এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না। তুমি এগুলি নাও, এখানে থাকো, পবিক্রমা কর। তারপরে আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো। আমি তোমাকে নবদ্বীপ ও পুরীতে পাঠিয়ে দেব। এখানে তোমার কোন অসুবিধে হলে আমাকে ব'লো।'

তা সত্ত্বেও সে কাল চলে যেতে চাইছে কেন? সেই প্রশ্নই করি। সে বলে, "আমি জানি স্যার, শিরি ব্রিণ্ডাবন মোক্ষ খেট্রো। কিন্তু আমাকে যে গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন, ডেল্‌হি থেকে সোজা নবড্ডীপ ঢাম যেতে, সেখান থেকে শিরি-খেট্রো হয়ে বৃণ্ডাবন ঢামে আসতে। কিন্তু আমি তাঁর সে আদেশ অমান্য করেছি। ডেল্‌হি থেকে যে লরিতে উঠেছিলাম, সে মুথ্‌রা পর্যন্ত এসেছে। তাই মুথ্‌রায় নামতে হল আমাকে। সেখানে খবর পেলাম আপনাদেব এই বন-পরিক্রমার। লোভ সামলাতে পারলাম না। ভুলে গেলাম গুরুদেবের আদেশ। চলে এলাম এখানে। কিন্তু এখন ভুল ভেঙে গেছে আমার। বন-পরিক্রমা আমি করব, তবে এখন নয়, পুরী ঢাম থেকে ডেল্‌হি ফেরার পথে ব্রিণ্ডাবন আসব আমি। তখন বন-পরিক্রমা করব।"

"তখন একা একা পরিক্রমা করতে তোমার যে খুবই অসুবিধে হবে!"

হেসে ফেলে ছেলেটি। বলে, "আমি তো একাই মহাপ্রভু আর শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শন করতে ইণ্ডিয়াতে এসেছি।"

"কিন্তু তুমি নবদ্বীপ ও পুরী যাবে কেমন করে? তোমার সঙ্গে যে টাকা-পয়সা কিছুই নেই!"

আবার একটু হাসে সে। বলে, "আমি তো টাকা-পয়সা ছাড়াই লণ্ডন থেকে শিরি ব্রিণ্ডাবন এসেছি। যদি রেলে অসুবিধে হয়, তাহলে আমি 'বাই রোড্‌স' যাব। 'ট্রাক'-য়ে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে।"

"খাবে কি?" জিজ্ঞেস করি।

"পেলে খাব, না পেলে খাব না। তাছাড়া তোমার দেশের লোকেরা, বিশেষ করে ট্রাক-ড্রাইভাররা বড় অতিথিপরায়ণ। তাঁরা আমাকে চাপাটি ও সব্‌জি খেতে দেন। আমার কোন অসুবিধে হবে না।"

মনে মনে ভাবি, হয়তো তুমি মিথ্যে বলছো না। কারণ, সব দুঃখ সইবার সঙ্কল্প করেই তুমি দুঃখহারীর শরণ নিয়েছো। কিন্তু আমরা ভোগ-বাসনাময় সাধারণ জীব। আমরা তো তোমার এ আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারি না।

তাই বলি, "তাহলে অন্তত তুমি আমার একটা কথা রাখো।" আমি তার একখানি হাত ধরি, "আমার সহযাত্রীদের ইচ্ছে, তাঁরা চাঁদা তুলে তোমাকে কিছু টাকা দেন। তুমি তাঁদের এ ইচ্ছা অপূর্ণ রেখো না।"

ছেলেটির হাসিমাখা মুখখানিতে যেন বিষাদের ছায়া নেমে আসে। কিন্তু তা সাময়িক। তারপরেই সে মুখে আবার হাসি ফুটিয়ে বলে, "তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন। আর বলবেন, তাঁরা যেন ক্ষমা করেন আমাকে। টাকা আনার হলে, আমি বাবার কাছ থেকেই নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু গুরুদেবের আদেশে আমি বাবার কাছ থেকে টাকা নিই নি। এজন্য আমার মা অনেক কান্না-কাটি করেছেন, কিন্তু আমি তাঁর অবাধ্য হয়েছি।"

চুপ করে কি ভাবছে ছেলেটি। সে কি তার মা-বাবা ও প্রিয়জনের কথা ভাবছে? না, ভাবছে সেই পরম-পুরুষের কথা,

যিনি একদিন বৃহত্তর কর্তব্যের প্রয়োজনে মা যশোদা ও শ্রীরাধিকাকে ফেলে বৃন্দাবন থেকে মথুরা চলে গিয়েছিলেন? অথবা ভাবছে, তার পরম-গুরুর কথা, যিনি একদিন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন?

ছেলেটি আবার কথা বলে। আমি তার দিকে তাকাই। সে করুণস্বরে বলে, "আপনি বিশ্বাস করুন, আমার টাকার কোন দরকার নেই। তবে আপনারা যদি একান্তই আমাকে কিছু টাকা দিতে মনস্থ করে থাকেন, তাহলে সে টাকা একটি দরিদ্র ব্রজবাসী পরিবারকে দিয়ে দেবেন।"

কি বলব? আমার বোঝা উচিত ছিল, সে আমাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবে। সাহায্য নেবার মতো মনোবৃত্তি হলে সে এদেশে আসত না। আর এসেও এমন কষ্ট করত না। শুনেছি, তার ঝোলায় একখানি শ্রীকৃষ্ণের ছবি, ছোট একখানি ইংরেজী ভাগবত, কয়েক টুকরো গোপীচন্দন ও একখানি গামছা ছাড়া আর কিছু নেই। পোশাক বলতে দু'খানি খাটো বহির্বাস ও একটি জামা। বিছানা বলতে তুলোর একখানি কম্বল। এই কম্বল সম্বল করেই সে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভারতে এসেছে।

কথায় কথায় ছেলেটি বলে, "আমি গুরুদেবের কাছে বাংলা শিখছি, তবে এখনও বলতে পারি না, সামান্য বুঝতে পারি।"

হেসে বলি, "কিন্তু এখনও বাঙালী বৈষ্ণব-খানাটা রপ্ত করতে পারো নি।"

"ঠিক ধরেছেন।" হেসেই উত্তর দেয় সে। বলে, "তাই খেতে বসে সব সময় পাশের লোকের দিকে নজর রাখতে হয়।"

না, কোন ভুল করে নি সে। আমাদের দেখে দেখে ঠিক খেয়ে নিয়েছে। কেবল দুধ খাওয়াটা অদৃষ্টে জোটে নি। ওর তো আর থালা-বাটি নেই, শালপাতায় খেয়েছে। পরিবেশক পাতার ওপরেই দুধ ঢেলে দিয়েছিলেন। তাতে পরিবেশক লজ্জা পান নি, কিন্তু সে বিব্রত হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে পাতা

তোলার সময়। যথাসম্ভব পাতার চারিদিকে গড়িয়ে পড়া দুধ পরিষ্কার করে পাতা তুলতে হয়েছে তাকে।

তাতেও রেহাই পায় নি। স্বভাবতঃই পাতা হাতে নিয়ে যাবার সময় পথে ফোঁটা ফোঁটা দুধ গড়িয়ে পড়ছিল। আর তাই দেখে নরেনপ্রভু ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমাকে বলেছিলেন, "ছ্যাহেন, আম্‌রিকানডার কাণ্ড ছ্যাহেন—আইঠা ছড়াইতে ছড়াইতে চল্‌ছে। এই মেলেচ্ছ আবার বৈষ্ণব হইছে।"

ছেলেটি নরেনপ্রভুর বক্তব্য ঠিক বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝেছিল যে, কথাটা তাকে উদ্দেশ করেই বলা হয়েছে এবং সেটি প্রশংসাবাক্য নয়। তবু নিরুপায় অতিথি নীরব রয়েছে। শুধু সে আরও বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাই তখন আমার বড় মায়া হচ্ছিল। কিন্তু আমি নরেনপ্রভুকে কিছুই বলতে পারি নি।

আমি শুধু ভেবেছি. সে কি সত্যিই ম্লেচ্ছ? আর তারপরেই মনে হয়েছিল, বটেই তো, ভোগসর্বস্ব সমাজের ছেলে সে, যাঁরা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম স্থানে আরোহণ করেছেন, তাঁদের দেশের মানুষ সে—সে ম্লেচ্ছ হবে না কেন?

কিন্তু তাহলে সে এদেশে এলো কেন? সে কি শুধুই 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'-য়ের মোহে?

এখন মনে হচ্ছে—না। কেবল রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জনের মোহে মানুষ এমন দুঃখ বরণ করতে পারে না। বিশ্ব-ইতিহাসের মহত্তম মহামানবের চরিত্র-মাধুর্যে মোহিত হয়েই সে এদেশে এসেছে, —এসেছে মধু-বৃন্দাবনে।

কিন্তু তিন হাজার বছর আগের ভারতের এই ক্ষুদ্র জনপদের সেই শিশুটি কেমন করে আধুনিক বিশ্বের বৃহত্তম মহানগরীর এই তরুণটিকে ঘর-ছাড়া করল? কেন বিজ্ঞান আর মারণাস্ত্র ফেলে এই তরুণ খোল-করতাল হাতে তুলে নিল? কি আছে তাঁর কথা ও কাহিনীতে?

আছে, নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমরা উপলব্ধিহীন বলে বুঝতে পারছি না। অজ্ঞ বলে বিস্মিত হচ্ছি। আসুন, আমরা শুধু সেই সর্বশক্তিমানকে মনে মনে প্রণাম করে বলি—হে পুরুষোত্তম, তুমি আমাদের ক্ষমা করো।

॥ চোদ্দ ॥

প্রভাতী পাঠ ও কীর্তনের পরে সংকীর্তন করতে করতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পথে। আমেরিকান ছেলেটি দাঁড়িয়ে রইল আশ্রমের সামনে। হাত নেড়ে বিদায় জানালো। সে আজ চলে যাচ্ছে আমাদের ছেড়ে। গুরুদেবের আদেশ পালন করতে বন-পরিক্রমা না করে যাচ্ছে নবদ্বীপ। আদেশ দেবার সময় গুরুদেব যে এ পরিক্রমার কথা জানতেন না, তা মেনে নিয়েও সে চলে যাচ্ছে।

কেনই বা যাবে না? সে যে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দালক ও একলব্যের দেশে এসেছে। এসেছে শ্রীচৈতন্যের ভারতে—তাঁদেরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। সে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবে কেমন করে?

গুরুদেবের আদেশ রক্ষা করার জন্য সে রইল দাঁড়িয়ে, আর গুরুমহারাজের সঙ্গে আমরা চললাম এগিয়ে। প্রতিদিনের মতই শোভাযাত্রা। তেমনি ফেস্টুন, পতাকা ও খোল-করতালসহ 'কালারফুল প্রসেশান।' আজ আমরা পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা করছি।

মনে পড়ছে স্বামী বিবেকানন্দের কথা। তিনিও একদিন এই পরিক্রমা করেছিলেন। স্বামীজীর পদরেণু-রঞ্জিত বৃন্দাবনের পথে এগিয়ে চলেছি আমরা।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ভারত-পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। জীবন-ধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ছাড়া আর কিছু সঙ্গে ছিল না তাঁর। তিনি কারও কাছে ভিক্ষা চাইতেন না। যা জুটত, তাই খেতেন। তার ওপর তিনি আবার যথাসম্ভব নিজের অতুল বিদ্যা-বুদ্ধি গোপন করে সাধারণ সাধুদের মতো চলা-ফেরা করতেন। ফলে, একবার তাঁকে পাঁচদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছিল। রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে তিনি পথ চলতেন। ধর্মশালা, ভগ্ন-দেবালয়, ঝোপ-জঙ্গল ও গুহায় রাত কাটাতেন। সম্বল বলতে একখানি গীতা। পরনে গৈরিকবাস ও গৈরিক আলখাল্লা।

এক হাতে দণ্ড ও আর এক হাতে কমণ্ডলু নিয়ে এই বিশালনয়ন ও অনুপমকান্তি বীর সন্ন্যাসী 'নারায়ণ হরি' বলতে বলতে বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে কাশী, অযোধ্যা ও আগ্রা হয়ে পদব্রজে বৃন্দাবনে আসেন। তারিখটা ছিল ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট।

পথ-পর্যটনে ক্লান্ত স্বামীজী ধুলি-ধুসরিত দেহে বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে পৌঁছে দেখলেন, পথের পাশে একজন লোক মহা আরামে ধূমপান করছে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর স্বামীজী তার কাছে কল্‌কেটি চাইলেন। লোকটি ত্রস্তভাবে জানালো, 'মহারাজ, ম্যাঁয় ভঙ্গী (মেথর) হুঁ।'

স্বামীজী নিরাশ হয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলেন। প্রায় সিকি মাইল চলার পরে হঠাৎ তাঁর মনে হল—সারা জীবন আত্মার অভেদ বিচার করে, শেষে জাতিভেদ পাঁকে পড়লাম! ছিঃ ছিঃ, এখনও সংস্কার!

তিনি ফিরে গেলেন মেথরের কাছে। লোকটি তখনও সেখানে বসে। তিনি তাকে বললেন, 'বেটা, হম্‌কো জলদি একঠো ছিলাম ভরকে দো।'

লোকটি আবার বলল, 'মহারাজ, আপ সাধু হ্যাঁয়, ম্যাঁয় ভঙ্গী হুঁ।'

কিন্তু স্বামীজী এবারে আর তার আপত্তি শুনলেন না। মেথরের কল্‌কেতে তামাক খেয়ে মহানন্দে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন যুগনায়ক বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ নয়দিন বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি এখানে বলরামবাবুদের ঠাকুরবাড়িতে (কালাবাবুর কুঞ্জে) বাস করেছেন। রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা-বিলাসের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী তাঁর কাছে জীবন্ত বলে মনে হল। তিনি কৃষ্ণলীলার ভাববন্যায় ভেসে চললেন। নিজেকে সামলানো দুরূহ হয়ে পড়ল তাঁর পক্ষে।

এই সেই বৃন্দাবন—বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের ভাবভূমি বৃন্দাবন। সেই বৃন্দাবনের পথে পদচারণা করছি আমরা। ধন্য আমি—ধন্য আমার জীবন।

কিন্তু আমার কথা থাক্, বিবেকানন্দের কথাই ভাবা যাক্। বৃন্দাবন দর্শন ও পরিক্রমার পরে স্বামীজী গোবর্ধন ও রাধাকুণ্ড পরিক্রমা করেন। সে সময়ে দুটি আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি।

প্রথমটি ঘটে গিরিরাজ গোবর্ধন-পরিক্রমার সময়ে। হিংস্র শ্বাপদ পরিপূর্ণ জনবিরল বনপথে একাকী পথ চলছেন স্বামীজী। ক্ষুধা ও পথশ্রমে ক্লান্ত তিনি। এই সময় নামল বৃষ্টি। তবু থামলেন না তিনি, দুর্বার বেগে চললেন এগিয়ে। কেটে গেল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বৃষ্টি গেল থেমে। আর তখুনি সেই বিজন বনে একজন লোক অনেক উপাদেয় খাদ্য-সম্ভার নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হল। লোকটি তাঁকে খাবার দিয়ে কোন কথা না বলে কোথায় যেন চলে গেল। শ্রীভগবানের অসীম করুণার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে স্বামীজীর চোখদুটি জলে ভরে উঠল।

গোবর্ধন-পরিক্রমা পূর্ণ করে স্বামীজী উপস্থিত হলেন জনহীন রাধাকুণ্ডের তীরে। তখন তাঁর কৌপীন ছাড়া আর কোন বসন ছিল না। তাই তিনি কৌপীনটি ধুয়ে তীরে শুকোতে দিয়ে জলে নামলেন। স্নান শেষ করে জল থেকে উঠে দেখেন, কৌপীনটি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে দেখতে পেলেন, একটি বানর কৌপীনটি নিয়ে একটা গাছের ওপর বসে আছে।

বহু চেষ্টা করেও স্বামীজী কৌপীনটি উদ্ধার করতে পারলেন না। তখন তিনি রাধারাণীর ওপর অভিমান করে গহন বনে প্রবেশ করলেন। সঙ্কল্প করলেন, অনাহারে দেহত্যাগ করবেন।

সেদিনের মতই সহসা একজন লোক উপস্থিত হল তাঁর সামনে। একখানি গেরুয়া বসন ও কিছু খাবার দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বামীজী সানন্দে রাধারাণীর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। তারপরে তিনি ফিরে এলেন রাধাকুণ্ডের তীরে। সবিস্ময়ে দেখলেন,

যেখানে যেভাবে তিনি কৌপীনটি শুকোতে দিয়েছিলেন, সেটি সেখানে ঠিক সেইভাবেই পড়ে রয়েছে।

সেবারে স্বামীজী বৃন্দাবন থেকে হাতরাস হয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেকথা স্মরণ করার অবসর নেই আমার। আমি যে পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা করছি। চক্রবর্তী ইসারায় কীর্তন করতে বলছে আমাকে। অতএব মুখ খুলতে হয়।

আজ একটানা মাইল-আটেক হাঁটতে হবে আমাদের। এ যাত্রায় একসঙ্গে এতখানি পথ আর হাঁটতে হয় নি। বুঝলাম, ইচ্ছে করেই কর্তৃপক্ষ আজকের দিনে এই পদযাত্রার ব্যবস্থা করেছেন। কাল থেকে বন-পরিক্রমা শুরু হবে, আজ একটু 'প্র্যাক্‌টিস্' করে নেওয়া দরকার। পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ যেমন তাঁদের 'কোর্স'-য়ে 'নো দাই দার্জিলিং' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তেমনি আজ আমরা 'নো দাই বৃন্দাবন' করছি।

বৃন্দাবনে এলে পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা করতেই হয়। অনেক পুণ্যার্থী প্রতিদিনও পরিক্রমা করে থাকেন। আমাদের ঝামেলায় আজকাল পেরে উঠছেন না, নইলে বৃন্দাবন মহারাজ নাকি প্রতিদিন পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা করেন। ভাগ্যবান লোক—শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসবাস করছেন, পুণ্যবান তো বটেই।

যাক্ গে, এবারে নিজেদের কথায় ফিরে আসা যাক্। আমরা বড় রাস্তা দিয়ে মাইলখানেক হেঁটে ডানদিকের কাঁচা রাস্তা ধরলাম। কাঁচা হলেও বেশ চওড়া—গোরুর গাড়ি চলাচল করতে পারে। পথের ধূলিতে চাকার চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি।

প্রশস্ত পথ দিয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ পথ চলতে পারলাম না। একটু বাদেই কাঁটাগাছে ছাওয়া সরু পায়ে-চলা পথে পড়তে হল। কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথে কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলতে হচ্ছে আমাদের। কয়েকজন যাত্রীকে দ্বিধা করতে দেখে নরেনপ্রভু বলে উঠলেন, "আরে আউগাইয়া চলেন, আউগাইয়া চলেন। ভয়

পাইবেন না। আইজ 'সোন' লইয়া আইছি। কাঁটা ফুড়লেই চাইয়া লইবেন।"

অতএব তাঁরা নির্ভয়ে এগিয়ে চলেন। ভয় নেই, নরেনপ্রভু সোর্ণা নিয়ে এসেছেন।

বৃন্দাবনবাসী দু'জন বৃদ্ধা চলেছেন আমার আগে আগে। চলেছেন অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ঠিকমত হাঁটতে পারছেন না। পারার কথাও নয়। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। তাঁরা কিন্তু কয়েকবার এই পরিক্রমা করেছেন। তবু আজ আবার এসেছেন। গুরুদেবের সঙ্গে বৃন্দাবন-পরিক্রমার সৌভাগ্য কি সকলের হয়?

কোনরকমে তাঁদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলি। কিন্তু তাতে মুশকিল বাড়ল বৈ কমল না। এবারে এক মাড়োয়ারী ভদ্রমহিলা আমার সামনে। মাঝে মাঝেই পথের ওপরে পিঁপড়ের সারি। ভক্ত-বৈষ্ণবী হয়ে তিনি পিঁপড়ে মাড়ান কেমন করে? তাই পিঁপড়ে এড়াতে সঙ্কীর্ণ পথের দু'দিকে ছুটোছুটি করছেন আর কাঁটার খোঁচা খাচ্ছেন। তাই বলে কীর্তন ছাড়ছেন না। সমানে বলে চলেছেন—'গৌর হরি গৌর হরি বল, বৃন্দাবনের পথে পথে চল।'

কিছুক্ষণ বাদে আর একজন বৃদ্ধা আবার একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। একপাল গোরু যাচ্ছিল উল্টোদিকে। তিনি সেই চলমান গোরুদের ভেতরে আটকে পড়েছেন। গরুগুলি তাঁকে কিছুই বলছে না। কেন বলবে? তারা যে কৃষ্ণের জীব, কৃষ্ণ-ভক্তকে কি গুঁতোতে পারে? বৃদ্ধা কিন্তু সমানে চেঁচিয়ে চলেছেন "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।"

বাধ্য হয়ে আমি তাঁকে হাত ধরে বের করে নিয়ে আসি। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেন। বলেন, বৃন্দাবনচন্দ্রের কৃপায় আমি নাকি তাঁদের সঙ্গে এসেছি।

বলি, "আমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট না করে, কীর্তন করুন।"

তিনি সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেন, "গৌর হরি গৌর হরি বল......"

আমরা অটলবন ছাড়িয়ে কেবারিবনে পদার্পণ করলাম। কথিত আছে, ভাতরোলে ভোজন শেষ করে সখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গিয়েছিলেন অটলবনে। সখারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'কেমন খাওয়া হল ?'

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, 'অটল হয়েছে।'

সেই থেকেই তিনি অটলবিহারীরূপে অটলবনে বিরাজ করছেন।

আমরা এখন কেবারিবনের ভেতর দিয়ে পথ চলছি। এই বনেই দাবানলকুণ্ড এবং কাঠিয়া বাবার আশ্রম। কথিত আছে, যেদিন শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে দমন করেন, সেদিন রাতে ব্রজবাসীরা এখানে এসে ঘুমিয়েছিলেন। খবব পেয়ে কংসেব অনুচররা তাঁদের পুড়িয়ে মারবার মতলবে বনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজবাসীদের চোখ বুজতে বলে স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে সেই দাবানল নির্বাপিত করলেন। চোখ খুলে আগুন দেখতে না পেয়ে ব্রজবাসীরা একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকলেন, 'কে নিবারি ?' তাই এ বনের নাম কেবারিবন।

পায়ে-চলা পথটি ফুরিয়ে গেল। আমরা একটা প্রশস্ত কাঁচা পথে এলাম। ধূলিময় পথ। পথের দু'পাশে বড় বড় গাছ। মনে হচ্ছে এটিই বল্লাবাঈ নির্মিত ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বৃন্দাবন-মথুরা রাজপথ। এখানে খানিকটা জায়গায় সেই প্রাচীন পথটি রয়ে গেছে।

আমরা বৈষ্ণব পারমার্থিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এলাম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলি বড় বড় বাড়ি। বিরাট ব্যাপাব। শিক্ষাব্রতী ও কর্মযোগী স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় বন মহারাজেব কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। তিনি প্রভুপাদের প্রবীণতম শিষ্য। সম্রাট পঞ্চম জর্জের আমন্ত্রণে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ গিয়েছিলেন তিনি। সেবারেই হের হিটলার তাঁর সঙ্গে আলাপ করে প্রীত হন। তারপরে আরও কয়েকবার তিনি ভারতের বাইরে গিয়েছেন। প্রত্যেকবারেই প্রভূত সম্মান লাভ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে পথের ডানদিকে শ্রীরাধাকুপ। ব্যস্, বলতে দেরি আছে, ছুটতে দেরি নেই। সবাই ছুটে গেলেন কুয়োর ধারে। ঝুঁকে পড়ে 'রাধেশ্যাম', 'রাধেশ্যাম' বলে চীৎকার শুরু করে দিলেন। কিন্তু যে জন্য চীৎকার, তা আর শোনা হল না কারও। কারণ, একের ধ্বনিতে অপরের প্রতিধ্বনি গেল হারিয়ে। ওঁরা প্রতিধ্বনি শুনতেই চেয়েছিলেন।

একটি বাঁধানো বড় রাস্তা পেরিয়ে আমরা নতুন কাঁচা পথে পৌঁছলাম। সেই পথ ধরেই এগিয়ে চললাম উত্তরে। পথের দু'দিকে বাড়ি-ঘর। বিহারবনের এই অংশের নাম রমণরেতী।

কিছুদূর এগিয়ে আমরা রমণরেতীর রমণীয়তম অংশে পৌঁছলাম। ডানদিকে বৃক্ষাচ্ছাদিত ছায়াশীতল বনভূমি। কোন মন্দির নেই। পথটি বালুকাময়। সেই বালির ওপরেই বসে পড়লেন সবাই। তাঁরা বালির ঘর বানাতে শুরু করলেন। হিমালয়ের বহু দুর্গম তীর্থে পাথরের ঘর বানাতে দেখেছি। এখানে পাথর নেই, আছে বালি—ভক্তের ভাষায় রেতী। সেই রেতী নিয়ে রমণ করছেন পুণ্যার্থীরা। তাঁরা বালির বাসা বাঁধছেন।

বাসা না বাঁধলেও বসতে হয় এখানে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে হয় এই রমণীয় স্থানে। নইলে পরিক্রমার ফল হয় না। আমিও তাই বসে পড়ি বালির ওপরে।

এবারে আবার শুরু হবে পরিক্রমা। আমরা উঠে দাঁড়াই। রমণরেতীতে কোন মন্দির নেই। মনে মনে রাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম* করে কীর্তন ধরি। এগিয়ে চলি বরাহ-মন্দিরের দিকে—পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমার পথে।

বরাহ-মন্দিরের সামনে এসে থামা গেল। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে এখানে বরাহ মূর্তিতে দর্শন দিয়েছিলেন।

ছোট মন্দির—ভেতরে বরাহমূর্তি। মন্দিরের সামনে একটি কেলিকদম্ব গাছ। কাছেই গৌতম মুনির আশ্রম। তারপরেই

কয়েক ধাপ সিঁড়ি—বরাহঘাট। জল নেই। যমুনা সরে গেছে বহু দূরে। এটি বৃন্দাবনের প্রথম ঘাট। এ জায়গাটির নাম গোচারণবন।

একটু এগিয়ে রাধামদনমোহনের প্রাচীন বাগিচা—বিশাল বাগান। সেবাইতদের পারিবারিক কলহের জন্য কিছুকাল আগে নীলাম হয়ে গেছে।

ছাড়িয়ে এলাম গৌঘাট। পৌঁছলাম কালীয়দমন বনে। সবুজ গাছে ছাওয়া মাটির পথ। দু'ধারে চোখ-জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আমরা কালীয়দমন ঘাট পেরিয়ে এলাম। পথ এখন ধূলিময়। ধূলি তো নয়, ব্রজবজঃ। তাই কেষ্টপ্রভু শুয়ে পড়লেন পথের ওপরে। সহযোগী ব্রহ্মচারীরা তাঁকে ধূলি-চাপা দিলেন।

আমরা চলেছি এগিয়ে। চলেছি সেই পরিখার ভেতর দিয়ে। সেদিন কালীয়দমন স্থানে যে পরিখার পাশে বসেছিলাম। এখন জল নেই। তবে ঝুলনের সময় নাকি জল থাকে ।

ছাড়িয়ে এলাম হনুমানঘাট। এমন তো কত ঘাটই আছে বৃন্দাবনে। কয়েক পা পরে পরেই এক-একটি ঘাট—কোনটি ছোট, কোনটি বড়। কোনটিতে জল আছে, কোনটিতে নেই। প্রত্যেকটির সঙ্গেই একাধিক কাহিনী যুক্ত ছিল। আমরা এখন বিস্মৃত হয়েছি সে-সব কাহিনী। আর শুধু ঘাট কেন, আমরা তো বৃন্দাবনকেই ভুলতে বসেছি। আমরা যে ভুলতে বড়ই ভালোবাসি!

একটু এগিয়ে গোপালঘাট। শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়কে দমন করেছিলেন, তখন নন্দরাজ ও যশোদা শঙ্কিত বক্ষে বসে ছিলেন এই ঘাটে। তারপরে কালীয়কে দমন করে শ্রীকৃষ্ণ যখন উঠে এলেন তীরে, তখন মা-যশোদা গোপালকে কোলে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। ব্রজরাজ তখন এই ঘাটে বসে পুত্রের মঙ্গল-কামনায় গাভীদান করেছিলেন।

গোপালঘাট থেকে আমরা এলাম সূর্যঘাটে। এ ঘাটের আরও দুটি নাম আছে—আদিত্যঘাট ও প্রস্কন্দনতীর্থ। ঘাটের কাছেই মদনমোহন মন্দির বা দ্বাদশ আদিত্যটিলা। সেদিন আমরা দর্শন

করেছি। কথিত আছে, কালীয়কে দমন করার পরে শ্রীকৃষ্ণ এসে বসেছিলেন ঐ টিলার ওপরে। শ্রীকৃষ্ণের শীত লেগেছে ভেবে সূর্যদেব দ্বাদশ আদিত্যের প্রভাবে উগ্র রশ্মি বিকিরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীর থেকে ঘাম বের হয়ে যমুনায় পড়েছিল। তাই সূর্যঘাটের অপর নাম প্রস্কন্দনতীর্থ।

একে একে যুগলঘাট, বিহারঘাট, অন্ধেরঘাট, আম্‌লিঘাট, শিঙ্গারঘাট, গোবিন্দঘাট, চীরঘাট ও ভ্রমরঘাট দর্শন করে আমরা কেশীঘাটে এলাম। কেশীঘাট বৃন্দাবনের বৃহত্তম ঘাট।

জল অবশ্য নামমাত্র—গভীরতম স্থানেও বুক পর্যন্ত। কিন্তু নদীগর্ভ বেশ প্রশস্ত—প্রায় মাইলখানেক বিস্তৃত। জল বলতে অবশ্যি শ'খানেক গজের দুটি অগভীর ধারা—একটি ঘাটের কাছে, আর একটি মাঝখানে। বাকি সবটা জুড়ে কেবল বালি আর বালি।

তাতে কিন্তু পুণ্যার্থীদের কিছু এসে যায় নি। ঘাটের জলটুকুই যথেষ্ট তাঁদের কাছে। এই ক্ষীণ অগভীর জলধারায় প্রতিদিন শত শত পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান করে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করছেন।

গুরুমহারাজ যাত্রা বিরতির আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন থেমে গেল, ভেঙে গেল শোভাযাত্রা। আমরা মথুরা মহারাজকে ঘিরে দাঁড়ালাম। তিনি কেশী-বধের কাহিনী পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপরে বললেন, "ঠিক দশটার সময়, অর্থাৎ পৌনে একঘণ্টা পরে আবার পরিক্রমা আরম্ভ হবে। আপনারা চট করে স্নান করে নিন। এখানে স্নান করলে অক্ষয় পুণ্য হয়। কিন্তু দেখবেন, জলে কচ্ছপ আছে। ওদের কোন আঘাত দেবেন না। বৃন্দাবনে প্রতিবছর একাধিক পুণ্যার্থী কচ্ছপের কামড়ে মারা যায়।"

তাঁরা বোধহয় বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং তাঁদের আর পুনর্জন্মের দুর্ভোগ সইতে হয় না। কিন্তু সেকথা জিজ্ঞেস করা যাবে না। কাজেই গামছা ও কাপড় নিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে চলি। কচ্ছপের ভাবনাটা কিন্তু মন থেকে মুছে যায় না। যাবার কথাও নয়। কারণ কচ্ছপ এবং শুয়োর, অর্থাৎ কূর্ম এবং বরাহ

বৃন্দাবনকে রক্ষা করে চলেছে। বৃন্দাবনে একটা মিউনিসিপ্যালিটি আছে। কিন্তু তাঁদের কোন মেথর আছে বলে মনে হয় না। কারণ, আজ পর্যন্ত তেমন কাউকে দর্শন করি নি। হয়তো প্রয়োজন নেই বলেই পৌরসঙ্ঘ জনসাধারণকে বাজে খরচের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। যমুনার জলে কচ্ছপ আর বৃন্দাবনের মাটিতে শুয়োর সুষ্ঠুভাবে হরিজনদের কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছে। অতএব তারা যদি মাঝে মাঝে মানুষ মারার মতো কোন বৈপ্লবিক কাজ করে ফেলে, তাতে ভগবান তাদের প্রতি রুষ্ট হন না। কারণ, এ যুগে ভগবান নিশ্চয়ই তাঁর প্রাক্তন অবতারদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দান করেছেন।

এবারে কেশীঘাটকে একটু ভাল করে দেখে নেওয়া যাক্। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সুবিরাট ঘাট। ঘাটের ওপরে কয়েকটি মন্দির। পাশেই বড় বড় কয়েকখানি বাড়ি। সমস্ত জায়গাটাই বাঁধানো—নদীগর্ভ থেকে অনেকটা উঁচু। ঘাট থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে যমুনায়।

খানিকটা দূরে বয়া দিয়ে একটা ভাসমান পুল তৈরি করা হয়েছে। পাঁচটি পয়সা দিলে জলে না নেমে যমুনা পার হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের আমলে কি পাবানি বেশি ছিল? অন্তত নৌকা-বিলাসের কাহিনী থেকে তো তাই মনে হয়। যদিও ভাগবতে সে কাহিনীটি নেই। সে কাহিনী আমরা প্রথম পাই চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'। আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমি কিন্তু সেই সুন্দর কাহিনীকে কিছুতেই কষ্ট-কল্পনা বলে ভাবতে পারছি না।

এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ এখন মোটামুটি একমত যে, দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমীনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণ সমসাময়িক। অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতাব্দী। অথচ ভাগবত সঙ্কলিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় নবম কিংবা দশম শতাব্দীতে এবং তা হয়েছে দক্ষিণ-ভারতে। আর চণ্ডীদাস খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর কবি। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দু'হাজার বছর বাদে দক্ষিণ-ভারতে সঙ্কলিত ভাগবত

যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আড়াই হাজার বছর পরে পূর্ব-ভারতে বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ই বা মিথ্যে হবে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ কেবল সর্বশাস্ত্রবিদ, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, ধর্মজ্ঞ ও তপস্বী ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রেমিক ও সংসারী। কাজেই তিনি নৌকা বাইতে জানতেন না, একথা মনে করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

অতএব লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নৌকা-খণ্ড লীলা করা মোটেই অসম্ভব নয়। বিশেষ করে তিনি যখন 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি' করতেন, তখন তাঁর পক্ষে নৌকাবিলাস করে থাকা খুবই স্বাভাবিক।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই লীলার কথা বলা হয় নি। কারণ ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের মতো বৃন্দাবনের বাসিন্দা অথবা আমার মতো বরিশালের গাভা গ্রামের মানুষ ছিলেন না। তিনি নৌকাচড়ার মজা জানতেন না। অতএব মধু-বৃন্দাবনের এই মধুর লীলাটিকে বাদ দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু আমার পক্ষে তো আর তা করা সম্ভব নয়। তাই আমি ভেবে চলেছি নৌকা-খণ্ডের কথা—

মথুরার হাট ভেঙেছে। কলভাষিণী গোপীগণ ঘরে ফিরছেন। তাঁরা খেয়াঘাটে এলেন। বিহঙ্গের কূজনে, ভৃঙ্গের গুঞ্জনে আর যমুনার কলগানে মুখরিত তীরভূমি তাঁদের কলহাস্যে ভরে উঠল। সেখানে তখন গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে।

সহসা সকলের সব শব্দ ছাপিয়ে সুমধুর স্বরে কে যেন গেয়ে উঠলেন—

'কে পারে যাবি আয়।'

আমি সখের নেয়ে সাধের তরী ভাসিয়েছি প্রেম-যমুনায়॥'

সখীরা সবিস্ময়ে দেখলেন, কানাই কূলে বসে একমনে মাটির ঘর তৈরি করছেন আর গান গাইছেন। কৃষ্ণের একাগ্রতা দেখে বৃন্দা পরিহাস করে বললেন, 'আ মরি কচি খোকা! কূলে বসে

ধূলি-খেলা করছো, বেশ লাগছে। আবার যমুনার হাল ধরার সখ হল কেন?'

কিছুই যেন শুনতে পান নি, এমনি ভাব করে লীলাবিহারী কৃষ্ণ বললেন, 'আমাকে কিছু বলছো নাকি? চেঁচিয়ে বলো, কানে তালা লেগে কাল থেকে যে কালা হয়ে আছি!'

হেসে ললিতা বললেন, 'শুনেছি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরধ্বনি তোমার কানে বাজে, আব গোপীদের কাছে তুমি বুঝি কালাচাঁদ? কি করব, তোমার মোহন-বেণুর তান আমাদের দু'কুল খেয়ে বসে আছে যে!'

কৃষ্ণ বললেন, 'আগে তো শুনেছি তোমরা মাখন-ছানা বিক্রি করতে, এখন বুঝি পাড়ায় পাড়ায় কুল নিয়ে বেড়াও?'

চিত্রা বললেন, 'এতদিন মাখন-ছানা বিক্রি করেছিলাম, কেউ হানা দিত না। দুষ্টের ভয় ছিল না গোকুলে। ইদানিং একজন দানী সেজে পথে পথে রাহাজানি করছে।'

কথায় কথায় সময় বয়ে যায়, বৃন্দাবনে সূর্যাস্ত হয়। যমুনার জলে তুফান ওঠে। উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে রাধারাণীর মন। তিনি বলেন—

'কুল ছেড়ে অকূলে ভেসে আর কি লো কূল পাব শেষে,
নূতন নেয়ে—থৈ না পেয়ে—ভয় পাছে, সই, মজায় দয়॥'

কৃষ্ণ বলেন—'আমি নূতন নেয়ে নই।

*　　*　　*

খেয়া ঘাটে এ তল্লাটে কাণ্ডারী নেই আমা বই॥
আশাহারা দিশাহারা আমায় যে ডাকে,
সরল মনে—প্রেমের পণে পার করি তাকে।
প্রেম-পিয়াসে তারি আশে কূলে বসে রই
যে ওঠে না'তে হাতে হাতে পারের কড়ি গুনে লই॥'

বৃন্দা বললেন, 'আমরা কাঙালিনী ব্রজবালা, পারের কড়ি কোথায় পাব? তার বদলে তোমাকে আমরা বনমালা গেঁথে দেব।'

'তা তো বটেই!' কৃষ্ণ বললেন, 'খালিহাতে পার করে দিয়ে রাতে বিছানায় শুয়ে তোমাদের চন্দ্রবদন ধ্যান করব, এই তো! সেটি হচ্ছে না বাপু, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য "তিন-গুণো পণ" গুনে নেব। যদি রাজি থাকো, তবে পারানি চুকিয়ে নৌকায় চড়ে বসো।'

ললিতা হেসে বলেন, 'ওহে দয়ার সাগব কল্পতরু, তুমি তো মাঠে মাঠে গোরু চরাতে আর ব্রজের ঘরে ঘরে ননী চুরি করে বেড়াতে। জানি, তুমি চুরিবিদ্যায় পেকে গেছো। সুযোগ পেলে কাপড়-চোপড় থেকে মনটি পর্যন্ত চুরি করে নাও। কিন্তু কবে থেকে তুমি আবার নেয়ে-গিরির ব্যবসা শুরু করলে?'

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'তোমরা হাটে-বাটে ফেরি করে বেড়াও। তোমাদের বুকভরা ছল-চাতুরী আর মুখভরা বুলি। বোকা পেলেই তোমরা চোখের বাণে ধোঁকা লাগাও, দুধ বলে ঘোল গছাও। কার সাধ্যি তোমাদের সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে?'

মাথার ওপর মেঘ গর্জে উঠল। শুরু হল ঝড়। যমুনা উন্মাদিনী রণরঙ্গিণীর মতো নৃত্য করতে থাকল। সখীদের এলো খোপা খসে পড়ল। রূপ-যৌবনের বিজয় পতাকার মতো উড়তে থাকল তাঁদের আঁচল। আকুল নয়নে অকুল যমুনার দিকে তাকিয়ে বৃন্দা বলে ওঠেন—

'একান্ত যদি হে শ্যাম অবলায় হবে বাম
দিচ্ছি খুলে দুলালীর ভূষণ।'

'বটে!' কৃষ্ণ বলেন, 'গোয়ালার ছেলে বলে এতই কি বোকা পেয়েছো? একেই তো ব্রজের ঘরে ঘরে আমার চোর নাম পড়ে গেছে, তার ওপর রাধার ভূষণ নেই, আর চোরাই মাল বলে তার স্বামী, শাশুড়ী ও ননদ আমার হাতে দড়ি দিক—

আমাকে পাড়াছাড়া করুক! আমার বাপু অত ফ্যাসাদে দরকার নেই। নগদ না হলে আমি হাল ছোঁব না।'

এদিকে যমুনার ঢেউ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ভয় পেয়ে বৃন্দা আবার বলেন—

"'পার করে দাও ওহে মাঝি, নগদ নেবে তাতেই রাজি,
সোনার পুতুল বাঁধা রাখ রাই।'

কৃষ্ণ সহসা বলে ওঠেন—

'ঐ তো আমার পারের কড়ি বোস সবাই না'য়ে চড়ি,
রাইকে পেলে আর কিছু কি চাই॥'

তারপরে তিনি রাধাকে বলেন—

'রাখাল হইয়া বনে সদা ফিরি ধেনুসনে,
তুয়া লাগি বনে বনচারী
তোমার পিরীতি পাইয়া এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া,
তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী॥'

রাধা-কৃষ্ণ নৌকাতে উঠতেই যেন যাদুবলে দুর্যোগ মিলিয়ে গেল। বিক্ষুব্ধা যমুনা মুহূর্তে শান্ত হল। মেঘ-মুক্ত আকাশে চাঁদ উঠল। চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে নীল যমুনা নীলকান্তমণির মতো ঢলঢল করতে থাকল। প্রেমপূর্ণ স্বরে রাধাবিনোদ রাধারাণীকে বলেন—

'শুন রাই ব্রজেশ্বরী, শ্রীপদ সম্পদ করি,
তব প্রেমে জীর্ণতরী লয়ে যাব পার।
তব প্রেম বিনাপণে বিলাই জগৎজনে—
মহাজন, মূলধন তুমি সে আমার॥

*   *   *

আছ্যাশক্তি মহামায়া তুমি কায়া আমি ছায়া,
তুমি গেহ, তুমি দেহ, তুমি সে জীবন।
যখন যেখানে বাস জেনো তব ক্রীতদাস,
রেখ' পায় কৃপাকণা করি বিতরণ॥'

বৌদি ও জানকীর পাহারায় জামা-কাপড় রেখে সেনবাবু ও বোসবাবুর সঙ্গে নেমে আসি কালিন্দীর জলে। আমরা স্নান করে উঠলে ওরা স্নান করবে। ঘাটের গাছে-গাছে বানরদের মেলা বসেছে। জামা-কাপড় অরক্ষিত রাখা ঠিক নয়।

কয়েকজন পুণ্যার্থী জলধারার ওপারে বালির চড়ায় বসে মস্তক মুণ্ডন করছেন। কেউ বা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করছেন। এখানে পিণ্ডদান গয়াতে পিণ্ডদানের সমতুল।

নেমে আসি জলে—যমুনার জলে। এই সেই যমুনা—যমুনোত্রীর যমুনা, যে গিরিতীর্থ হতে শুরু হয়েছে আমার সাহিত্য পথ-পরিক্রমা।* এই সেই কুরুক্ষেত্র ও ইন্দ্রপ্রস্থের যমুনা। তিন হাজার বছর ধরে ভারতের রাজধানীর পাশ দিয়ে প্রবহমানা যমুনা। মীরাট, মথুরা ও বৃন্দাবনের যমুনা। আগ্রা ও প্রয়াগের যমুনা।

সিন্ধু ও গঙ্গার মতই বৈদিক যুগের নদী যমুনা। চীনদেশে যমুনার নাম 'ইয়েন-মউ-না'। বৌদ্ধদের পাঁচটি প্রধান নদীর একটি যমুনা। ভারতের বৃহত্তম নদীসমূহের অন্যতমা। নানা নামে অভিহিতা সে। টলেমি নাম দিয়েছেন 'ডায়া মউনা'। প্লিনী বলেছেন 'যোমানিস' আর আরিয়ান 'যোবারিস'।*

বান্দরপুঁছ পর্বতশ্রেণীর চম্পাসর হিমবাহ থেকে সৃষ্ট হয়েছে যমুনা। তারপরে সে এসেছে যমুনোত্রী, উৎস থেকে পাঁচ মাইল।

হিমাচল ও উত্তর-প্রদেশের মাঝে সীমারেখা টেনে সে প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে—প্রবেশ করেছে শিবালিক পর্বতশ্রেণীতে। মিলিত হয়েছে অসংখ্য পাহাড়ী নদীর সঙ্গে। হিমালয়ে যমুনার উপত্যকাভূমির আয়তন ৪,৫০০ বর্গ মাইল।

হিমালয়ের ভেতর দিয়ে পঁচানব্বই মাইল প্রবাহিত হয়ে যমুনা খাড়া নামক স্থানে সমতলে নেমে এসেছে। ফৈজাবাদের কাছে এসে পরিণত হয়েছে এক সুবিশাল নদীতে।

দিল্লী থেকে যমুনা এসেছে মথুরা ও বৃন্দাবনে—শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ও লীলাভূমিতে। এখান থেকে চলে গিয়েছে আগ্রা–শাজাহানের মর্মর-স্বপ্নকে বক্ষে ধারণ করেছে। তাবপরে গিয়েছে কালপি—কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্মভূমিতে। একে একে বনগঙ্গা, চম্বল ও বেতয়া প্রভৃতি নদী এসে মিশেছে তার সঙ্গে। অবশেষে যমুনা পৌঁছেছে পূর্ণকুম্ভের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগে। পূর্ণ করেছে তার আটশো ষাট মাইল দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা—নীল-যমুনা বিলীন হয়েছে গৈরিক-গঙ্গায়।

বান্দরপুঁছ পর্বতের আর এক নাম কালিন্দ পর্বত। তাই যমুনার অপর নাম কালিন্দ-কন্যা কালিন্দী। আর তাই বোধহয় যমরাজ-ভগিনী কৃষ্ণপ্রিয়া যমুনা নীল।

যমুনা গঙ্গার মতই পুণ্যসলিলা। যমুনার জলে দাঁড়িয়ে কেশব, শিব ও সূর্যের উপাসনা করলে জীবন ধন্য হয়। যে কোনদিন যে কোনসময়ে স্নান করলেই পুণ্যলাভ। কিন্তু কার্তিক মাসে মথুরা-বৃন্দাবনের যমুনায় অবগাহন করলে নাকি অক্ষয় পুণ্যলাভ।

সেই পুণ্য লাভ করে সহযাত্রীরা সবাই উঠে এলেন তীরে। খানিকক্ষণ বাদে আবার যাত্রা হল শুরু। না, যাত্রা নয়, পরিক্রমা। আমরা পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা করছি। খোল-করতাল বেজে উঠল, আরম্ভ হল কীর্তন। আমরা এগিয়ে চললাম বৃন্দাবনের পথে।

কিছুদূর হেঁটে ধীরসমীর ঘাট। তারপরে টিকারী ও জগন্নাথের মন্দির। লছমন-ঝুলার টিকারী মন্দিরের কথা মনে পড়ছে আমার।

টিকারীর রাজারা সত্যিই ধার্মিক। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন তীর্থে মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন।

বাঁধানো পথের পাশে নর্দমা। একটা মোষ পড়ে গেছে সেই সঙ্কীর্ণ নর্দমায়। পাশের দেওয়ালে আটকে গেছে তার বিরাট বপু। মোষের মালিক দেওয়াল ভাঙছে। কার দেওয়াল কে জানে?

সবই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি। মোষ যাঁর, দেওয়ালও তাঁর। কিন্তু যখন দেওয়াল ভাঙা শেষ হবে, তখন মোষটা জীবিত থাকবে কি? সে যে ইতিমধ্যেই ধুঁকতে শুরু করেছে!

কৃষ্ণের জীবের কষ্ট দেখেই বোধকরি কৃষ্ণভক্ত জনৈকা বৃদ্ধা-সহযাত্রী নর্দমায় পড়ে গেলেন। আর যেহেতু তাঁর বপুদেশ মোষের মতো বিরাট নয়, তিনি একেবারে গভীর নর্দমার তলদেশে গিয়ে স্থির হলেন।

অনেক কষ্টে তাঁকে টেনে তোলা গেল। কিন্তু বৃদ্ধাকে আবার যমুনায় গিয়ে স্নান করে আসতে হল। জানি না এই বাড়তি পুণ্যার্জনের জন্য সহযাত্রীদের কেউ মনে মনে ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন কিনা!

আমরা যমুনার তীর দিয়েই পথ চলছি। কিছুক্ষণ চলার পরে ছাড়িয়ে এলাম রাধাবাগ। পৌঁছলাম পাণিঘাটে। কেলি-কদম্ব গাছে ছাওয়া পাণিঘাট। আশেপাশে অনেক বাড়ি-ঘর আছে।

এখন আমরা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পেছনে এসেছি। এখান থেকে সোজা পথে আমাদের আশ্রম মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। কিন্তু সে পথে গেলে পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা পূর্ণ হবে না। তাই যমুনার তীর দিয়েই আমরা চললাম এগিয়ে।

আজ সেবকরা সুবিধে করতে পারছেন না। সেই পাঞ্জাবি মহিলা কিছুতেই কথা বলছেন না। তাঁর মন-মেজাজ ভাল নেই। লটারীর টিকেটটা পাওয়া গেছে। কেউ নেয় নি, তাঁর নিজের আঁচলেই বাঁধা ছিল। কিন্তু এর থেকে যে না পাওয়াই ছিল ভাল! তাঁর টিকেটের নম্বর আর প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত টিকেটের নম্বর

এক নয়। এমন কি, সান্ত্বনা-পুরস্কার পাওয়া টিকেটগুলোর নম্বরের সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর টিকেটের কোন মিল নেই—'হে কৃষ্ণভগবান, এ তুমি কি করলে? এত 'তক্‌লিফ' করে ব্রজ-পরিক্রমায় এলাম, আর তুমি কিনা একটু 'রহম' করে আমাকে একটি পুরস্কারও পাইয়ে দিলে না! শুনেছিলাম তুমি ভক্তের ভগবান, কিন্তু এখন দেখছি, তুমি বড়ই নিষ্ঠুর···'

তাই তিনি আজ আব সেবকদের নির্দেশে পথের পাশের বাড়ি-ঘরকে দণ্ডবৎ করছেন না। অর্থাৎ আজ তাঁর একেবারেই পরিক্রমার 'মুড' নেই।

সহসা দিদিমাব কণ্ঠস্বর কানে আসে। তিনি জনৈকা সহযাত্রীকে বলছেন, "আহা, দ্যাহো দ্যাহো, যমুনার কি অপরূপ শোভা!"

যমুনাব দিকে তাকিয়ে কিন্তু নিরাশ হতে হয় আমাকে। কোথায় অপরূপা যমুনা! যতদূর দেখা যাচ্ছে, কেবল বালি আর বালি। এ তো নদী নয়, যেন মরুভূমি। তারই ভেতরে অতিশয় ক্ষীণ একটি জলরেখা। ঐ ক্ষীণকায়া যমুনাকেই অপরূপা বলে মনে হচ্ছে দিদিমার। কেনই বা হবে না? তিনি তো যমুনার দৃশ্য দেখে মোহিত হন নি, তিনি যে মন-যমুনার সৌন্দর্যে বিমোহিতা।

তবে পথের দৃশ্যটি আমারও ভাল লাগছে। পথের দু'পাশে সারি সারি গাছ। ডানপাশে বাড়ি-ঘব ও মন্দির। আব বাঁ পাশে যমুনা—রাধা-কৃষ্ণের ব্রজলীলার সাক্ষী যমুনা।

আমরা শ্যামকুঠি ছাড়িয়ে এলাম। পথের পাশে গাছে গাছে মাঝে মাঝে ময়ুর-ময়ূবী দেখতে পাচ্ছি। বড় ভাল লাগছে পথ চলতে।

একটি ঝুপড়ির সামনে এসে থামলেন বৃন্দাবন মহারাজ। থামতে হল আমাদেরও। একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন ঝুপড়ির ভেতর থেকে। মহারাজকে দণ্ডবৎ করলেন তিনি। মহারাজ তাঁকে একটি টাকা দিয়ে বললেন, "এই নিয়ে তোমাকে আমার সাতটাকা দেয়া হল।"

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন। মহারাজ আমাদের বলেন, "কয়েকদিন আগে ডাকাতরা এই বৃদ্ধার সব কিছু নিয়ে গেছে। পারলে আপনারাও কিছু সাহায্য করুন একে।"

আরও কিছুদূর হেঁটে আমরা জগন্নাথঘাটে এলাম। না, কলকাতার জগন্নাথঘাটের মতো এখানে কোন জেটী নেই। আছে একটি ছোট মন্দির—বাঙালী মন্দির। মহাপ্রভু অক্রূরঘাটে যাবার পথে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমরা কৃষ্ণ-বলরামের মন্দিরে পৌঁছলাম। এখন মন্দির বন্ধ। কাজেই দর্শন হল না। শুনলাম, গোচারণের সময় বলরাম নাকি এখানে বসে শ্রীকৃষ্ণকে খাওয়াতেন।

কয়েক পা এগিয়েই হনুমান-মন্দির। তার মানে, মহাভারতের যুগ থেকে রামায়ণের যুগে পেছিয়ে এলাম আমরা। হনুমান মূর্তিটি কিন্তু দেখবার মতো। সৌন্দর্যের জন্য নয়, বিশালত্বের জন্য। ছাব্বিশ হাত উঁচু মূর্তি—পঞ্চমুখী হনুমান।

এবারে ডানদিকের ইট-বাঁধানো পথ ধরতে হল। এতক্ষণ যে পথ দিয়ে এসেছি তা চলে গেছে পশ্চিমে। আমরা চলছি উত্তরে। পশ্চিমের পথটি যমুনার তীর দিয়ে চলে গেছে মথুরায়। মনে হয় ঐ পথ দিয়েই কৃষ্ণ বলরাম অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় গিয়েছিলেন এবং ঐ পথেই মহাপ্রভু এসেছিলেন বৃন্দাবনে। রাধা-কৃষ্ণের পদধূলিধন্য সেই পুণ্য সরণিকে প্রণাম জানাই।

আগামী নবমীতে বৃন্দাবনবাসীরা ঐ পথে যাবেন মথুরা-পরিক্রমা করতে। আর একাদশীতে মথুরাবাসীরা ঐ পথ দিয়ে বৃন্দাবন-পরিক্রমা করতে আসবেন। হাজার হাজার পুণ্যার্থী প্রতি বছর এই যুগল-পরিক্রমায় অংশ নেন। শেষরাত থেকে বিকেল পর্যন্ত পরিক্রমা চলে। বহুকাল ধরেই চলে আসছে এই পুণ্য-পরিক্রমা।

কিন্তু সে পথ আমাদের পথ নয়। আমরা মথুরার যাত্রী নই, আমরা আজ বৃন্দাবন-পরিক্রমা করছি। আমি তাই এগিয়ে চলি আমাদের পথে—মন-বৃন্দাবনের পথে।

একটু এগিয়েই পথের ধারে দাউজী মন্দির। দাউজী মানে দাদা, অর্থাৎ বলরামের মন্দির। ছোট একটি ইটের মন্দির। শ্রীকৃষ্ণ নাকি এখানে বসে পুরাণ পাঠ করেছিলেন।

সহযাত্রীরা অনেকেই সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করলেন। ওঁদের বোধহয় খেয়াল নেই যে, অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের অন্তত দেড় হাজার বছর পবে।

দাউজী মন্দিরের উঠানে একটি হাতি বাঁধা রয়েছে। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াই হ.তিটির কাছে। অনেকেই তাকে পয়সা ও খাবার দিচ্ছেন। খাবাব সে নিজেই খেয়ে নিচ্ছে, কিন্তু পয়সা দিয়ে দিচ্ছে তার মাহুতকে, ঠিক চিড়িয়াখানার হাতিদের মতো।

একটু এগিয়েই পৌছলাম কালকের সেই পাথরকুচি বিছানো পথে। অক্রূবঘাটকে বাঁদিকে রেখে এগিয়ে চললাম সামনে।

মথুরা রোড দেখা যাচ্ছে। ওখানে পৌছলেই আমাদের পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা শেষ হবে। প্রায় চারঘণ্টা পদ-চারণার পরে পূর্ণ হল এই মন-বৃন্দাবন পরিক্রমা।

॥ পনেরো ॥

গুরুমহারাজের অনুমতি নিয়ে শোভাযাত্রা ছেড়ে গলি-পথ ধরি—এগিয়ে চলি মানসীর বাসার দিকে।

সেকি! মানসী দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? খুকুকে কোথাও পাঠিয়ে বোধহয় তারই পথ চেয়ে রয়েছে। সে-ও দেখতে পায় আমাকে। একটু মুচকি হাসে। আমি কাছে এগিয়ে আসি।

মানসী বলে, "মনে রেখেছো তাহলে?"

"ভুলে যাব, এমন কথা তোমার মনে হল কি করে?"

"তোমাকে জানি বলে। যা ভুলো মন তোমার। তাই তো কীর্তনের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি পথে এসে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, না এলে ছুটে গিয়ে ধরে নিয়ে আসব। যাক্ গে, ভেতরে চলো।"

তার পেছনে পেছনে চলি আর ভাবি—তাহলে আমারই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মানসী! মনে মনে খুশি হয়ে উঠি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে--মানসী তো আগে এমন ছিল না। সেদিন যাকে সে পাঠানকোট স্টেশনে ঠিকানা দেয় নি, ঠিকানা জেনেও যার সঙ্গে দু'বছর যোগাযোগ রাখে নি, তাকে আকস্মিকভাবে কাছে পেয়ে আজ তার জন্যে সে এমন উতলা হচ্ছে কেন?

ঘরে ঢুকে মানসী বলে ওঠে, "না রে খুকু, শেষপর্যন্ত সত্যিই এসেছে।"

"আমি তো জানতাম আসবেন। তুমি অযথা চিন্তা করছিলে।" খুকু হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

সহাস্যে খুকুকে জিজ্ঞেস করি, "খুব চিন্তা করছিল বুঝি?"

"আর বলবেন না। গোবিন্দ-মন্দির থেকে ফিরে এসে কেবলই এক কথা, এখনও আসছে না কেন রে? কতবার বলেছি, পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করে আসবেন, এখনও সময় হয় নি। কিন্তু কে কার

কথা শোনে? এতক্ষণ তবু যা হোক্ রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তার পর থেকে তো কেবলই ঘর-বার করছে।"

খুকু বোধহয় আরও কিছু বলত, কিন্তু মাঝখান থেকে মানসী বলে উঠল, "তুই এখন থাম্ তো! আর কি কথাই না বলতে পারে এ মেয়েটা, বাপরে বাপ! একটা কিছু পেলেই হল।······বক্‌বক্ না করে একবার রান্নাঘরে যা। কাল বাজার থেকে পাতিলেবু এনেছি, একগ্লাশ সরবৎ তৈরি করে নিয়ে আয়। মানুষটা রোদে পুড়ে এসেছে, সে খেয়াল আছে?"

খুকু জিভে কামড় দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মানসী আমাকে বলে, "বোসো।"

এগিয়ে এসে তার বিছানায় বসি। চরণ দু'খানি ব্রজরজঃরঞ্জিত, তাই পা ঝুলিয়ে বসতে হয়।

মানসী বলে, "সরবৎ খেয়ে কুয়োতলায় যাও। হাত-মুখ ধুয়ে এসে প্রসাদ নাও। তোমার নামে পুজো, তুমি প্রসাদ না নিলে খুকুকেও দিতে পারছি না। মেয়েটা সকাল থেকে না খেয়ে রয়েছে।"

"কেন!" বিস্মিত হই আমি।

"ঐ ওর এক আশ্চর্য দোষ। আমি না খেলে কিছুতেই খাবে না।"

"তা, তুমি খাও নি কেন?" গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করি।

"বারে, আমি খাব কি করে! আজ পুজো দিলাম না?"

"তার মানে, আমার জন্য এত বেলা অবধি তোমরা দু'জনেই না খেয়ে রয়েছো?"

মানসী আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় না। সে নিঃশব্দে থালায় প্রসাদ সাজাতে থাকে।

বলি, "এর কোন দরকার ছিল না।"

"কিসের?"

"আমার জন্য এই কষ্ট করার।"

"তোমার জন্য করেছি, কে বললে তোমাকে?"

"তাহলে কার মঙ্গল-কামনায় উপোস করে আছো?"

"আমার।" মানসী আমার দিকে তাকায়।

আমি আর কোন প্রশ্ন করতে পারি না। শুধু মুগ্ধ-নয়নে তাকিয়ে থাকি ওর দিকে।

খুকু ঘরে আসে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিই। খুকুর হাত থেকে গ্লাশটা নিয়ে এক চুমুকে সমস্ত সরবৎটুকু নিঃশেষ করি। সত্যিই খুব পিপাসা পেয়েছিল, মানসী অন্তর্যামী।

খাট থেকে নেমে পড়ি। গ্লাশটা ফিরিয়ে দিয়ে খুকুকে বলি, "চলো, কুয়োতলা থেকে ঘুরে আসি। তারপরে প্রসাদ নেওয়া যাক। বড্ড খিদে পেয়েছে।"

মানসী মুচকি হাসে। খুকুর সঙ্গে আমি বেরিয়ে আসি বাইরে।

প্রসাদের পাট চুকে যাবার পরে মানসী বলে, "এবারে একটু জিরিয়ে নিয়ে স্নান করে এসো।"

"স্নান তো করে এগেছি।"

"কোথায়? রাস্তার কলে?"

"এ খবরটাও যোগাড় করা হয়েছে?"

"কেবল এটা নয়, সেই সঙ্গে আরও অনেক। কিন্তু খবর পেয়েও যে চুপ করে থাকতে হল। তুমি তো আর এখানে এসে থাকলে না!" একবার থামে সে। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠে, "যাক্ গে, আর সময় নষ্ট না করে এবার যাও দেখি! স্নান না করো, ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে কাপড় ছেড়ে এসো। আমি বালতিতে জল তুলে রেখে এসেছি।"

"কোন দরকার ছিল না, আমি নিজেই তুলে নিতে পারতাম।"

"না, পারতে না।" মানসী আমাকে বলে, "এ তোমার বাঙালদেশের কুয়ো নয়, এখানে জল বহু নিচে। তোমার অভ্যেস নেই। আমি বৃন্দাবনের মানুষ, আমার পক্ষে কাজটা সহজ। কিন্তু আর বক্‌বক্ না করে এবারে জামা ছেড়ে খুকুর সঙ্গে যাও।"

তারপরে সে খুকুকে বলে, "খুকু, আমার গামছাটা ওকে দে।"

"বললছো, যাচ্ছি। কিন্তু কাপড় ছেড়ে এসে পরব কি?"

"গামছা।" উত্তর দিয়েই হেসে ফেলে সে। খুকুও তার সঙ্গে যোগ দেয়। তারপরে হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে মানসী বলে, "নাঃ, তোমার সঙ্গে আর বক্‌বক্ করে পারি না বাপু। তুমি খুকুর সঙ্গে যাও। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

অগত্যা বাক্যব্যয় না করে খুকুর অনুগমন করি। কুয়োতলায় এসে দেখি একখানা পরিষ্কার ধুতি ঝুলছে। খুকু সেখানা দেখিয়ে বলে, "কাপড় ছেড়ে এই ধুতি পরবেন।"

"পরব তো বুঝলাম, কিন্তু এ ধুতিটা আবার কার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এলে?"

"চেয়ে আনব কেন? আমাদের কাপড়। মামারা মাঝে মাঝে এখানে আসেন বলে, মাসি এক সেট জামা-কাপড় করিয়ে রেখেছে।

মামারা মানে, মানসীব দাদারা। খুকু মানসীকে মাসি বলে ডাকে। হয়তো সে নিজেই তাকে ডাকতে বলেছে। সংসারে মায়ের পরেই যে মাসির স্থান।

কুয়োতলা থেকে ফিরে আসি ঘরে। মানসী খুকুকে বলে, "ওর জামা আর গেঞ্জিটাও নিয়ে যা তো, ধুতির সঙ্গে ভাল করে সাবান দিয়ে কেচে দে।"

আঁতকে উঠি আমি। বলি, "তাহলে বিকেলে দর্শন করতে যাব কেমন করে? তার মধ্যে তো শুকোবে না!"

"সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। এগুলো কেমন নোংরা হয়েছে, তাকিয়ে দেখেছো একবার?" তাবপর সে খুকুকে বলে, "দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা বললাম, তাই করগে। আমি ততক্ষণে ওকে খাবার দিই। ওর খাওয়া হলে আমরা খেতে বসব।"

খুকু চলে যাবার পরে বলি, "তোমার এখানে থাকলে যে খুবই আরামে থাকতাম, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু সেটা কি ভাল দেখাতো।"

"ওমা! খারাপ দেখাবে কেন?" মানসী যেন বিস্মিত।

আমি বলি, "অন্তের কথা থাক্। অন্তত খুকু কি মনে করত!"

"কি আবার মনে করবে?" একবার থামে সে। তারপরে বলে, "খুকু সব জানে।"

"কি জানে?"

মানসী আমার দিকে তাকায়। আমার চোখে চোখ রেখে অকম্পিত স্বরে উত্তর দেয়, "আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

বড় রাস্তায় এসে দু'জনে রিক্শায় উঠি। মানসী জিজ্ঞেস করে, "প্রথমে কোথায় যাবে?"

"তুমি যেখানে নিয়ে যাবে!" উত্তর দিই।

"অতটা আত্মসমর্পণ করা কি উচিত হবে?"

"কোন ক্ষতি হতে পারে কি?"

"হতেও তো পারে।"

"সব ক্ষতিতেই তো ক্ষতি হয় না মানসী!" আমি বলি, "তবে রিক্শাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে রেখো না। তাকে যাহোক্ একটা কিছু বলো।"

মানসীর খেয়াল হয়। সে তাড়াতাড়ি রিক্শাওয়ালাকে বলে, "শাহ্ বিহারীজীর মন্দিরে চলো।"

কিছুক্ষণের মধ্যে শাহ বিহারী মন্দির-তোরণের সামনে পৌঁছই। রিক্শা দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়। আমরা ভেতরে ঢুকি। তোরণের একপাশে পাথরের জিনিসপত্রের দোকান। আগের দিন হলে মানসী হয়তো দোকানে গিয়ে দর-দস্তুর শুরু করে দিত। কিন্তু আজ সে তাকিয়েও দেখে না। বরং আমাকে বলে, "তাড়াতাড়ি ভেতরে চলো। এখান থেকে যেতে হবে লালাবাবুর মন্দিরে। সেখান থেকে রঙ্গজীর মন্দির ও বাগানবাড়ি। সময় কম, দেরি করলে অনেক রাত হয়ে যাবে।"

"একবার রঙ্গনাথজীর বাগানবাড়িতে যাবার কথা আমিও

ভেবেছিলাম। কিন্তু এই অবেলায় আবার সেখানে কেন?" আমি চলতে চলতে বলি।

"দরকার আছে।" মানসী গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দেয়। "একটু আগেই কিন্তু কথা দিয়েছো, আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানেই যাবে তুমি!"

আর কোন প্রশ্ন না করে এগিয়ে চলি। মানসী আমার পাশে পাশে চলেছে। তোরণ পেরিয়ে পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। শ্বেত-পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো সুন্দর বাগান। মাঝখানে চমৎকার একটি কৃত্রিম ফোয়ারা ও ছোট জলাশয়।

মনোহর পরিবেশে মনোমুগ্ধকর মন্দির। যেমন শিল্পকর্ম, তেমনি গঠন-নৈপুণ্য। লখনউ-য়ের ধনী শাহ কুন্দনলাল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছেন এই মন্দির।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা উঠে আসি মন্দিরে। শ্বেত-পাথরের মেঝে ও স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভ এক-একখানি পাথরে নির্মিত। অপূর্ব শিল্প-সমন্বিত কয়েকটি মর্মরমূর্তি রয়েছে মন্দিরের বারান্দায়। দেওয়ালে চমৎকার খোদাই কাজ— তাজমহলের কাজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

আমরা মন্দিরের ভেতরে আসি। ধূপের স্নিগ্ধ সুবাসে আমোদিত মন্দির—সুদক্ষ শিল্পীর ছোঁয়া সর্বাঙ্গে। বিশাল বিশাল কয়েকটি ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে নাট-মন্দিরে।

গর্ভ-মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর জীবন্ত বিগ্রহ। মানসী ভক্তিভরে প্রণাম করে। আমিও মাথা নত করি। সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণতি জানাই প্রেমের মূর্ত-প্রতীক রাধাবিহারীকে।

পথে শ্রীলীলানন্দ ঠাকুর বা পাগলবাবার আশ্রম দর্শন করে আমরা লালাবাবুর মন্দিরে চলছি। পাগলবাবার আশ্রম বর্তমান বৃন্দাবনের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাঙালী আশ্রম। গতবারে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু আজ তাঁকে দর্শন করতে পারলাম না। শুনলাম, তিনি অক্রুরঘাটে গিয়েছেন। সেখানে

নাকি অনেক জমি নিয়েছেন। জমিদারীর জন্য নয়, অন্য কোন কারণে।

কারণটা তিনি খুলে বলেন নি কাউকে। শুধু সেবারে আমাদের, মানে আমাকে, কাকাবাবু (গজেন্দ্রকুমার মিত্র), সুমথকাকা, ভবানীদা ও মণীশবাবুকে বলেছিলেন, 'আমাকে এই শ্রীধাম-বৃন্দাবনে এমন একটা কিছু করে রেখে যেতে হবে, যার আকর্ষণে দেশী ও বিদেশী পর্যটকরা তাজমহল দেখে দিল্লী যাবার পথে অন্তত একবার বৃন্দাবনে আসেন।'*

লালাবাবুর মন্দিরের সামনে রিক্‌শা থেকে নেমে পড়ি আমরা। এই মন্দিরকে অনেকে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরও বলে থাকেন। লালাবাবুর ভাল নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। হয়তো ভবিষ্যৎকালের ভক্ত মানুষটির কথা বুঝতে পেরেই তাঁর দূরদর্শী পিতা-মাতা ঐ নাম রেখেছিলেন।

মন্দিরের সামনে অনেকখানি বাঁধানো জায়গা। পথটি এখানে এসে সেই বাঁধানো জায়গার পাশ দিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে।

বেশ বড় তোরণ। তোরণের পাশে মন্দিরের অফিস। তারপরে পাথর-বাঁধানো পথ। এটি গর্ভ-মন্দিরের পেছন দিক। কাজেই খানিকটা এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আমাদের নাট-মন্দিরে উঠতে হল।

খুব বড় নয়, একশো ষাট ফুট দীর্ঘ চতুর্ভুজাকৃতি মন্দির। তবে ভারী সুন্দর। মূল্যবান পাথরে নির্মিত। চমৎকার স্থাপত্যকলার নিদর্শন সর্বত্র। আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে রাধারাণী ও ললিতাসখীসহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রিমাজীউকে প্রণাম করি।

তারপরে এসে দাঁড়াই বাগানে। চমৎকার বাগান। পাশেই যাত্রী-নিবাস। কাকাবাবুর কাছে শুনেছি, এখানকার যাত্রী-নিবাসে বাস করলে দু'বেলা প্রসাদ পাওয়া যায়। এবং তেমন সুস্বাদু প্রসাদ নাকি বৃন্দাবনের আর কোন মন্দিরে হয় না।

বহু লক্ষ টাকা খরচ করে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে লালাবাবু নিজের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করেন এই মন্দির। আর তাই হয়তো এই মন্দিরের নির্মাণ-কৌশল এমন অপূর্ব শিল্প-চাতুর্যময়।

লালাবাবুর বংশধর কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ আমাকে একখানি চিঠি দিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন কোন প্রয়োজন হলে আমি যেন এই মন্দিরের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করি। এখন পর্যন্ত প্রয়োজন পড়ে নি। তবে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে রাখা ভাল। চিঠিখানিও সঙ্গেই আছে।

কিন্তু না, এখন নয়। এখন মানসী সঙ্গে রয়েছে।

লালাবাবুর মন্দির থেকে রঙ্গনাথজী বা রঙ্গজীর মন্দিরের দূরত্ব সামান্য। অনেকে একে শেঠজীর মন্দিরও বলে থাকেন। সম্ভবত এটি উত্তর-ভারতের বৃহত্তম মন্দির। জনৈক ভাইসরয় এই মন্দিরকে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন—সত্যিই তাই।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে মন্দির এলাকা। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল—দু'সারি পাঁচিল। দু'দিকে দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পকলায় সমৃদ্ধ দু'টি সুউচ্চ গোপুরম্। একটি গোবিন্দ-মন্দিরের কাছে, আর একটি রাধাবাগে। উভয়ের দূরত্ব কম করেও আধমাইল। রাধাবাগের অর্থাৎ পশ্চিমদিকের গোপুরমটি মন্দিরের প্রধান প্রবেশ-তোরণ।

দু'সারি পাঁচিলের মাঝখানে পাথর-বাঁধানো সুপ্রশস্ত পথ। দ্বিতীয় পাঁচিল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেই সেই সোনার তালগাছ। কিন্তু তালগাছের কথা পরে হবে। আগে নির্মাতাদের কথা শুনে নিই। মানসী সেকথা বলছে আমাকে। আমি মন দিয়ে শুনি।

মানসী বলে, "১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ধনী শেঠ লক্ষ্মীচাঁদের দু'ভাই শেঠ গোবিন্দদাস ও শেঠ রাধাকৃষ্ণ এই বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি শ্রীগোদরঙ্গনাথজীউ অর্থাৎ বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। তুমি তো জানো সখা, শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে রঙ্গনাথ নামে অভিহিত করে থাকেন।"

"তার মানে, এটি রামানুজ সম্প্রদায়ের মন্দির?" জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ।" মানসী বলে, "শেঠজীদের গুরুদেব স্বামী রঙ্গাচার্য এই মন্দিরের নক্সা এঁকে দিয়েছিলেন। স্বামীজী ছিলেন দক্ষিণ-দেশীয়। স্বভাবতঃই মন্দিরটি দক্ষিণ-ভারতীয় ভঙ্গী এবং স্থাপত্য-কলায় নির্মিত। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এর নির্মাণ-কার্য শুরু হয়। নির্মাণ করতে ছ'বছর সময় লেগেছে। তখনকার দিনে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। প্রথম পাঁচিলটিকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলে দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে দেড় মাইলের মতো। মন্দির এলাকা ৭৭৩ ফুট লম্বা এবং ৪৪০ ফুট চওড়া। দু'সারি পাঁচিলের মাঝখানে সামনের দিকে যে বিশাল জলাশয় রয়েছে, একটু আগে সেটি তুমি দেখেছো।"

মাথা নাড়ি আমি।

আমরা আর একটি তোরণ পেরিয়ে মন্দিরের ভেতরের অংশে আসি। সামনেই সেই সোনার তালগাছ—ষাট ফুট উঁচু ধ্বজস্তম্ভ। মাটির নিচে নাকি আরও চব্বিশ ফুট রয়েছে। সূর্যালোকে সোনার মতই চক্‌চক্ করছে। তবে সত্যি-সত্যিই সোনার নয়। না হয়ে ভালই হয়েছে। সোনা নিয়ে বহু রক্ত ঝরেছে বৃন্দাবনে।

যাক্‌গে, যে কথা ভাবছিলাম—সোনার তালগাছ, সোনার নয়। তামা গিল্‌টি করে নির্মিত হয়েছে এই ধ্বজস্তম্ভ। আর তাই করতে সেই সস্তার দিনেও দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল।

"কতক্ষণ ধরে সোনার তালগাছ দেখবে? আরও অনেক কিছু দেখার আছে যে!" মানসী তাগিদ দেয়।

আমি বলি, "হ্যাঁ। আর তার পরে যে রঙ্গনাথজীর বাগান-বাড়িতেও যেতে হবে!"

"হবেই তো।" মানসী কৃত্রিম ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে।

হেসে বলি, "রেগে যাচ্ছো কেন? আমিও তো তাই বলছি। বলো, এবারে কোথায় যেতে হবে?"

"রথ দেখতে।"

"রথ!" আমি বিস্মিত, "এ যে কার্তিক মাস!"

"তা হোক্, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

সে কিন্তু সত্যিই আমাকে সুবিশাল একটি রথের সামনে নিয়ে আসে—কাঠের রথ।

মানসী বলে, "চৈত্রমাসে ব্রাহ্মোৎসবের সময় এখানে বিরাট মেলা হয়। তখন অষ্টধাতুর শ্রীগোদরঙ্গনাথজীউর বিগ্রহকে এই রথে করে নিয়ে যাওয়া হয় রঙ্গজীর বাগানবাড়িতে। সে শোভাযাত্রা দেখতে দূব-দূরান্তর থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসেন বৃন্দাবনে। ধূপের গন্ধে পথের বাতাস বিহ্বল হয়। শোভাযাত্রার সামনে থাকে শতাধিক মশালবাহী। তার পরে ব্যাণ্ডবাদকবৃন্দ। রথের আগে আগে চলেন ভরতপুরেব বাজার রক্ষীদল। আগে তাঁরা বন্দুক কাঁধে শোভাযাত্রায় অংশ নিতেন। কিন্তু এখন আর বন্দুক নিতে দেওয়া হয় না।

"রঙ্গনাথজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বাগানবাড়িতে সভামণ্ডপ তৈরি করা হয়। সমস্ত বাগানটিকে সাজানো হয় আলো দিয়ে, আর বাজি পোড়ানো হয়। সেদিন বৃন্দাবনে বহুলোক সাবাবাত্ত জেগে থাকেন।"

রথ দেখে আমরা এসে মন্দিরে উঠি। নাট-মন্দির এবং গর্ভ-মন্দিব তেমন বড় নয়, কিন্তু খুবই সুসজ্জিত। বহু মূর্তি ও বিগ্রহ রয়েছে নাট-মন্দিরে, গর্ভ-মন্দিরে এবং বাইরের ছোট-ছোট মন্দিরে। গর্ভ-মন্দিরে গোদরঙ্গনাথজীউর বিগ্রহ। নাট-মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরে রয়েছে বেঙ্কটেশজীউ, রামচন্দ্রজীউ, হনুমানজীউ, শেষশায়ী নারায়ণ, বদ্রীনারায়ণ এবং রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্যবৃন্দের মূর্তি।

ভাল করে সব দেখতে হলে অনেক সময়ের দরকার। আমাদের সে সময় নেই, বেলা পড়ে এসেছে। আমাদের যেতে হবে রঙ্গজীর বাগানবাড়িতে। তাই মোটামুটি দর্শন করে বেরিয়ে আসি বাইরে। রিক্‌শায় উঠে বসি। এগিয়ে চলি মন-বৃন্দাবনের পথে।

বাগানবাড়ির তোরণে রিক্‌শা থামে। আমরা নেমে পড়ি সেদিন শাস্ত্রীজীর বাড়িতে যাবার সময় ভাবছিলাম এখানে

আসার কথা। কিন্তু কখনও ভাবি নি, মানসীর সঙ্গে আমাকে আসতে হবে এখানে—বৃন্দাবনের এই রমণীয় উদ্যানে।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে তিন বছর আগে এখানেই বসেছিল নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন। সুসাহিত্যিক শ্রীসুমথনাথ ঘোষ ছিলেন বাংলা সাহিত্য-শাখার সভাপতি। সেদিনের শত স্মৃতি আজ শতরূপে মানস-পটে ভেসে উঠছে।

মানসী বলে, "এখানে একটু বসব। কাজেই রিক্‌শা ছেড়ে দিচ্ছি, কি বলো?"

"আমি তো তখুনি বলেছি মানসী, আজ তুমি যা বলবে, তাই হবে!"

"যাক্, তাহলে কথাটা মনে আছে দেখছি!" মানসী মন্তব্য করে।

"থাকবে না কেন? ভদ্রলোকের এক কথা।" হেসে বলি।

"ও! তাও তো বটে!" মানসী গম্ভীর। সে রিক্‌শার ভাড়া মিটিয়ে দেয়।

আমরা তোরণে প্রবেশ করি। বৃদ্ধ দারোয়ান আমাদের অভ্যর্থনা করে, "জয় রাধে!"

"জয় রাধে!" প্রতি-নমস্কার করি। বিস্মিত হই। সাহিত্য সম্মেলনের সময় হয়তো এই দারোয়ানই এখানে ছিল, কিন্তু তার তো আমাকে মনে রাখবার কথা নয়!

না, আমাকে নয়, মানসীকেই নমস্কার করেছে সে। আর তাই মানসী আমাকে দেখিয়ে তাকে বলছে, "আমার আপনজন। কলকাতা থেকে এসেছেন। তোমার বাগান দেখাতে নিয়ে এলাম।"

"খুব ভাল করেছেন, দিদিমণি!" দারোয়ান আবার নমস্কার করে।

মানসীর সঙ্গে রঙ্গনাথজীর উদ্যানবাটিতে প্রবেশ করি। রথের সময় গোদরঙ্গনাথজীউকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হয়

এখানে। পুরীতে যেমন মাসির বাড়ি, বৃন্দাবনে তেমনি এই বাগানবাড়ি।

তোরণ থেকে পাথরকুচির পথ প্রসারিত হয়েছে উদ্যানের অপর প্রান্ত পর্যন্ত। দু'পাশে মেহেদী গাছের সারি। মাঝে মাঝে দু'একটি করে পাম গাছ। পথের দু'দিকেই বাগান—ফুল ও ফলের বাগান। জবা জাতি আর কৃষ্ণচূড়া, লেবু আম আর নিম—আরও কত ফুল, কত ফল। এক জোড়া ময়ূর-ময়ূরী কৃষ্ণচূড়া গাছটায় বসে আছে। তারা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ওরা কি আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে?

ওরা নীরবে বসে আছে। আমরাও নীরবে এগিয়ে চলেছি।

কিন্তু এমন নীরবতা ভাল নয়। এতে দুর্বলতা বেড়ে যায়। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি, "আপনজন শব্দের আসল অর্থটা কি?"

"প্রিয়জন।" মানসী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়। সে মুখ তোলে, কিন্তু চলা থামায় না। শুধু একবার আমার দিকে তাকায়। তারপরে আবার বলে, "ওকে কেমন করে বলি যে, তুমি আমার পরম-প্রিয়জন?"

"সত্যি?" একটু হেসে জিজ্ঞেস করি।

মানসী গম্ভীরস্বরে পাল্টা-প্রশ্ন করে, "এখনও কি তা তুমি বুঝতে পারো নি সখা!"

আমি কোন উত্তর দিই না। শুধু তার একখানি হাত আমার হাতে তুলে নিই। মানসী কোন কথা বলে না। আমরা হাত ধরা-ধরি করে নীরবে পথ চলি—মধু-বৃন্দাবনের পথ।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে প্রশ্ন করি, "দারোয়ান বুঝি চেনে তোমাকে?"

"হ্যাঁ।" মানসী অকম্পিত স্বরে উত্তর দেয়, "আমি যে সময় পেলেই চলে আসি এখানে। চুপচাপ বসে থাকি কোন এক কেলিকদম্ব কিংবা তমালতলে। বসে বসে ভাবি। কার কথা জানো?"

আমি ওর দিকে তাকাই। মানসীর চোখে চোখ পড়ে আমার। সে শান্তস্বরে জবাব দেয়, "হ্যাঁ, সখা! আমি এখানে বসে বসে তোমার কথাই ভাবি।"

"কেন?"

"এখানেই যে আমি তোমাকে···আমার প্রিয় লেখককে প্রথম দেখেছিলাম।"

মাথা নেড়ে বলি, "হ্যাঁ, মানালীতে বসে সেকথা তুমি বলেছো আমাকে। সাহিত্য সম্মেলনের সময় তুমি নাকি বৃন্দাবনে ছিলে।"

"তখন তুমি চিনতে না আমাকে, আর আমিও······" মানসী থামে।

আমি আবার তার দিকে তাকাই।

সে চোখ নামিয়ে নেয়। তারপরে বলে, "আমিও তখন ভালোবাসতাম না তোমাকে। তবু আমার কাছে এর চেয়ে প্রিয়তর স্থান নেই বৃন্দাবনে। আর তাই আজ এই গোধূলি-বেলায় তোমাকে আমি নিয়ে এলাম এখানে।"

কি বলব আমি? শুধু তার হাত ধরে এগিয়ে চলি। একটু বাদে মানসী সহসা হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে, "চলো, ওখানে গিয়ে বসা যাক্।"

একটি তমাল গাছের নিচে এসে বসি আমরা। খানিকটা দূরে আর এক জোড়া ময়ূর-ময়ূরী। মাঝে মাঝে ময়ূর পেখম মেলে ময়ূরীর চারিপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছে—প্রেম নিবেদন করছে। আমার মতো মানসীও অপলক নয়নে তাকিয়ে আছে সেদিকে। গোধূলির ম্লান আলোটুকু যাচ্ছে মিলিয়ে। সন্ধ্যা নেমে আসছে এখানে—এই মন-বৃন্দাবনে।

মানসী বসে আছে চুপ করে। কি ভাবছে কে জানে। হয়তো ভাবছে নিজের জীবনের কথা। ধনীকন্যা মানসী শৈশবে হারিয়েছে মাকে। স্নেহপরায়ণ পিতা পরম স্নেহে মানুষ করেছিলেন তাকে। লেখাপড়ায় ভালই ছিল। তার ছোড়দার দরিদ্র

সহপাঠী ও মেধাবী বিমলেন্দুকে ভালোবেসেছিল সে। বাবা বিমলেন্দুকে কোনদিনই সুনজরে দেখেন নি, তবু তিনি মানসীকে বাধা দেন নি। শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—'তুই কি সব ভাল করে ভেবে দেখেছিস মা?' মানসী মাথা নেড়েছিল। মহা ধুমধাম করে বাবা মানসীর বিয়ে দিয়েছিলেন। বিমলেন্দু তখন 'ল' কলেজের ছাত্র, আর মানসী ফিফ্‌থ ইয়ারে। মানসীর বাবার টাকায় বিমলেন্দু ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত চলে গেল। ফিরে এলো তার শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীকে নিয়ে। মানসীর বিবাহিত জীবনে যতি পড়ল।

শান্তির আশায় মানসী ছুটে গেল হিমালয়ে। হিমালয়কে ভাল লাগল তার, ভাল লাগল আমার লেখা। একদিন মানালীর পথে আকস্মিকভাবে তার সঙ্গে আমার দেখা। সে আমাকে ভালোবাসল। কিন্তু নিজেই সব কিছুর ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে একদিন জোর করে বিদায় নিল।

আর আজ……

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, তাই চারিদিকে আঁধার। ময়ূর-ময়ূরী বোধহয় আর নেই ওখানে। চলে গেছে রাতের আশ্রয়ে। আমরা শুধু বসে আছি এই আঁধার-ছাওয়া কাননে। আমরা কি নিরাশ্রয়?

আমি হাত বাড়িয়ে মানসীর একখানি হাত ধরতে চাই। সে আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে।

শান্তস্বরে বলি, "তুমি কেন এ জীবন বেছে নিলে মানসী?"

"তোমার জন্য।"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে কিছুই জানাও নি? আমাদের তো আর দেখা না-ও হতে পারত?"

"আমি জানতাম, তুমি সব জানতে পারবে। কৃষ্ণের কৃপায় আমাদের দেখা হবেই।" মানসী আমার কোলে মুখ লুকায়। আমি নীরবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকি।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে বলি, "তাহলে হিমালয়ে না গিয়ে বৃন্দাবনে এলে কেন?"

"তুমি যে আমার বৃন্দাবনচন্দ্র। বৃন্দাবনেই তোমাকে আমি প্রথম দেখেছি সখা। এতদিন বাদে আজ সেই দেখা সার্থক হল আমার জীবনে।"

"আমিও ধন্য হলাম মানসী।" আমি তার দিকে ঝুঁকে পড়ি। অনুমানে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ধীরকণ্ঠে বলি, "তোমার রাসবিহারীর কাছে কামনা করো, মধু-বৃন্দাবনের এই মিলন যেন মধুময় হয়।"

মানসী মাথা নাড়ে।

কেটে যায় আরও কিছুক্ষণ। একসময়ে মানসী মুখ তোলে, "চলো, এবারে যাওয়া যাক্। অনেক রাত হল। তোমাকে যে কাল সকলেই মথুরা রওনা হতে হবে।"

বাস্তবের রূঢ় আঘাতে আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। হয়তো বা মানসীর মনেরও একই অবস্থা। তবু সে আমাকে মনে করিয়ে দিল, এবারে আমাদের বিদায় নেবার পালা।

"তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে মানসী? তাহলে থাক্, কাল বরং আমি আর যাব না ওঁদের সঙ্গে। সকালে চলে আসব তোমার বাসায়। একটা দিন দু'জনে থাকব একসঙ্গে। মথুরা তো আমার মোটামুটি দেখা। পরশুদিন বাসে করে মধুবন গিয়ে ওঁদের সঙ্গে মিলিত হব।"

মানসী হেসে ফেলে। আমি অবাক হই। সে হাসতে হাসতেই বলে, "আর কাল বলবে, মধুবন ও বহুলাবনে তো শুনেছি তেমন কিছু দেখার নেই, তরশুদিন একেবারে রাধাকুণ্ডে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে যোগ দেব।"

"তা বলতে পারি।" একটু হেসে জবাব দিই।

"না। তাহলে যে তোমার বন-পরিক্রমা হবে না সখা।" মানসী গম্ভীর স্বরে বলে, "পরিক্রমার নিয়ম হল, মথুরার ভূতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে যাত্রা শুরু ও শেষ করতে হয়।"

"আমি তো কোন পুণ্যফলের আশায় বন-যাত্রায় যাচ্ছি নে মানসী !"

"না, না, না।" মানসী যেন কেঁদে ওঠে। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কান্না মেশানো স্বরে বলতে থাকে, "আমি কিছুতেই এমন স্বার্থপর হতে পারব না সখা। আমার জন্য তুমি এত বড় পাপ করবে, এ আমি সইতে পারব না। তোমাকে কালই যেতে হবে, যেতে হবে ওদের সঙ্গে। আমার কত আশা, তুমি চুরাশী ক্রোশ বন-পরিক্রমা পূর্ণ করে মধু-বৃন্দাবনের কথা লিখবে। যে কৃষ্ণলীলাস্থলের কথা বাঙালী ভুলতে বসেছে, তোমার বই পড়ে আবাব তাদেব তা মনে পড়বে। আবার দলে দলে বাঙালী বৃন্দাবনে আসবে, বন-যাত্রায় অংশ নেবে। আবার বন-ভ্রমণ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।···তুমি আমার এ আশা অপূর্ণ রেখো না, তোমাব পায়ে পড়ি !"

বলি, "বেশ, তোমাব আশা আমি পূর্ণ করব মানসী।"

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তাবপরে মানসী মুখ তোলে। বলে, "চলো, এবারে যাওয়া যাক্।"

"চলো।" আমরা পথ-চলা শুরু করি।

চলতে চলতে মানসী বলে, "সখা, বিরহব্যথায় পাগলিনী শ্রীরাধিকাও বোধহয় সেদিন এভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে মথুবার পথে বিদায় দিয়েছিলেন।"

চুপ করে থাকি।

মানসী জিজ্ঞেস করে, "সেই কথাগুলি মনে আছে সখা ?"

"কোন্ কথা ?"

সে বলে, "শ্যাম যাও মধুপুরী নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবাব বঙ্কিমনয়নে সহাস্য বদনে
ব্রজ-গোপীর পানে ফিরে চাও।"

আমি মানসীর দিকে তাকাই। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। শুধু তার স্পর্শ অনুভব করছি।

একটু বাদে সহসা স্বাভাবিক স্বরে মানসী জিজ্ঞেস করে, "কাল যা-যা বলেছি, সব মনে আছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"হাওয়াই চপ্পল, জলের বোতল, টর্চ দেশলাই মোমবাতি আর ওষুধপত্র—সব ঠিকমতো নিয়েছো?"

"নিয়েছি।"

"গামছাটা বাইরে রাখবে, মনে আছে?"

"আছে।"

"সপ্তাহে একখানা করে চিঠি দেবে?"

"দেব।"

"ভগবান না করুন, কোন বিপদ-আপদ হলে আমাকে টেলিগ্রাম করবে?"

"করব।"

"ভুল হবে না?"

"না।"

আর কোন কথা বলে না মানসী। হয়তো আর কিছু বলার নেই তার।

রাজপথের আলো দেখা যাচ্ছে। আমরা গেটের কাছে এসে গেছি। মানসী হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে, "একটা কথা রাখবে?"

"বলো!"

"আমাকে এখান থেকেই বিদায় দাও।"

"মানে!" আমি চমকে উঠি।

"এসো, আমরা এখান থেকেই পৃথক হয়ে যাই।"

"আর কিছুক্ষণ আমি সঙ্গে থাকলে তোমার কি খুব কষ্ট হবে মানসী?"

"হ্যাঁ সখা, পথের মাঝে বিদায় নেবার জ্বালা আমি কিছুতেই সইতে পারব না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো!" মানসীর স্বরে কান্না।

"বেশ, তবে তাই হোক্। রঙ্গজীর যে রমণীয় উদ্যানে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল, সেখানেই আমার বন-পরিক্রমার ব্রজপর্ব শেষ হল। আর আজকের এই মধুর স্মৃতি মধুবনবিহারী মধুসূদনের কৃপায় চির-সুমধুর হয়ে রইলো আমার জীবনের মধু-বৃন্দাবনে।"

ব্রজপর্ব সমাপ্ত

